আজকের হিন্দী গল্প

সম্পাদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ও

সিদ্ধেশ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী : কলকাতা-৯

॥ হিন্দী গল্প ॥

প্রেমচন্দ্রের পর হিন্দী প্রগতিশীল ধারা পরবর্তী কালের গল্পেও দেখা যায়। প্রেমচন্দ্র শেষ জীবনে 'পুষ কী রাত' এবং 'কফন'-এর মত প্রগতিবাদী গল্পও হিন্দী সাহিত্যে উপহার দেন। এর পরেই প্রগতিশীল লেখা প্রায় জোয়ারের মত উপচে পড়ে। সে ধারার সঙ্গে বেচন শর্মা উগ্র, শিউপূজন সহায়, যশপাল, নাগার্জুন, ভীষ্ম সাহনী, গিরীশ অস্থানা, অমৃত রায়, ভৈরবপ্রসাদ গুপ্ত প্রভৃতি এসে যুক্ত হন। পক্ষান্তরে, মনোবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে এমন কিছু সংখ্যক কথাশিল্পী আবির্ভূত হন— যাঁরা কেবল নারী মনোবিশ্লেষণ, অবচেতন মনের রহস্যময়তা ইত্যাদি কেন্দ্র করে লেখেন। জৈনেন্দ্র কুমার, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক, মহাদেবী বর্মা, সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' এই দলের। এর পর, পঞ্চাশ দশক শেষ হতে হতে হিন্দী গল্প লেখকদের এক দীর্ঘ সারি এসে দাঁড়ায়—যাঁরা কেবল মনোবিজ্ঞান কেন্দ্র করে নয়, বরং এই সঙ্গে জনজীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যথার্থতা কেন্দ্র করে সংখ্যাতীত গল্প লেখেন। মাঝে মাঝে যা কেন্দ্র করে ঝড় ও আলোচনা হয়েছে। বাস্তবজীবন থেকে শুরু করে, গ্রাম শহর ও মহানগরের সমস্যা এনে হাজির করেন। এই সময়কার গল্পকে 'নঈ কহানিয়াঁ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। মোহন রাকেশ, রাজেন্দ্র যাদব, কমলেশ্বর এই নঈ কহানিয়াঁর জনকত্রয়ী, কিন্তু এঁদেরই সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে অমরকান্ত, শেখর জোশী, নির্মলবর্মা, শানী, ধর্মবীর ভারতী, মার্কণ্ডেয়, ঊষা প্রিয়ম্বদা, শৈলেশ মাটিয়ানী, ফণীশ্বরনাথ রেণু, মন্নু ভণ্ডারী, রামকুমার, হৃদয়েশ, মধুকর গঙ্গাধর উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করেছিলেন, ষাট দশক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, আরও কিছু গল্প লেখক আবির্ভূত হন, যাঁরা সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে আসেন এবং 'ষাটোত্তরী সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। আগেকার লেখা গল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পটভূমি এবং কথ্যভাষায় তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল। পরে

এতেও ভাঙন ধরে, এবং এই সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে প্রচলিত হয়, যেমন—সচেতন কহানী, প্রগতিবাদী কহানী, প্রয়োগবাদী কহানী, অ-কহানী, সহজ কহানী ইত্যাদি। এইসব আন্দোলন থেকে যে সকল গল্প-লেখক উঠে এসেছেন, তাঁরা হলেন—কাশীনাথ সিংহ, দুধনাথ সিংহ, রমেশ বক্সি, সুদর্শন চোপড়া, রাজকমল চৌধুরী, জ্ঞানরঞ্জন, অবধ নারায়ণ সিং, রবীন্দ্র কালিয়া, মহেন্দ্র ভল্লা, অতুল ভরদ্বাজ, মহীপ সিংহ, মমতা অগ্রবাল (কালিয়া), সুধা অরোড়া, প্রিয়দর্শী প্রকাশ, সিদ্ধেশ আরো অনেকে। অর্থাৎ সত্তর দশক অব্দি এই আন্দোলন দারুণ জোরদার থাকে। এবং বিষয়-বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে গল্প স্পর্শ করে। ফ্যান্টাসি, ব্যর্থতাবোধ, সেক্স, মনোবিজ্ঞান এইসব ছিল এঁদের প্রমুখ মালমসলা। এঁদের সাহিত্য ধারণা পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত—এমন বলা হয়ে থাকে, যদিও তা ভুল। এই দশকের গল্প কেন্দ্র করে আবার বিরোধ উপস্থিত হয়েছে। এবং নতুন কথাশিল্পীরা নিজস্ব নতুন ভূমির অন্বেষণ করছে। এঁদের অন্বেষণ এখনও শেষ হয়নি। এরা ব্যবস্থা-বিরোধী, সর্বহারা শ্রেণী সমর্থনে গল্প তৈরী করছেন। নতুন গল্পলেখকদের মধ্যে কামতানাথ, সে. রা, যাত্রী, ইব্রাহীম শরীফ, রমেশ উপাধ্যায়, হিমাংশু জোশী, বল্লভ সিদ্ধার্থ, জিতেন্দ্র ভাটিয়া, মধুকর সিংহ, সতীশ জমালী, নিরুপমা সেবতী, মৃদুলা গর্গ, গোবিন্দ মিশ্র, বিভুকুমার, শরতকুমার, রাকেশ বৎস, মার্কণ্ডেয় সিংহ, অনয় এঁরা।

প্রাগুক্ত হিন্দীর এত গল্প-লেখকদের মাঝ থেকে তেরো-চোদ্দ জন গল্প-লেখক বাছাই করে (তাও অন্য ভাষায়) বাংলা সাহিত্যে হাজির করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবুও এই দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হয়েছি। আসলে আমি, এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছি, কারণ আমার মনে বহুকাল যাবৎ একটা দুঃখ চাপা ছিল যে হিন্দীর নামকরা আলোচিত গল্প-লেখকদের বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক মনীষী চিন্তাবিদ এবং পাঠক-কুলের কাছে হাজির করি। বাংলার কিছু গল্প-লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আলাপ-আলোচনায় আমি বুঝতে পারি বাংলার গল্প-লেখক এবং পাঠককুল হিন্দী সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, পক্ষান্তরে

হিন্দী সাহিত্যজগৎ বাংলার প্রতিটি সমীরেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যেহেতু, আমার যোগাযোগ বাংলা গল্প-লেখকদের সঙ্গেই নয়, বরং সাহিত্যের সঙ্গেও আছে—তাই আমি এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহস করেছি।

গল্প-লেখকদের বাছাই করার সময় আমি কোন জেনারেশান বা আন্দোলনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে গল্প-লেখকদের রচনাক্ষমতা, চিন্তাশীলতা এবং কথাসাহিত্যে তাদের অবদানের দিকে বেশী লক্ষ্য দিয়েছি। অর্থাৎ, পঞ্চাশ দশক থেকে নিয়ে সত্তর দশক অব্দি জোয়ারের মত উপচে পড়া এবং প্রতিষ্ঠিত ঐসব গল্পকারদের আমি প্রথম সংকলনে নিয়েছি যাঁরা তাঁদের সময়, মস্তিষ্ক এবং পরিশ্রম কেবল গল্প রচনার প্রতি খরচ করেছেন এবং মূল্যরূপে গল্প-লেখক হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। এঁদের আসন কথাসাহিত্যে সর্বোপরি। এঁদের মধ্যে অনেকে সম্পাদক এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধকার হিসেবেও আছেন। কিন্তু মুখ্যত কোন প্রকারের কবি, নাট্যকার বা সমালোচক নন। পরবর্তী সংকলনে এমন লেখকদের সংকলিত করবো, যাঁরা সাহিত্যের অন্য ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও হিন্দী কথাসাহিত্যে নিজস্ব জমি করে ফেলেছেন। এমনটি আমি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও স্বমতেই সংকলিত করেছি।

পরিশেষে, বাংলা সাহিত্যের গল্পকার ও বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি আমার এই পরিকল্পনা স্বীকার করে একে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন এবং পাঠককুলকে হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার প্রত্যক্ষ সুযোগ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সুবিমল বসাক, প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ, রমা বর্মাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের অনুবাদ পরিচিত করাবার পক্ষে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে।

ইতি সিদ্ধেশ।

ভূমিকা

গত দু'তিন দশক ধরে বাংলায় অনুবাদচর্চা হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। এটাকে দুর্লক্ষণই বলা উচিত। এক সময়, শুধু ইওরোপীয় সাহিত্যেই নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনাই আমরা বাংলা অনুবাদে অচিরকালের মধ্যেই পেয়েছি। এই স্রোত হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতিই হয়েছে। এখন উৎসাহী পাঠকরা অনেকেই বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দিন দিনই বাড়ছে। সেইজন্যই হঠাৎ কখনো উঁকি মারতে গেলে অন্যান্য ভাষায় দারুণ দারুণ রচনা দেখে আমরা চমকে যাই। শুধু অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের কারণেই নয় কিংবা অনুবাদ চর্চায় পুনরায় উৎসাহ দেবার জন্যও নয়—এই সংকলনটি প্রকাশিত হচ্ছে বাঙালী পাঠকদের কিছু সত্যিকারের ভালো গল্প উপহার দেবার বাসনায়। বাংলা ছোট গল্প এখন আর স্বর্ণ শিখরে অধিষ্ঠিত নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাছাকাছি কয়েক বছরে বাংলা ছোট গল্প ঐ চূড়ায় উঠেছিল, তারপর আংশিক অমনোযোগে অবহেলায় এই শাখাটি অনেকখানি হৃতশ্রী হয়েছে। ইদানীং তরুণ লেখকরা ছোট গল্প নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছেন। তার ফলে নিশ্চয়ই নতুন উজ্জ্বল ফসল আবার আমরা পাবো।

হিন্দী ভাষায় কিন্তু ছোট গল্পই এখন সবচেয়ে শক্তিশালী। হিন্দী ভাষার অনেকগুলো কেন্দ্র আছে। যেমন পাটনা, এলাহাবাদ, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি। লেখকরা ছড়িয়ে আছেন নানা জায়গায়, যার ফলে রচনার বৈচিত্র্যও এসেছে স্বাভাবিকভাবে। এই বৈচিত্র্য শুধু আঞ্চলিকতার স্বাদেই নয়, দৃষ্টিভঙ্গিও নানারকম। অনেক নিষ্ঠুর সত্য ঝলসে উঠেছে সাম্প্রতিক কালের গল্পগুলিতে।

সেইরকম কিছু গল্পই আমরা এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। এ কাজ কঠিন, আমার পক্ষে কঠিনতর। সাম্প্রতিক কালের সমস্ত হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই। সেইজন্যই নির্বাচন ব্যাপারে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে কলকাতাবাসী আধুনিক হিন্দী লেখক সিদ্ধেশ্বর। আমার তুলনায় সিদ্ধেশের সুবিধে এই যে তিনি হিন্দী এবং বাংলা দুটি ভাষাই ভালো জানেন।

যে-কোনো সংকলনের নির্বাচন সম্পর্কেই মতবিভেদ দেখা যায়। এই সংকলনটি সম্পর্কেও নানা বিতর্ক উঠতে পারে। আরও কয়েকটি গল্প থাকলে, সংকলনটি আমার মতে, আরও সার্থক হতো। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন সূত্রে অনেক প্রতিভাবান হিন্দী লেখকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, তাদের সকলের রচনাও এ সংকলনে নিতে পারে নি। কয়েকটি প্রকৃত ভালো গল্পও সরিয়ে রাখতে হলো, স্থানাভাবে। বাংলায় এটি প্রথম প্রয়াস, তাই প্রথমেই সংকলনটি খুব বৃহদাকার করা সম্ভব হলো না। সুতরাং, এটিকে আধুনিক হিন্দী গল্প সংকলনের প্রথম খণ্ড হিসেবে গণ্য করাই উচিত।

আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তিরা এরকম সংকলন কাজে হাত দেবেন। এই সংগ্রহটি প্রকাশ করার জন্য আমরা বিশ্ববাণী প্রকাশনী এবং ব্রজকিশোর মণ্ডলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই মূল লেখকদের গল্প প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য এবং অনুবাদকদের, যাঁরা অনেক পরিশ্রমে এই গ্রন্থটিকে সম্ভব করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিন বিন্দু ॥ ফণীশ্বরনাথ রেণু

গীতালি দাস নিজেকে স্বরজীবিনী বলে। নাদ-স্বর-তাল ইত্যাদির সাহায্যেই সে আজ এত উঁচুতে উঠতে পেরেছে। সবাই বলে : ওর সাধনা পূর্ণ হয়েছে।···কী সরলসিধে এই লোকগুলো। সাধনার সফল-অসফল হবার উদ্‌ঘোষকদের কাছে ওর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে : সফল সাধনার সোজা অর্থ কি ?···অবশ্য এটা ঠিক যে অনেক অসাঙ্গীতিক পরিবেশও গীতালির দরদী স্বর এবং যুগ্ম-গীতির মূর্ছনায় গীতিময় হয়ে উঠেছে—যে-কোনো সঙ্গীত-সমারোহ অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আজও গীতালির নামে সঙ্গীত-পিপাসুদের একত্রিত করেন।···কিন্তু এসব কতদিন পর্যন্ত ? মিতালিদির সফল সাধনার কী হলো ?···গীতালি তার বড়দি মিতালির ভুলের সুযোগ নিয়ে লাভবতী হয়েছে।···

গীতালি বিশুদ্ধ (?) ঠুংরী-গায়িকা মিতালির সফল জীবনের মাত্র চব্বিশ মাসের স্বর-জীবনের 'রোল' করা—সুন্দরভাবে গোটানো—অংশটুকু খোলে, ধীরে ধীরে ! ···ন' বছর ? একশো আট মাস চাট্টিখানি কথা নয়··· !

ইদানীং গীতালি প্রায়ই তার মনে-ভেসে-ওঠা সহায়ক নাদ-এর বিশ্লেষণ করে। ···সহায়ক নাদ—ইংরেজীতে 'ওভারটোন' বলে। নাদ কখনো একা সৃষ্টি হয় না। তার সাথে সাথে অন্য নাদও জন্ম নেয়। সে স্বর আমরা শুনতে পাই, বা না পাই—মূল নাদ থেকে সৃষ্ট এ নাদগুলোকে সহায়ক নাদ বলে। স্বয়ংই জন্মাবার দরুন এদের স্বয়ম্ভু স্বরও বলা হয়। গীতালি এই স্বরদের সাহায্যেই সিদ্ধি এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—প্রার্থনার সুরে অনবরত বাজতে থাকা জীবনের সুর-তালের সীমা কখনো ডিঙোয়নি। সীমা-বিস্তার করেছে, অবশ্য।···কিন্তু এদিকটায় কয়েকদিন ধরে, ওর ভীষণ ভয় করছে। গাইবার সময় মূর্ত হতে থাকা রাগ এক-আধবার অস্পষ্টতর হয়ে পড়েছে !···

…হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ…

জীবন হয়ে যায় এক প্রার্থনা-া-গীত কী ত-র-হ !…

গীতালি এ জীবনের কিছুটা অংশ কেটে নেয়। টুকরো-টুকরো করে। দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে ফেলে। তারপর গুঁড়িয়ে যাওয়া মুহূর্তের সুর-কণিকাগুলোকে সহায়ক নাদ-এর সাহায্যে পরখ করে দেখে। ডট · ডট…ডট ··। গীতালি এ খুদে খুদে তিনটে শূন্যকে, চোখের সামনে—শূন্যে-ভেসে-ওঠা ছোট্ট ছোট্ট তারা তিনটেকে ইদানীং ভালো চোখে দেখছে ; চিনে ফেলেছে শুভ চিহ্নটিকে !…

গীতালি সুরজীবিনী হয়েও সাহিত্য-জগতের সাধনা এবং গতিবিধিরও একটু-আধটু খোঁজ-খবর রাখে। ওর জামাইবাবু, নিজেকে, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা, যে-কোনো মুহূর্তে প্রসিদ্ধ হয়ে যেতে পারা প্রচ্ছন্ন সমালোচক মনে করেন। টাইম বোমা ! …টাইম বোমা, না, আলু বোমা ? গরম গরম আলুর চপ প্লেটে করে জামাইবাবুর কামরায় ঢুকেছিলো ও। সুদর্শনা-অদর্শনাও সঙ্গে ছিলো। দুষ্টামিভরা হাসিটুকু প্রাণপণে চেপে গম্ভীর হবার ভান করতে করতে গীতালি বলেছিলো—দেখুন জামাইবাবু, এটা হচ্ছে আলুর বোমা অর্থাৎ বম ! আলুর ভর্তার শেল-এ কচি ছোলা বন্ধ আছে।…বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা এ অবিস্ফোটক বোমাদের ফোটার নয়, জুড়িয়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে।…এতক্ষণ এরাও আলু-বেশে সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলো।

দুষ্টু সুদর্শনা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলো—না, না, 'আলু' বলিস না। জামাইবাবু সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়া হিংস্র প্রাণী সাজতে পারেন। শিকার সামনে এলেই অমনি… ! হো-হো-হো ! জামাইবাবুও হেসেছিলেন। কিন্তু, দিদির ভীষণ খারাপ লেগেছিলো। …সে যাই হোক, জামাইবাবুর বই কেনার অদ্ভুত অভ্যেসের দরুন গীতালি এবং তার বন্ধুরা, সুদর্শনা-অদর্শনা, কিন্তু বেশ লাভবতী হয়েছিলো। কথা-সাহিত্যের ভালো-মন্দ অনেক পুঁথিপত্র তারা পড়তে পেরেছিলো।…

আধুনিক কথা-সাহিত্যে ডট-বাদীদেরও একটা দল আছে। ডট…ডট…ডট ! অবশ্য এখনো ওঠেনি, তবে, যে-কোনো মুহূর্তে এ প্রশ্ন অতি অবশ্যই উঠতে পারে—এ ধরনের ডটময়ী রচনাবলীর রচয়িতাদের মস্তিষ্কে শুধু ডট·গিজগিজ করে নাকি ? মস্তিষ্কের জায়গায় মাছের অসংখ্য থলি নেই তো আবার ? …সাধারণ পাঠক এ ধরনের বিন্দুবিসর্গধারী রচনাবলী সুনজরে দেখে না। পুরো বইতে, প্রত্যেক পাতা এবং লাইনে যেখানে-সেখানে সর্ষের দানার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিন্দু-বাহুল্যে পাঠকদের চোখ কিচকিচ করে ওঠে ! ·

গীতালি এ বিন্দুগুলোকে অদৃশ্য-মুখর জগতের জানালা মনে করে—তিনটে গোল গোল কাঁচের। ভেতরে আলো। অদৃশ্য-মুখর জগতের ক্রিয়াকলাপ শুরু হলো!…

তিন বিন্দুর সাহায্যে অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ এবং অসংলগ্ন মুহূর্তগুলোকে রূপদানকারী অন্য কোনো জগতের হাল্‌কা ছবি প্রদর্শনকারী, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো কোনো শব্দ-শিল্পীর সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎকার ঘটলে গীতালি বলবে—মানো বা না-ই মানো, এগুলো কিন্তু সহায়ক নাদেরই চিহ্ন!

জিজ্ঞেস করবে—এ ওভারটোন অথবা সহায়ক নাদ-এর সৃষ্টি নিজে নিজে হয় না? মনের অসংখ্য জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারা চেহারাগুলো কী নিজেরা কথা কয় না?…কথাই কথা বলবে, আমি নয়। রহস্যের জট খুলবে কথাই। …কোন্ শিল্পীর উত্তরে গীতালির মন-বনে কোন্ পাখি আবার মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেছে!…

হঠাৎ মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের কথা মনে পড়লো গীতালির। বেশ কিছু চোখ-মুখ ভাসা এবং ডোবার পর ডট…ডট…ডট…। তারপর মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের একখানা তৈলচিত্র ঝুলতে লাগলো ওর মনের দেয়ালে।…কী জানি, যন্ত্রকারমশাই আজকাল কোথায় আছেন! গীতালি তার হাত দুটো জোড় করে শূন্য-নমস্কার জানালো।

জীবনের চারপাশে ঝঙ্কৃত হতে থাকা সহায়ক নাদদের প্রথম সাক্ষাৎ যন্ত্রকার-মশাই-ই করিয়ে দিয়েছিলেন। যন্ত্রকারমশাইয়ের মন্ত্রবলেই ও গীতিউন্মাদিনী হয়ে পড়েছিলো।…জানিস খুকি, পাকা শিকারী হতে গেলে সব ধরনের শিকারীদের কাছে দীক্ষিত হতে হয়। বাঘ-ভালুকের শিকারী থেকে শুরু করে ব্যাধ-লুব্ধক এবং সাপুড়ের পর্যন্ত সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। যন্ত্রকার বলো, মিস্ত্রী বলো আর কারিগরই বলো—তুমি কিন্তু আমার নাতনীর বয়েসী! …দাদুর কথা শুনবে?…যন্ত্রের সাহায্যেই সহায়ক নাদ-এর পাঁচ হাজার আন্দোলনযুক্ত ধ্বনির সূক্ষ্মতা অনুভব করতে পারবে। সদা-সর্বক্ষণ ধ্বনিত হতে-থাকা জানা-অজানা সুরের মূর্ছনায় তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মুখরিত হয়ে উঠবে!…

অদৃশ্যমুখর জগতে দশ বছর আগেকার কথা মুখরিত হয়ে চলেছে!…

সুর-মন্দিরের ম্যানেজারকে কড়া কথা বলতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলো গীতালি।
...শহরের সবচেয়ে পুরনো এবং নির্ভরযোগ্য বাদ্যযন্ত্রের দোকানটার নাকি এই ছিরি! একই সপ্তাহে তিন তিনবার তানপুরাটাকে ঠিক করিয়ে নিয়ে যাবার পরেও যে-কে-সেই। গানের মাঝপথেই নিঃসঙ্গ করে রেখে দেয়! ...রোগটা যে কী, তা বলে দেবার মতো কোনো স্পেশালিস্ট নেই আপনাদের কাছে? তাহলে এটাকে সুর-মন্দির বলবো, না অসুর-মন্দির? ম্যানেজারের মুখখানা নির্জীব মাইকের মতো গোল হয়ে ঝুলে রইলো শুধু। গীতালি তানপুরা নিয়ে সুর-মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এসেছিলো—আর কক্ষনো এখানে না আসবার দিব্যি কাটতে কাটতে! এক...দুই...তিন!

—ও দিদি, শুনুন—শুনুন। —কিছু দূর যাবার পর, পেছন দিক থেকে কারো ডাক শুনে, গীতালি ঘুরে দাঁড়ালো...একটা বেঁটে থলথলে ছেলে গড়াতে-গড়াতে আসছে ফুটপাথের ওপর দিয়ে। এ বিদঘুটে মালটি আবার কে? ছেলেটি এসে নমস্কার করলো—আপনি তো গীতালিদি? তাই না?...হেঁ-হেঁ-হেঁ। তানপুরাই শুধু নয়, সুর-মন্দিরে সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রেরই এভাবে গলা টিপে 'বধ' করা হয়। যেদিন থেকে মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকার সুর-মন্দিরকে শেষ নমস্কার জানিয়ে চলে গেছে, সব কটি অসুরই রয়ে গেছে এখানে! ...আপনি ঠিকই বলেছেন গীতালিদি!...

গীতালি দেখলো—ছেলেটি অকালপক্ক নয়। গ্রন্থিবিকারগ্রস্ত। বামন নয়, বেঁটে এবং দাড়ি-গোঁফ-হীন—ঘুঘলু! ও ওর নাম বললো—ঘুঘলু।...আসামের দিকে কোথায় যেন জন্মেছে। মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের সঙ্গে গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আছে। কলকাতায় সাত-আট বছর, দু-তিন বছর এদিকে-সেদিকে এবং এখানে প্রায় পাঁচ-সাত বছর হয়ে এলো।...

ঘুঘলু জানালো—মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকার আজকাল কোনো দোকানে কাজ করে না। নিজের গলি ছেড়ে বাইরে কোথাও যাওয়া-আসা করে না। গলিই কেন, নিজের কামরা ছেড়ে বাইরে বেরোবার সময় কোথায়? ঘুঘলু বেশ কয়েকজন নবীন-প্রবীণ যন্ত্রবাদকের নাম বললো—যার দরকার পড়ে, মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারকে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয়—কলকাতা থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, কাশী থেকে...!

গীতালি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলো। ঘুঘলু রিক্শাওয়ালাকে ডাকলো—এ্যাই রিক্শাওয়ালা, দুধকুপ মোহল্লায় যাবে।

তুধকূপ মোহল্লার একটা গলি ধরে কিছুদূর যেতেই ঘুঘলু একটা খাপরা-ঘরের কাছে দাঁড়ালো। বন্ধ দরজার একটা ছেঁদায় চোখ লাগিয়ে ভেতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে নিলো। তারপর শেকল নাড়াতে লাগলো। ভেতর থেকে জনৈক অসন্তুষ্ট-আত্মার খরখরে আওয়াজ বন্ধ দরজার ছিদ্র থেকে স্পষ্ট শোনা গেলো। ভেতরের লোকটিকে একগাদা প্রশ্নের উত্তর শুনিয়ে খানিকটা সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হলো ঘুঘলু। অগত্যা দরজা খুলে গেলো। মনে হলো যেন ভেতরের কেউ কামরা থেকেই দড়ি টেনে ছিটকিনি খুলে দিলো। ঘুঘলু ভেতরে ঢুকলো। একটা অমসৃণ বকুনি ভেসে এলো—কোত্থেকে আবার কাকে জুটিয়েছো?

ঘুঘলুর চাপা স্বরে স্পষ্ট হলো যে অনুনয় বিনয় করে ও বলছে—মাস্টার, না বলবেন না। ···তাহলে চেষ্টা-চরিত্রটুকু ভেস্তে যাবে!··

বাইরে দাঁড়ানো গীতালির কিন্তু ঘুঘলুর 'এ মশাই মশাই' এতটুকু করা ভালো লাগলো না। কিন্তু, বেসুরো যন্ত্রটাকে নিয়ে রেওয়াজ করতে পারবে কী ও? অতএব ও চুপ করে রইলো। অপ্রসন্ন আত্মা এবং বিকৃত চেহারাওয়ালা একজন প্রৌঢ় দরজা দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলো—কী ব্যাপার?··· সুর-মন্দির-ওয়ালারা যন্ত্রটার তেরোটা বাজিয়ে ছেড়েছে বুঝি? রেখে যাও, তিন দিন পরে এসো। ···বাঃ, এর খোলটা তো চমৎকার! যন্ত্রটার যত্ন-টত্ন নাও তো, না···?

গীতালি হারাধন যন্ত্রকারের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লো। ···নিপুণ স্বরের আলাপ মিছিমিছি একটা কর্কশ মূর্ছনা সৃষ্টি করছে! ও নিশ্চুপ রইলো। যন্ত্রকার কয়েক মুহূর্ত ধরে গীতালির মুখভঙ্গী পড়বার চেষ্টা করলো। তারপর বললো—কিন্তু-কিংবা-অথবা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন, খুকি?··· যন্ত্রকারের স্বর কোমল হলো—অসুরকে সুসুর বানাতে দশ মিনিটও সময় লাগে না। ···এসো, ভেতরে এসো!···

হারাধনের কামরায় ঢুকে গীতালি খুশি হলো। দেয়ালে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী দ্বারা প্রচারিত ভারত-বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি ঝুলছে। এক-আধটা প্রশংসাপত্র অথবা সার্টিফিকেট জাতীয় জিনিসও রয়েছে। মেঝেয় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো-ছিটানো।···রেডিওতে বাদ্য-সঙ্গীতের প্রোগ্রাম, সরোদ বাদন, চলছে।···অকরাম! উদীয়মান সরোদ-বাদক অকরাম, স্বরচিত গৎ 'অর্চনা কে বোল' উপস্থাপিত করছে। থেকে থেকে সরোদের তার থেকে শঙ্খ এবং ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হারাধন যন্ত্রকার তার ছোট এবং পুরনো রেডিও সেটটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—শুনছো তো? অকরামের এ সরোদের

বয়স সাত বছর। এখনো যেমনটির তেমনটিই রয়েছে। যন্ত্রের যত্ন মানে—যন্ত্রপূজা।...

হারাধন সেতার, সরোদ, সুরবাহার, 'দিলরুবা' বীণা ইত্যাদির প্রসিদ্ধ বাদকের নাম বললো। গীতালি আজও স্বীকার করে— মাত্র পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে যন্ত্রকারের কথা বিশ্বাস করতে পারে নি। যন্ত্রকার তা টের পেয়েছিলো। তাই, নিজের অ্যাটাচি থেকে কয়েকখানা নতুন-পুরনো চিঠি বার করে গীতালির সামনে রেখে বললো—পড়ে ভাখো!

কলকাতা থেকে ভারত-বিখ্যাত (স্বর্গীয়) সেতার-বাদক ওস্তাদ কাদির হোসেনের আত্মীয়তাপূর্ণ একখানা চিঠি পাঁচ বছর আগেকার: ভাই হারাধন, তুমি তো সত্যি-সত্যি আমার কাছে হারাধন হয়ে গেলে!...আমার যন্ত্রটার কী যেন হয়েছে, যার-তার হাতে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। জানি, তুমি কলকাতায় আসবে না। আমিই আসছি তোমার কাছে...।

রেডিওতে তখন, যোগেন্দ্র সুরীর বেহালা হেমন্ত-এর রাগ-বিস্তার করে যাচ্ছে।...কে বলে—বাদ্যযন্ত্র প্রাণহীন?

গীতালি মুগ্ধ হতে থাকলো। ছোট-বড় সুর-শিল্পী এবং ওস্তাদদের মিষ্টিমধুর চিঠি, অকরামের 'অর্চনা কে বোল', যোগেন্দ্র সুরীর বেহালা, ঘুঘলুর গুরুভক্তি—সবাই মিলে গীতালির চোখের সামনে মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের আত্মার বাস্তবিক ছবি তুলে ধরলো।...

ঘুঘলু স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মাঝে-মধ্যে ওস্তাদের কথায় নিজের মন্তব্যও পেশ করতে থাকলো—মহাদেও লালজী তবলচী খাটি হীরে, মানুষ নন। ...খাঁ সাহেব তো দাতা পীর ছিলেন; পকেট থেকে এক-মুঠো নোট বার করে 'পরবী' দিতেন।...মুন্নুজী সারঙ্গী সেদিন থেকেই আমার ওপর ভীষণ রেগে আছেন।...

ঘুঘলু চা দিয়ে গেলো। চায়ের প্রথম চুমুক নেবার পর হারাধন যন্ত্রকার বললো—যন্ত্রকার বলো বা কারিগরই বলো, অন্ততঃ বেসুরো বলতে পারে না কেউ।...এখন তো কর্মফল ভোগ করছি, খুকি।...নিষ্প্রাণ কাঠ, তার এবং শুকনো চামড়ার ওপর সুর-তাল চড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া কী-ই বা উপায় আছে? অভিশপ্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি।...তুমি আমার নাতনীর বয়সী। বিশ্বাস করবে—এক সময় গাইতাম আমি?...আমার আওয়াজ শুনে পালে পালে হরিণ ছুটে আসতো।...

যন্ত্রকার আবার তার অ্যাটাচির ঢাকনি খুললো। কী যেন একটা খুঁজতে খুঁজতে বললো—আমি জানি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বলতে হবে।…জীবছপুর এস্টেটের রাজা জীবৎসনারায়ণ দেবজ্যর নাম শুনেছো? শিকারের অভিজ্ঞতার উপর একখানা মোটা এবং প্রসিদ্ধ বই লিখে গেছেন ইংরেজীতে। ওতে দেখো—পাবলিক লাইব্রেরীতে রয়েছে বইটা, দেখবে –বারো, বাইশ, চল্লিশ এবং পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় আমার উল্লেখ আছে। গ্রুপ ফটোতে আমায় দেখে এখন আর চিনতে পারবে না কেউ। …রাজাসাহেব শিকার ছাড়া সঙ্গীতচর্চাও করতেন। ওঁর শিকার পার্টিতে জেফারী কর্ডাইট, '৩৩৩ বোর রাইফেলের সঙ্গে সেতারেরও দরকার হতো। তিন-চারজন বড় ওস্তাদ এবং তাঁদের ডজন ডজন শিষ্য ওঁর প্রাসাদে প্রতিপালিত হতেন। আমার গুরু পণ্ডিত শিববালক ঝা সেই দরবারেরই গায়ক ছিলেন।…

গীতালি ঘড়ি দেখলো। ঘুঘলু এবার একটা গেলাসে চা বানিয়ে আনলো। বললো—এসব কথা শোনাবার সময় আমার ওস্তাদ 'এস্পেশাল' চা খায়।…

পকেট থেকে একখানা নোংরা রুমাল বার করে গেলাসে জড়াতে জড়াতে যন্ত্রকার গীতালির দিকে তাকালো—খুকি, তোমার দেরি হয়ে যাবে। আরেক দিন শুনিয়ে দেবো'খন—হরিণের দল কীভাবে ছুটে আসতো।…

গীতালি হাসলো—আদ্দেক গল্প শুনলে কপালের আদ্দেকটায় ব্যথা হয়।

—শুনলে, না শোনালে? সে যাক্ গে। নিশ্চিন্ত হলাম। মাথাব্যথা নিয়ে মাথাওয়ালারাই মাথা ঘামাক। আমরা তো পেটওয়ালা।…

গীতালি আবার হাসলো।…যখন-যখন গীতালি হাসে, যন্ত্রকারের ডান কানের পাশটার চামড়া থরথর করে লাফিয়ে ওঠে। ব্রণজর্জর বিকৃত মুখে হালকা চমকানি চিকচিকিয়ে ওঠে।

—তাহলে শোনো।…

…সেবার গুরুদেব হারাধনের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করলেন। শিকার পার্টির সঙ্গে চলবার আদেশ দিলেন। জঙ্গলে মঙ্গল উদ্‌যাপিত করবার, এখন কতো গল্প শোনাবে হারাধন! লিখলে একটা মোটা বই তৈরি হতে পারে। …রাজাসাহেব ছিলেন পাকা শিকারী।

নেপালের তরাই অঞ্চলের মধুমারা জঙ্গলে কিরাত সর্দার 'চিত্তল' শিকার করে দেখিয়ে দিয়েছিলো।…তরাইয়ে জঙ্গলের মধ্যে অল্প একটু খোলামেলা জায়গা আছে—ইংরেজীতে তার নাম 'গ্লেড'। …জ্যোৎস্না লম্বা লম্বা শালগাছের ডালে-ডালে ঝুলে থাকে না—শ্যামল-মসৃণ ঘাসের গালিচার ওপর গড়াগড়ি যায়। পাশ দিয়েই

বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। কলকল-কুলকুল—কোনো শব্দ নেই। হাওয়া ফাস্থর-ফুস্থর করে, কথা কয়।···চৈত্রের চাঁদনী রাত। জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা ঠুঁটো গাছ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে। ছায়ার মধ্যে ইশারায়, কেউ কিছু বললেই সম্পূর্ণ তরাইয়ে, তরাইয়ের জঙ্গলে, একটা বেদনাবিধুর আহ্বান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়।··· কামাতুরা হরিণীর ডাক! নদীর ঠাণ্ডা জলে পিপাসা মিটাতে গিয়ে চিতলদের মনে-প্রাণে অন্য একটা পিপাসা দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে। হরিণী থেকে থেকে ডেকে ওঠে। ···জ্যোৎস্নার স্পষ্ট আলোয় নর-চিতলদের দেখা যায়। প্রতিটি হরিণের গায়ের সাদা চাকতিগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আলো মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠুঁটোটা বিস্ময় অথবা আবেশে নড়ে চড়ে ওঠে। ছায়ার মধ্যে বসে কে যেন ইশারা করে—সিস্‌সিস্!···পরক্ষণেই জ্যোৎস্নার বুকে তীরের ঝিলিক—খচ্‌চ—খচ্‌চ···! তারপর মৃত প্রেমীদের নিষ্প্রাণ শরীর থেকে যে-যার তীর টেনে বার করে কিরাত দল নাচতে শুরু করে—হা-হিরা-হা-হিরা-হির´-র´-র´-রা-া···!

···একটা মেয়ে-চিতলকে ছেলেবেলা থেকে পেলে-পুষে নকল ডাক ডাকবার নিখুঁত শিক্ষা দেওয়া হয়। ওস্তাদ তার গলার নিচে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে থাকে আর হরিণী ডেকে ওঠে!···

···এ শিকার দেখবার পরই রাজাসাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জানা যায় নি—উনি তারপর আর এ ধরনের শিকার করেছিলেন কিনা। হারাধনের মাথায় কিন্তু এ শিকারের ভূত চেপে বসলো। কামান্ধ চিতলের চিৎকার, আর্তনাদ, যন্ত্রণা এবং অবারিত মৃত্যু দেখে ওর ভেতরকার কিরাত আনন্দে কুলকুলিয়ে উঠতে লাগলো! ···সঙ্গীত সাধনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে হারাধন কিরাত সর্দারের সঙ্গে পালিয়ে গেলো।

···প্রতি বছর চৈত্রের চাঁদিনী রাত, তিন-চার বার করে এ শিকার হয়। শিক্ষিতা মেয়ে-চিতলটির সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষকেরও পুজো করে কিরাতেরা। এ ধরনের হরিণীকে বহুমূল্য এবং অলভ্য সম্পদ মনে করা হয়।···সারা বছর হরিণের শুকনো মাংস আগুনে পুড়িয়ে ভোজ খেতে-খেতে প্রত্যেক কিরাত 'হা হিরা' বলে তাকে স্মরণ করে। ···সেবার তিনটে-চারটে শিকারেই হারাধন কিরাতদের সঙ্গে রইলো। পুরো একটা বছর কিরাতদের সঙ্গে থেকেও সে মেয়ে-চিতলকে শিক্ষা দেবার রহস্য শিখতে শিখতে পারলো না। এক নম্বর পাহাড়ে যে কটি পাহাড়ী গ্রাম আছে, সে কটির মধ্যে, ব্যস, একটিই মেয়ে-চিতল এবং তার মালিকই একমাত্র গুণী। মূলধন হরিণী!···

কিন্তু, হারাধন নিজের সাধনা-ধনে মূলধনটিকে সস্তা করে দিলো। মেয়ে-চিতলের দরকার কী? হারাধন কামাতুরা মেয়ে-চিতলের ডাক ডাকতে পারে। ...কিরাত সর্দার পরীক্ষার জন্যে শিকারের আয়োজন করলো। চৈত্রের জ্যোৎস্নাই শুধু কেন, যখন ইচ্ছে শিকার করো। বারো মাস!...

...চাঁদিনী রাত! ...রাতের শেষ প্রহর...ব্রাহ্ম মুহূর্তে হারাধন প্রথম ডাক ছাড়লো। অবিকল নকল!...চাতরাগাছির কাছে, কোশী নদীর আশেপাশের সাদা-সবুজ মাটিতে ডজন-ডজন চিতল ছুটে এসেছিলো...খচ্‌চ খচ্‌চ... !

হারাধনের পুজো হতে লাগল, এক নম্বর পাহাড়ে। ও তল্লাটের সর্বাধিক সুন্দরী ওর সেবাশুশ্রূষার জন্যে হাজির হলো। কিরাত-সর্দার ওর প্রাণশত্রু হয়ে দাঁড়ালো।...সেবার ভীষণ ভূমিকম্প হলো জানুয়ারী ১৯৩৪-এ। ভূমিকম্পের তৃতীয় দিন কিরাত সম্প্রদায় স্বীকার করলো –হারাধনই এ দৈবী কোপের মূল কারণ।

...ভগবতীর কৃপা। নারীর কৃপায় ওর প্রাণরক্ষা হলো। ...মৃগচর্ম বগলদাবা করে গুরু-সেবায় উপস্থিত হলো ও। গুরুর সামনে, রাজাসাহেবের বাগানে নিজের কণ্ঠ-শিল্প উপস্থাপিত করে একটা নতুন বিপদ সৃষ্টি করলো।...সেবার চিতল-শিকার দেখে রাজাসাহেব মানসিক রোগের শিকার হয়েছিলেন। একটানা অনেক দিন ধরে চিকিৎসা চলবার পর যেই একটু সুস্থ হলেন, অমনি হারাধনের ডাক তাঁর কানে গেলো। রাজাসাহেব আবার অসুস্থ হলেন।...পুরনো শিকারী! আওয়াজ শুনতেই চেঁচিয়ে উঠলেন—সেই, সেই মেয়ে-চিতল, ছলনাময়ী হরিণী, ডাইনি, স্পটেড ডিয়ার, চিত্রা...এক্‌সপ্রেস-২০০ রাইফেল হাতে নিয়ে শব্দভেদী নিশানা বানিয়ে ফায়ার করলেন...! হারাধন তার ডাকের অবরোহণের দিকে আসছিলো—এমন সময় তার গুরু পণ্ডিত শিববালকের বুকে একটা সফট্ নোজ্‌ড একস্‌পেণ্ডিং বুলেট এসে ঢুকলো। হারাধনের গুরু শিষ্যের দেয়া মৃগচর্মের ওপর বসেছিলেন।... চিতলের চামড়ার ওপর আজও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। ...হারাধন পালালো। যেখানেই গেলো, সেখানেই একটা না একটা অঘটন ঘটতে থাকলো।...

কানের ওপর হাত চাপা দিয়ে হারাধন চোখ বুজলো। বললো—তখন থেকে, ঠিক তখন থেকেই গলায় একটা কর্কশ এবং ধাতব ঝঙ্কার এসে ভর করেছে। আমি বাণীকে কলঙ্কিত করেছিলাম যে! ...সুর-বাঁধার কাজ করতে লাগলাম ...কিন্তু...কিন্তু...।

ঘুঘলু একটা পুরনো 'মৃগচর্ম' নিয়ে এলো ভেতর থেকে। যন্ত্রকার বললো—এটা সেই চঞ্চল যুবা নর-চিতলের চামড়া, যে চার-চারটে তীর বুকে নিয়ে আমার কাছে

চলে এসেছিলো! ...আমার সামনে পা আছড়াতে আছড়াতে নিভে গিয়েছিলো চিরদিনের মতো...গুরুজী এরই ওপর বসেছিলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্যে... ।

হারাধন যন্ত্রকার মৃগচর্মখানাকে উঠিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক মাথায় ছোঁয়ালো। তারপর গীতালির সামনে রেখে বললো—সেই স্বর্ণমৃগটির নাম যেন কী ছিলো, মারীচ? ...আর, সীতার মনে সে মৃগচর্মের ওপর বসবার বাসনা বা লালসা কেন হয়েছিলো? রামায়ণে কী সে সম্পর্কে লেখা আছে কিছু?...কোনো সাধনা করবার জন্যেই, সম্ভবতঃ!

হারাধন যন্ত্রকার নেপাল-তরাইয়ের শ্যামল বন্যভূমি, ওখানকার শস্য-সবুজ মায়া-জালে তার কাহিনীকে বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলো—খুকি, নাতনীই বলি এখন থেকে যদি দাদু মনে করো আমাকে! ...আচ্ছা, বেশ! কালকেও আসবে? ঠিক আছে।

পরদিনও গেলো গীতালি। যন্ত্রকারের সঙ্গে দেখা হতেই সে ওর হাত দেখবার ইচ্ছে জাহির করলো। গীতালি তার দুখানা হাতই পেতে দিলো।...হুঁ উঁ! তোমার দিদি মিতালি যা করতে পারে নি, তা তোমার দ্বারা পূর্ণ হবে। অতি অবশ্যই! ...গীতালি দেখলো—যন্ত্রকার তার দিদির সঙ্গীত-জীবনের ছোট-বড় ঘটনাবলীই শুধু নয় তার জীবনের অন্যান্য ছোটবড় ঘটনাও জানে। যন্ত্রকার বলেছিলো—নাতনী, কিছু মনে করো না যেন। তোমার দিদি টম্যাটোর মতো লোকটাকে বিয়ে করে সব কিছু বরবাদ করে ফেলেছে। .. আচ্ছা, এমন ছারপোকা দেখেছো, যে রক্ত চুষে একটা লাল-গোল ফোঁটায় পরিণত হয়? ছারপোকাই ওই লোকটা! তোমার দিদির সব কিছু শুষে নিয়েছে। ...কী বললে? সাহিত্যিক? সে আবার কোন্ আপদ?...

কথা-বার্তার মধ্যে মধ্যে কখনো-কখনো যন্ত্রকার এমনি সব ভাসাভাসা কথা বলে। টম্যাটো এবং ছারপোকার সঙ্গে নিজের ভগ্নীপতির তুলনা শুনেও ওর মনে এতটুকু দুঃখ হয় নি। ও সমর্থন করতে গিয়ে মাথা নাড়িয়ে বললো—আপনি ঠিকই বলেছেন! আপদই। ...দিদি ভুগছে। তিলে তিলে মরছে...!

সঙ্গীত-জগতের প্রতি রুচিবান লোকেরা অসময়-বিলুপ্ত মিতালির প্রতিভার জন্যে নানা জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। কেউ ওর গুরুর দোষ দিয়েছে, কেউ ওর অকাল-মাতৃত্বকে দায়ী করেছে—কেউ কিন্তু মিতালির স্বামীর দিকে আঙুল তোলে নি · যদিও দিদির জীবনে যদি কেউ ঘুণ ধরিয়ে থাকে, সে এই লোকটিই! 'শুচিবায়ু', পবিত্রতর ভ্রম! ...জামাইবাবুর আবার 'বিশুদ্ধ' বলবার মুদ্রাদোষ আছে। অশুদ্ধ? বিশুদ্ধ...সংকুচিত মুখভঙ্গিমা! ...দিদি এখন বাথরুমেই গায়। হাতের

আঙুলের গোড়ালির দিককার চামড়া সদা-সর্বক্ষণ জলে ডুবে থাকার দরুন কুঁকড়িয়ে থাকে ? ···দিনভোর কাপড়-জামা ধুতে হয়।

ঘুঘলুও মিতালিদিকে চেনে। কথায় ফোড়ন কাটতে কাটতে বললে—যে আসরে মিতালিদির প্রোগ্রাম হতো তাতে ভিড়ের ওপর এক-আধ লাঠি না পড়ে যেতো না। ···শেষ পর্যন্ত কী হলো।

হবে আর কী ? ওর পতিদেবতা সঙ্গীত শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। সঙ্গীতে আবার ঠুংরী! মিতালিদির ঠুংরীতে এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিলো, যার দরুন তখনকার দিনে 'মিতালি ঠুংরী' নামে একটা নতুন ধারাই প্রচলিত হয়ে পড়েছিলো। বিয়ের পরে সর্বশিল্পমর্মজ্ঞ স্বামীমহোদয় প্রেম-উপচানো গলায় বোঝালেন—মিতালি রাণী, ঠুংরীই যদি গাও, বিশুদ্ধ ঠুংরী গেয়ো। পতিদেবের ইচ্ছে—উপায় কি !··· দিদি ধীরে ধীরে একটা রাগ-বিশেষকে কেন্দ্র করে রেওয়াজ করতে লাগলো। লক্ষ্ণৌ এবং বেনারসের ঠুংরী নির্ভেজালভাবে শোনাতে লাগলো···গুরুজী নিষেধ করলেন। এমন কী মিতালিদির স্বামীকে পর্যন্ত বোঝাবার চেষ্টা করলেন —ঠুংরী আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রভাবেই এখন পর্যন্ত পুষ্ট হয়ে এসেছে। ঠুংরী খেয়াল-এর অনুগামিনী মাত্রই নয়। পল্লীসুর সমন্বিত ঠুংরী ওস্তাদ বড়ে··· ।

—বড় বড় ওস্তাদের বড় বড় বুলি শোনাবেন না, পণ্ডিতজী ! আমি ঠুংরীর ইতিহাস জানি।···প্রশ্ন হচ্ছে—বিশুদ্ধতার।···ঠুংরীর নামে বর্ণসংকর জিনিস শিখিয়েদের আমি সঙ্গীতজ্ঞ মানতে বাধ্য নই··· !

মিতালিদি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গুরুদেবকে অপমানিত হতে দেখলো ! মুখ ফুটে বললো না কিছু··· !

এতদিন ধরে মিতালিদি তার কাফি অথবা খাম্বাজ ঠুংরীতে কখনো কীর্তন, কখনো ভাটিয়ালি এবং কখনো পুরবীর ছোঁয়া লাগাতো। ওর প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণই ছিলো এই। মূল রাগের সঙ্গে কানামাছি খেলতে খেলতে ছোট-ছোট আঞ্চলিক, রাগিণীবান্ধবীরাও শ্রোতাদের মন কেড়ে নিতো।···মিতালিদি কঠোর-ভাবে ওদের পরিত্যাগ করলো।···কী আবার সাতসকালে—'বাজু বন্দ খুলি খুলি জায়ে'—মিতালিরাণী ? দোহাই ভগবানের, বন্ধ করো এসব।···ঠুংরী···বহুরূপী···! যে বেসেণ্ট হল-এ ওর প্রতিভার উদয় হয়েছিলো, সেই আসরেই আবার অস্তও হয়ে গেলো। গীতালি সে রাতটির কথা কী করে ভোলে !···সেদিন গীতালিদের বাড়িতে শোকের স্তব্ধতা নেমে এলো। গুরুজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ···শারদোৎসব সঙ্গীত সমারোহে মিতালিদি তার আলাপ-এর কলিটাকে পুরোও

করতে পারে নি, অমনি, হলময় কুকুর-বেড়ালের আওয়াজ ভাসতে লাগলো।··· নানা ধরনের রসালো মন্তব্য—মেটারনিটি সেণ্টারে পাঠাও। কণ্ডেমড মাল··· বোগাস···!

রাগে-দুঃখে তিন দিনের অনাহারী গুরুজীর সামনে গীতালি প্রতিজ্ঞা করলো। সেই দিনই গীতি-ব্রত ধারণ করলো গীতালি। সরল-সুগম-সহজ সঙ্গীতকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে সে।···মিতালিদির পরিত্যক্ত রাগিণীদের উদার মনে আশ্রয় দিলো গীতালি। ··

রেডিওতে সংবাদ প্রচারিত হতেই গীতালি সময়-সচেতন হয়ে উঠলো। চুপটি করে বসে যন্ত্রকারের কাজ করা দেখছিলো ও। যন্ত্রকার চোখ বুজে বসে পড়লো। ···সংবাদ শোনার সময় সে এমনি করেই আসন করে বসে।···বিশাল বিশ্বযন্ত্রের স্পর্শ-সুখ অনুভব করে সংবাদ শোনার সময়! বুঝলে নাতনী?···

তারপর ঘুঘলু রেডিও বন্ধ করে দিলো। গীতালির তানপুরাটা কোলে নিয়ে যন্ত্রকার বললো—দেখছিস্ এতে শুধু চারটিই তার। কিন্তু এই চারটি তারেই সাতটি স্বর সৃষ্টি হয়।···তোর দিদি সহায়ক নাদ-এর অবহেলনা করেছে। তুই কিন্তু তেমনটা করিসনি যেন। সৌভাগ্যবশতঃ যন্ত্রটি তোর উত্তম···!

এরপর যন্ত্রকার গীতালির তানপুরার মধ্যে ডুবে গেলো।···'প' স্বরে বাঁধা তার দিয়ে 'ধ নি রে'ই সহায়ক নাদ ঝঙ্কৃত হবে। 'সা রে গ প' কেন?···এই নিয়েই তুমি সারা ভারত সুর-সঙ্গম সমারোহে অংশ-গ্রহণ করতে যাচ্ছিলে? রাধে রাধে···।

রাধেশ্যামের কথা মনে পড়লো গীতালির। রাধে গিটারিস্ট! যে প্রতিভা বিকশিত হবার আগেই শেষ হয়ে যায়, তার জন্যে কার না দুঃখ হয়?···পাঁচরঙা জ্যাকেট এবং তলোয়ার-কাট গোঁফ। সে সময়টায় গীতালিদের বাড়িতে ওর ঘন ঘন যাতায়াত ছিলো। গীতালির কয়েকটা গানের সঙ্গে সে সঙ্গতও করেছিলো।··· সেদিন যন্ত্রকারের ওখান থেকে ফিরে এসে দেখলো—কে জানে কখন থেকে রাধেশ্যাম বসে আছে! মা রামকৃষ্ণ আশ্রমে কীর্তন শুনতে গেছে।···রাধেশ্যাম! রাধেশ্যামের মুখখানা ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।···যন্ত্রকারের কথানুযায়ী প্রত্যেক শিল্পীর মুখমণ্ডলের চারপাশে সুরতরঙ্গ কাঁপতে থাকে। সিম্ফনি কনসার্টের কণ্ডাক্টর মিঃ রেংকিনকে প্রথমবার দেখেই হারাধন যন্ত্রকার তার মুখমণ্ডলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে-থাকা সুর-তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিলো। 'সি' মাইনর থেকে 'ই' ফ্ল্যাট··· পিয়ানো, হর্ন, ওবো···ক্লারিওনেট···!

রাধেশ্যামের মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে অসুর-তরঙ্গ পাকসাট খাচ্ছে। গলা অব্দি গিলে নেশায় বুঁদ। গীতালির নৈঃশব্দ্যের ভুল অর্থ বুঝে কাঁপা গলায় বলল—ডার্লিং···! ডি-ড্-ডি-ডি-ডি-ডা-ডি-ডা-ডি-ডা-আ-আ!···গীটালি, মাই গিটা-আ-!···অকরামের 'অর্চনা কে বোল', শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, ধূপগন্ধ—রাধেশ্যামের কাঁপা গলা এবং মদের গন্ধ!···গীতালির সব থেকে ছোট ভাইয়ের বয়সী এ রাধেশ্যাম।

এত সাহস এর!···গীতালি চুপচাপ ভেতরে চলে গেলো।···

রাধেশ্যামের কাছ থেকে মুক্তি পেতে-না-পেতেই জামাইবাবুর একজন বন্ধুর আবির্ভাব ঘটলো। গীতিকার। জামাইবাবুর শিষ্য।···উনি গীতালির জীবনের সম্পূর্ণ গানের ঠিকে নেবার কথা চালালেন।·· যদি বলো, তবে দিনে পাঁচটা করে মিষ্টি গান রচনা করে দেখিয়ে দিতে পারি।···তুমি গানের লাইনে লাইনে তিনটে বিন্দুর মতো ছড়িয়ে রয়েছো --সজনী-ঈ, সজনী-ঈ, তুম···!

রাধেশ্যাম এক-আধটা ফিল্মী সুর সম্বল করে বেঁচে আছে। এতদিনে জামাইবাবুর গীতিকার শিষ্যটির যে-কোনো 'সজনী' জুটে গিয়ে থাকবে!···

নিঃসঙ্গ গীতালি। গান গাঁথে, সুর দেয়, গায়। দশ বছর ধরে গাইছে। যন্ত্রকার আরেকটা কথা বলেছিলো···গন্ধ! গানের মধ্যে যাতে গন্ধ পরিবেশন করতে পারো তার সাধনা করো! ··

তৃতীয় দিন। যন্ত্রকারের মুড বিগড়ে গেছে। ঘুঘলু বাইরে। গীতালি চুপটি করে কামরার একটা কোণে বসে আছে। সারা ভারত সুর-সঙ্গম-সমারোহের শেষ তারিখ ঘোষিত হয়ে গেছে। গীতালি যন্ত্রকারকে বললো- দাদু, আশীর্বাদ করুন। নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছি!

ঘুঘলু শালপাতার ঠোঙায় করে ঘুগনি এবং কচুরি নিয়ে এলো। চোখ পড়তেই যন্ত্রকারের মুড পাল্টালো; ভেতর থেকে গীতালির তানপুরাটা নিয়ে এলো ঘুঘলু। ফ্যান্সী-ওয়াড়টা খুলে বাইরে বার করে গীতালির দিকে ধরলো যন্ত্রকার—নাও। শুধরে গেছে। সবাইকে শুধরে দেবে। এর পুজো যদি নাও করো, সম্মান করো কিন্তু!···

গীতালি আঙুল দিয়ে তার কটি ছুঁলো। হারাধন যন্ত্রকার এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললো—আমার একটা কথা শুনবে? তোমার আঙুল কটি ছুঁতে দেবে?···হ্যাঁ হ্যাঁ, নাতনীর অবাক লাগছে—বুড়োটার এ আবার কী অভ্যেস—কখনো হাত দেখতে চাইছে, কখনো আঙুল ছুঁতে চাইছে! হো-হো-হো···! গীতালির আঙুল কটি নিজের কপালে ছুঁইয়ে বললো—ভয় হচ্ছিলো তোমার নখ কাটার ধরন আবার

বিদ্ঘুটে নয় তো ?···আঙুল ধরেই হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো—কী নাতনী, মনে কী বাজছে ? ·· কী, কী বাজছে মনে ? কী বলছে মন ? কোন্ সুরে ?···

সেদিন গীতালি হেসে জবাব দিয়েছিলো—কই, কোনো অজানা রাগিণী বাজছে না তো !···কিন্তু, আজ ? আজ সে শুনছে—স্পষ্ট···এমন একটা রাগিণী, যাকে ও বাঁধতে পারছে না।···ওর যন্ত্র হারছে না, ও হেরে যাচ্ছে।···যন্ত্রকার কোথায় ? আছেন, না··· ?

সেদিন সারা ভারত সুর-সঙ্গম সমারোহে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে দাদু হারাধন যন্ত্রকারকে প্রণাম করতে গিয়েছিলো ও।···শুনে অবাক হয়ে গেলো—ঘুঘলুসহ হারাধন যন্ত্রকার নিরুদ্দেশ। সুর-মন্দিরের লোকেরা যন্ত্রপাতি এবং অনেকগুলো জিনিসের চুরির কথা জানিয়ে পুলিশে রিপোর্ট লিখিয়েছে !···

···তারপর দশবছর কেটে গেছে।···দাদুমণি, আমি তোমায় জাদুমণি বলে ডাকবো। ···জাদুমণি, তুমি তোমার মৃগচর্ম আমায় দিয়ে দাও। আমি এর ওপর বসে সাধনা করবো। ··করবে ? করবে ? ডর ভয় নেই ? এ অশুভ মৃগচর্মে তোমার আবার কোনো অশুভ না ঘটে ! —মৃগচর্মখানাকে আরেকবার কপালে ছুঁইয়ে গীতালি ওখানাকে একপাশে রেখে দিলো।···এর ওপর বসে বসে সে সাধনা করেছে।···চিতল, চিত্রা···চন্দন-চাকতি···রক্তের দাগ···ডট-ডট-ডট ···!

দশ বছর বাদে, আজ, দাদু হারাধন যন্ত্রকারের কথা ভাবতে বসে মন ইমন-পদ-বিন্যাসের ব্যবহার করছে।—গীতালি এখন নিজেকে একটা যন্ত্র ভাবে। অচেনা হাতের আঙুল ওকে বাজিয়ে যায় বার বার !···অদৃশ্য মুখর জগতের কার্যকলাপে বাধা পড়ে। তিনটে জলন্ত বিন্দু নিভে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকে পিয়ন চিঠি দিয়ে যায়।···কুমারী গীতালি দাস —'গীত মহল'··· !

হে দেব !···হে দেবী, একী ? স্বপ্ন নয় তো ?···এ কী সত্য ? ভারতপ্রসিদ্ধ সেতার-বাদক অকরামের প্রণয়নিবেদনপূর্ণ পত্র তো এখানা ?···শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি··· ধূপ-গন্ধ ! অর্চনা কে বোল !···ললিত-এ ! ··বিলম্বিত দ্রুত !···এটা কী করে সম্ভব হলো ? দশ বছর ধরে চাপা থাকা কথা আজ কী করে বেরিয়ে পড়লো ?···মা !

অকরামের চিঠিতে স্বর আছে। এর ছত্রকটি ঝঙ্কৃত হচ্ছে !···শঙ্খ এবং ঘণ্টা ধ্বনির মধ্যে অকরামের কণ্ঠস্বর শোনে গীতালি ! চিরসঙ্গী তানপুরার সাহায্য নেয় সে। দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ! তার চারটি দিয়ে অকরামের কণ্ঠস্বর প্রসারিত হয়। ···গীতালি !···গীতালি···আমি অকরাম। গত আট বছর ধরে শুনছি, শুনছি কেন —উপভোগ করে আসছি তোমার গীতি-গন্ধ !···ধান ভানতে থাকা, জাঁতা চালাতে

থাকা, গরু চরাতে থাকা সুন্দরীদের নোনতা গন্ধ, ধান ক্ষেতের, পুকুর এবং ঘাটে জল ভরতে থাকা সুন্দরীদের আঁচল-গন্ধ…সুগন্ধ…বনফুলের সুগন্ধি সুরভিময় গীতিকার প্রাণোচ্ছল গায়িকা আমার ঘ্রাণশক্তি সুতীব্র করে দিয়েছে।…আমি 'গীতগন্ধা' এবং 'গীতালি গঙ্গা' নামক দুটো গৎ রচনা করেছি।…সেদিন কিন্তু তুমি কার্পণ্য করেছিলে, কিংবা? না, ওরকম কোরো না আর। আমি তোমার কণ্ঠ দিয়ে এখন পর্যন্ত অগীত গীতির অবতরণ ঘটাব। গীতিগন্ধা! তোমার সান্নিধ্য আমার কাছে পরম সৌভাগ্য বলে পরিচিহ্নিত হবে… !

আর এ দ্বিতীয় চিঠিখানা কর্কশ ঝঙ্কার তুলেছে! …হারিয়ে যাওয়া হারাধন-দাদুমণি!…ওগো নাতনী! শিব প্রসন্ন হয়েছেন। চোখ খোলো। …গত সপ্তাহে তোমাকে শোনার পর আমার বাড়িতে ছুটে এসেছিলো মাস্টার! তোমার নাতনীর মন খারাপ হয় যাচ্ছে না, মন চুরি? তোমার দেওয়া জিনিসের উত্তাপ কিন্তু তার শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে।…বিড়বিড় করতে শুরু করেছিলো—মাস্টার! …আজ তোমার নাতনী গাছের তলায় এক কলসী মধু নিয়ে বসেছিলো। গানের বইও ছিলো…কিন্তু…একটানা অনেকগুলো কিন্তু বলে গেলো…ক্রন্দন…ও এখন ছটফট করছে, নাতনী!…কী আজ মনে কী বাজছে…বসন্ত বাহার? স্বয়ম্ভু নাদেরই করুণায় এসব ঘটে। জাতি-বিচার? শিল্পীর জাতি…গ্রাম-জাতি-বাদী সংবাদী…এসব রাগ পরখের সময়?…

তৃতীয় চিঠিখানা বোবা! গত তিন বছর ধরে প্রতিটি শুভ মুহূর্তে শিল্পময় কার্ড এঁকে পাঠায়…শিল্পী! রামকৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিকোৎসবে মণ্ডপ এবং বেদী ইত্যাদির রচনা করে মনোহর রায় সবার মন হরণ করে নিয়েছে।…গীতালি বেদীর কাছে একনাগাড়ে কয়েকঘণ্টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো।…ক্ষমা করে দিও মনোহর, গীতালি তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে। তুমি চাইলে গীতালি তার সম্পূর্ণ রং উজাড় করে ঢেলে দিতো! তিন শূন্য…নিশ্চুপ রইলে তুমি—সর্বক্ষণ। শিল্পী!…গীতালি সুর-জীবিনী। দশ বছর আগেই সে কারো সুরে বাঁধা পড়েছে।…তবুও তুমি কিছু বলতে তো পারতে…আজো তোমার চিঠি নির্বাক।…অকরাম শঙ্খধ্বনি করছে।…সুপ্রিয় মনোহর!…অকরাম!…সুপ্রিয় অকরাম! তুমি কত বড় গুণী! তুমি কী করে সব কিছু জেনে নিলে? …গন্ধ? গুরুদেব, এসব তোমারই কৃপার প্রতিফল! 'অর্চনা কে বোল' শোনার সময় আমি ধূপের গন্ধ পেয়েছিলাম। প্রথমবার তুমিই সে গন্ধ পরিবেশন করেছিলে! তোমার জিনিস তোমাকেই… ! গ্রহণ করো…আমি যন্ত্র! আমি তোমারই! আমাকে বাজাও—কৃতার্থ করে দাও… !

গীতালি কাছে রাখা তানপুরাটার তার ছুঁয়ে ঝঙ্কার তুললো। মূল নাদ থেকে নয় গুণ জোরে সহায়ক নাদ প্রতিধ্বনিত হলো!…

…তোমরা শুনে থাকবে অকরাম…দাদুমণি… ঘুঘলু ব্যাণ্ডপার্টিতে হর্ন বাজায় …তোমরা সবাই শুনে থাকবে…! গীতালি অকরামের গলায় গীতিমাল্য পরিয়ে দিয়েছে…'এ' মাইনরের তীব্র স্বর 'এফ' মেজরের আনন্দোল্লাস…!

গীতালি পরমহংসদেবকে নমস্কার করলো। পরমহংসদেবের কথামৃত ধ্বনি ফুটলো—মানুষের মন যেন সর্ষের পুঁটুলি!…

…গীতালির দুই চোখ বেয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরছে। গলা দিয়ে একটা অজ্ঞাত রাগিণী চুঁইয়ে পড়ছে।…

অদৃশ্য-মুখর জগতে অকরামের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে গীতালি…!

স্প্রিং ॥ শ্রীগিরীশ আস্থানা

পাশ ফিরতে গিয়ে বরিয়মের হাত যখন কোমল স্পর্শ পেল না তখন ঘুমের মধ্যেই এদিক ওদিক খুঁজল, পম্মী পালঙ্কে ছিল না। বরিয়ম শুয়ে শুয়েই ভোরের বাসি জ্যোৎস্নায় চোখ মিট্‌মিট্‌ করে এদিক ওদিক দেখল। পম্মীকে না দেখে মিষ্টি মধুর আওয়াজে ডাকল, 'পম্মী ডার্লিং।'

পম্মী সে সময় বেলফুলের কেয়ারীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ফিরে এল। বরিয়ম উঠে বসে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, 'কি ডিয়ার, ঘুম আসছে না, নাকি?'

পম্মী উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'শুয়ে পড় ঘুম এসে যাবে।'

'আমি এখন শোব না, তুমি শুয়ে পড়।'

'ড্রিং কিছু বেশী হয়ে গেছে কি?'

'আমি তো শুধু দুটো জিমলেট নিয়েছিলাম।'

'পার্টি কেমন হলো?'

'ভালই হয়ে থাকবে, তুমি খুব ভাল করেই জানো।'

'মনে হয় কাজ তো কিছু হাসিল হবে'—বরিয়ম ভেবেচিন্তে বললো, 'কিন্তু পরশুর জন্য তৈরি হতে হবে। খুব জরুরী পার্টি, চোপড়া বেনারস থেকে আসবে।'

'কোন চোপড়া?'

'সেই রেলওয়ে ম্যান, যে প্রেসার টেস্টে তিন বার স্প্রিংগুলোকে রিজেক্ট করেছে। হী ইজ্ এ টাফ্ নাট্! বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে ওর, এবার ওর থেকে কাজ আদায় করতেই হবে।'

'আমি তো সবারই বিশেষ খেয়াল রাখি।' পম্মী উপেক্ষা ভরে বললো।

'না, মানে স্পেশাল মেনু হওয়া চাই। অফিস থেকে কুক্‌কে তোমার কাছে

পাঠিয়ে দেবো। কথাবার্তা বলে সকালে মেনু ঠিক করে নিও, যাতে সারা জীবন যেন মনে থাকে কি কোথাও খেয়েছিলাম বটে।' এতসব বলে বরিয়ম শুয়ে পড়ল। দু'মিনিট পরে নাসিকা গর্জন শোনা গেল। পদ্মী ফের ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো, এমনিই। মন খুব বিরক্ত ছিল, আধঘণ্টা আগে সে হড়বড় করে উঠে বসেছিল। হয়তো ও কোন ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। বরিয়ম পাশেই শুয়েছিল। চাঁদের আলোয় ওর চেহারা পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে ও নিজের রূপে অবতীর্ণ হয়। চেহারা থেকে সযত্নে পরিহিত কোমলতার মুখোশ খুলে যায়। বরিয়ম খুবই কুশলী অ্যাক্টর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠার ঘণ্টা একটি সুন্দর মুখোশ পরে থাকে, যার জন্য তার চেহারার ক্রূরতা নম্রতায় বদলে যায়, ঘৃণা মধুর হাসিতে আর হৃদয়হীনতা সম্ভাবনায়। কথা বলে যেন মুখ দিয়ে ফুল ঝরছে। ভিতরে আর বাইরে কত তফাত! পদ্মীর মনে হচ্ছিল ও যেন এক নেকড়ের পাশে শুয়ে আছে। ওর কেমন শিরশির করতে লাগলো! দূরে জেলে চারটার ঘণ্টা বাজল। রাত বেশ ভেজা ছিল। পদ্মা পালঙ্ক থেকে নেমে খালি পায়েই ঘাসের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। পায়ের তলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শিশির বেশ ভাল লাগছিল। হাওয়ার ঝাপটা এলে হাসনুহানার নেশাভরা গন্ধে নাক ভরে যেত।

লনের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কোল্ড ড্রিংক খাবার স্ট্রগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত পার্টি চলেছিল। জ্যোৎস্না রাতেই বরিয়ম বেশীর ভাগ ককটেল ডিনার পার্টি দেয়, বেশীর ভাগ বুফে ডিনার। প্রাণ খুলে মদ খাওয়ায়। নারী পুরুষের অট্টহাসি যেন এখনও রাতের নীরবতায় গুনগুন করে ফিরছে।

পদ্মী প্রত্যেককে শিরায় শিরায় চেনে। আধা বয়সী মিসেস ওয়াকর যে পুরুষের মতো হা-হা করে হাসে। স্লিম আর স্মার্ট অ্যাংলো যুবতী লুসি বরিয়মের সেক্রেটারী। টেলিফোন অপারেটর নীনা টেলর, হাসে তো যেন অনেক ছোট ছোট রুপোলী ঘণ্টা একসঙ্গে বেজে ওঠে। নীনা পাকা খেলোয়াড়। বস্তির কাছাকাছি থাকে। সম্ভ্রান্ত ইউরোপিয়ান মহিলাদের মতো ঠাট। ওর চোখ থেকে কামুকতা উপচে পড়ে। পুরুষের সামনে এমনিভাবে চেয়ে থাকে যেন সবাইকে উন্মুক্ত নিমন্ত্রণ দিচ্ছে। নিজের ছোট বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আসে—'সোসাইটিতে ইনিশিয়েট করাতে'।

সাধনা বোস অফিসের অ্যাসিসটেন্ট। এসেছিল যখন সুন্দর আর সরল লাগতো। দু'বছরেই বেশ মোটা হয়ে গেছে। মা বাবা খুব মুশকিলে ওকে কখনও

কখনও রাতে আসার অনুমতি দেয়, অবশ্য যদি কথা দেওয়া হয় অফিসের গাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কণ্ট্রোলার দেশাই আর তার শুকনো কাঠি সদৃশ বৌ রমাবেন! ওয়ার্কস ম্যানেজার বসন্ত সিং। কালো রং, বেঁটে শরীর, বিচ্ছু মার্কা মোচ! প্রয়োজনের বেশী বড় পাগড়ী বাঁধে। নেশা হলে চোখ কপালে ওঠে। হাসলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হাঁমুখটা বেশী রকম প্রসারিত হয়ে পড়ে। সে সময় ওকে চল্লিশ চোরের সরদার (আলিবাবা) মনে হয়, যার গাধা আশেপাশেই কোথাও ঘাস খেতে গেছে। বরিয়ম আর আলিবাবা একে অপরকে ঘৃণা করে। একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, তো অপরজন ডাইরেক্টর। কিন্তু একজনকে ছাড়া অপরজনের চলে না।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজর পুরী, যে এখনও অবিবাহিত। রাত বারো-একটা পর্যন্ত হোটেল ক্লাবে থাকার অভ্যেস। সব কাজ নিশ্চিন্ততায় করে। সহজভাবেই ড্রিংক করে, যেন ড্রিংক করছে না। মেয়েদের ব্যাপারে শৌখিন, কিন্তু কখনও ভাবুক হয় না। সঙ্গে থাবে, পান করবে, খেলে বেড়াবে, কিন্তু সেই অবস্থায় ওভার ড্রাফট দিতে সরে আসবে, হেসে বলবে, 'আই অ্যাম সরি। রাতে নেশার ঘোরে কথা দিয়ে থাকব! লোন দিয়ে দেবো, সিকিউরিটি নিয়ে আসুন।' বরিয়ম ওর পেছনে নীনাকে লাগিয়ে রেখেছে'—বদমাস কখনও তো গলবে?

আরও লোকদের সময়ে সময়ে ডাকা হয়, হোলি ব্রাদার্সের ম্যানেজার গাঙ্গুলী, যার সমস্ত শরীর বেলুনের মত ফোলা। হোলি ব্রাদার্স তার মালের ডিষ্ট্রিবিউটার।

স্টাফের নতুন নিযুক্ত যুবক ইঞ্জিনিয়র জোশী, সিন্হা আর কোহলী যাদের ফালতু লোভ দেখিয়ে বরিয়ম ফাঁসিয়েছে। দিন রাত ডবল শিফটে আর ছুটির দিনে কাজ করিয়ে ওদের ঘর্মাক্ত কলেবর করে ছাড়ে। সময়ে বরিয়ম ওদের কনফার্ম করবে না। করেও যদি তো কোম্পানীর দুরবস্থার এমনি চিত্র চিত্রণ করবে যাতে দেখা যাবে কোম্পানী রসাতলে যেতে বসেছে। এইভাবে বেচাকেনা করেই ও মাইনে কমিয়ে দেবে, আর আগের থেকে তাদের দ্বিগুনাই খাটাবে। আর চাকরি-ছেড়ে কেউ গেলেই তাকে এমনি সার্টিফিকেট দেবে যেন অন্যত্র চাকরি পেলেও করতে না পারে। বেচারা! মজদুরদের মতো কথায় কথায় তো এরা ধর্মঘটও করতে পারে না। আর এমনিভাবেই তিন-চার বছর কাজ করার পর এক-দিন নিংড়ানো লেবুর মতোই বার করে ওদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

পন্মীর কি জানি কেন কোহলীর ওপর দয়া হয়। গরুর মতো এমন কাতর

দৃষ্টিতে ও ওকে দেখে, যেন মনের ভেতর কি আছে জেনে নিচ্ছে। বুঝতে পারে না কার, কার ওপর দয়া আসে! সেই দুঃখী মন নিজের সমস্যা নিয়ে কখনও কখনও ওর কাছে আসে। মনে হয় ওকে বলে যত তাড়াতাড়ি পারে এই কোম্পানী থেকে পালিয়ে যাওয়াতেই ওর কল্যাণ। কিন্তু ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পত্নী হওয়ার জন্ত মুখে তালা বন্ধ হয়ে যায়। ও মুচকি হেসে বরিয়মের কথারই পুষ্টি জোগায় যে যদি অমুক অমুক যোজনা সফল হয়ে থাকে তবে তার উন্নতি নিশ্চিন্ত। কোহলী আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পম্মীর ডান পায়ে নরম নরম কিছু ঠেকল। ও উঠিয়ে দেখল একটা রুমাল। রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখ থেকে একটা খারাপ গালি বেরুল। ভেজা ঘাসে রগড়ে রগড়ে ও ওর পায়ের তলা পরিষ্কার করতে লাগল। ওর মনে এলো, সেই সময় হাসনুহানার এই ঝোপে অন্ধকার ছিল। ও দূর থেকে নীনাকে কোন মানুষের সঙ্গে এদিকে আসতে দেখেছিল। কে ছিল সে? অনেক মাথা খাটিয়েও তার মনে এলো না। —এখন সকালে সুইপার এই রুমাল ওঠাবে, শুঁকবে, ওর চোখ বিস্তারিত হবে। ও এটা ধুয়ে রেখে দেবে। হয়তো ও নিজের কোয়ার্টারে গিয়ে মেথরানীকে বলবে। আর একথা ঘরে ঘরে ছড়াবে, 'শালা হারামী বড়লোকরা এসবই করে!'

বড়লোক! পম্মী মনে মনেই হাসল! বরিয়ম সিং রেওড় (রাখাল) সিং-এর ছেলে। বাপ হয়তো ছাগল ভেড়ার রাখালি করত। ছেলে তেজী হয়েছে, লোহার যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে করতে ওয়ার্কসপ খুলে বসেছে। যুদ্ধের সময় ও মস্ত সুযোগ পেল। আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্প্রিং বানাবার কারখানা খুলে বসল। .

কিন্তু দুরাচারের সাহায্য না নিয়েই কি বিজনেস করা সম্ভব নয়? পম্মীর সংস্কারে আঘাত লাগে। এই পার্টি থেকে সে বিতৃষ্ণাই পাচ্ছিল। কিছুই তো স্বাভাবিক ছিল না…হাসি, হা-হি করা, জোক্স, সব একদম কৃত্রিম, কিন্তু পাস বইতে তাড়াতাড়ি বর্ধিতমান সাত অঙ্কের ব্যালেন্স দেখে মনও পুলকিত হয়। ও কেন বেকার নিজের মাথা ঘামাতে যায়?

বরিয়ম হাসতে হাসতে বন্ধুদের বলত যে ও স্বর্গে যেতে চায় না কারণ স্বর্গে কোন ব্যাঙ্ক নেই। প্রত্যেকটি জিনিসেরই প্রাচুর্য থাকে, যার যত দরকার নিয়ে নাও। আরে ভাই, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মজা তো তখনই যখন নিজের কাছে হাজার-লাখ লোকদের চাইতে বেশী টাকাকড়ি থাকে। আর এই দৌলত ব্যক্তিগতভাবে নিজের বুদ্ধি ও শক্তির জোরেই রোজগার করা হয়েছে। হ্যাঁ, বরিয়ম নিজের

অন্তঃকরণ নিজেই জয় করে নিয়েছিল। ওর উপদেশ দেবার অভ্যেস ছিল। ও পম্মীকে বলেছিল অন্তঃকরণ যদি কাজে বাধা সৃষ্টি করে তো তাকে মেরে ফেলো—কিল ইট ! শান্ত মনে ভাবো আর কঠিন মুহূর্তে নিজের ব্যবহার কুশলতায় কোন রাস্তা বের করে নাও। বরিয়ম এ কথায় খুব জোর দিত। সে স্বয়ং নিজেই হাজার সঙ্কটে পড়লেও ব্যবহার কুশলী ছিল। ব্রিগেডিয়ার যশোবন্ত সিং, পম্মীর বাবা, ওর জালে নয়তো কেন ফাঁসতো ?—পম্মী এখন পরিষ্কার দেখতে পায়…ক্লাবের বিলিয়ার্ড রুম যেখানে বরিয়ম প্রথম প্রথম ওকে দেখেছিল। ও মিষ্টি মিষ্টি কথায় বাবার মন জয় করে নিয়েছিল। দুই একবারের সাক্ষাতেই ও খানদানের কৈফিয়ত জেনে নিয়েছিল। প্রেমজিৎ কউর ওরফে পম্মী ব্রিগেডিয়ার সাহেবের একমাত্র কন্যা। যে-কোনভাবে বরিয়মের বিয়ে ওর সঙ্গে হয়ে যায় তো…শরীর যতই মজবুত হোক বুড়ো কতদিনই বা আর বাঁচবে ?…তখন শহরের সমস্ত জমি-সম্পত্তির মালিক হবে বরিয়ম। আর মরে বেঁচে ওর সাথে মিলেমিশে লাভ উঠিয়ে সেনা বিভাগে স্প্রিং সাপ্লাই তো করতেই পারবে। রিটায়র হবার আগে ব্রিগেডি-য়ার কিছু ফৌজী ঠিকেদারী তো নিজের জামাইকে দিয়ে যাবেই।

বরিয়মের মাথায় যদি কোন স্কীম আসে তো সেটা ভূতের মতো ওর পেছনে পড়ে যায়। ও বাবাকে নিজের ফ্যাক্টরী দেখবার নিমন্ত্রণ খুব তাড়াতাড়িই দিয়েছিল। যদিও কাউকে প্রভাবিত করতে চাইত তো নিজের ফ্যাক্টরী অবশ্য দেখাতো। 'শো' খুব সুন্দরই ছিল। উর্দিধারী দারোয়ান গেটে দাঁড়ানো থাকতো—যে সুন্দর-ভাবে মিলিটারী সেলাম দিত। অফিসে আগন্তুককে ল্যাভেণ্ডারের সুগন্ধী ছড়ানো অ্যাংলো মেয়েদের পাশ দিয়ে এয়ার কণ্ডিশন ঘরে নিয়ে যেত। ঝক্‌ঝকে টেবলের এক কোণে রাখা ওর (পম্মীর) এনলার্জমেণ্ট ফটো, কার্নিসে রাখা আখরোটের কাঠের বানানো গান্ধীজীর তিন বাঁদরের মূর্তি আর ঘরের এক কোণে সাজানো আধা দর্শন ক্যাকটাসের বিলক্ষণ চারা আগন্তুকদের অবশ্যই প্রভাবিত করতো। বরিয়ম কথার সূত্র জুড়ে যেতো। আগন্তুকদের ফটোর দিকে ইশারা করে বলতো, 'আপনি বুঝতেই পারছেন। ইনি আমার স্ত্রী। খুব ভাল মেয়ে, অতিথির আতিথেয়তায় নিজেকে নিজে ভুলে যায়। আপনাকে নিশ্চয় এর সাথে পরিচয় করাবো…আর এই ক্যাকটাস আমি ব্রাজিল আর আর্জেণ্টাইনা থেকে আনিয়েছি। মশায়, এই ক্যাকটাসের চারা আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় একেবারে অনুকূল। সব পরিস্থিতিতেই খুশী থাকে। এই জন্যই, মশায়, আমার গাছের মধ্যে ক্যাকটাস আর জন্তুর মধ্যে উট পছন্দ।'

আম্মার লাঞ্চরুমে জমজমাটি লাঞ্চ। উর্দিপরা বেয়ারাদের সার্ভিস। পানের জন্য বীয়ার, জীন, অথবা যা আপনি চান। লাঞ্চ খেতে খেতে সে মাননীয় অতিথিকে হেসে হেসে নিজের 'সফলতার গল্প' বলে—যে তিন বছর আগে পাঁচটি মজুর দিয়ে কাজ শুরু করিয়ে কারবার এত বাড়িয়েছে যে এখন ফ্যাক্টরীতে তিনশ মজুর কাজ করে, যে সে দেশের জন্য লাখ টাকার বিদেশী মুদ্রা আমদানি করে। এটাও ওর প্ল্যান যে সামনের তুই বছরে ও মজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে আট শ করবে আর তখন ওর কারখানা এশিয়াতে স্প্রিং বানাবার সব থেকে বড় কারখানা হবে...কিন্তু মাঝখানে সবচেয়ে বড় বাধা এই যে সরকার তাকে স্পেশাল স্টীল আমদানি করার জন্য বাঞ্ছিত মূল্যের লাইসেন্স দেয় না...এখন কিছু বছর পর্যন্ত বিশেষ প্রকারের এরকম ইস্পাত, যেটা মেইন স্প্রিং বানাবার কাজে আসে, আমাদের দেশে বানানো সম্ভব নয়। কি অন্যায় মশায়, প্রয়োজন অনুসারে সরকার লাইসেন্স দেয় না, নতুবা আমি এমন কাজ করে দেখাতাম যে ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরাও চেয়ে থাকত।

বাবাও হয়তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো বরিয়মের এই সফলতার গল্প শুনে থাকবে। লাঞ্চের পর তাঁকে ফ্যাক্টরীর রাউণ্ড দিতে নিয়ে গিয়ে থাকবে যেখানে তার প্রতিদিনের চল্লিশ-পঞ্চাশ মজুরের অতিরিক্ত তুইশত 'ডামী' (যাকে সে 'টয়টু' বলে) কাজ করে থাকবে, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লেখাপড়া না জানা ছোকরা হবে, যারা যন্ত্রপাতি ধরবার কায়দাও জানে না। তু'দিন আগে সে আলিবাবাকে ডেকে আদেশ দিয়ে থাকবে যে সে যেন তুইশত টয়টুর বন্দোবস্ত করে দেয়, বারো আনা দৈনিক হিসাবে।

বরিয়ম এই ট্রিক বড় বড় সরকারী অফিসারদেরকে বোকা বানাবার জন্য কাজে লাগায় যাতে তার ইমপোর্ট লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তাকে উঁচু করে দেখানো যায়। তাদের সামনে ও অনুনয় বিনয় করে বলে যদি পর্যাপ্ত মূল্যের লাইসেন্স ও না পায় তো বাধ্য হয়ে ওকে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। ওর নিজের লাভের সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই, কিন্তু তিন-চারশো গরীব মজত্বরের পেটে লাথি পড়ে তা ও দেখতে পারবে না।

একবার তো লাইসেন্স অধিকারীর সামনে গরীব মজত্বরদের বেশ প্লীড করতে করতে ওর চোখ থেকে সত্যি সত্যিই জল উপচে পড়েছিল, এ জল গ্লিসারিনের ছিল না!—এমনিই কুশল অভিনেতা বরিয়ম!

লাইসেন্স অধিকারী এমনি প্রভাবিত হয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের প্রধান

ইনস্পেকটরকে ইনস্পেকসনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, অস্থিচর্মসার মুরগী, আর তার স্যুপ? সরকারী ইনস্পেকটরের সামর্থ্য? নোটের ঝলক দেখাও, আর তা ডান পকেটে রাখো বা বাম পকেটে, মনমতো রিপোর্ট লিখিয়ে নাও (কোন অসুবিধা আছে তো উপায়ও ওই বাৎলে দেবে।)

আর যখন সাহেব স্বয়ং নিরীক্ষণ করতে এসেছেন তখন সারা রাত ধরে বানানো উৎপাপদন আর বিক্রির হিসাবের থাড়ো রেজিস্টারের সামনে পেশ করে দেওয়া হয়েছে। লম্বা চওড়া অর্ডারের লিস্ট, যেটা স্পেশাল স্টীলের অভাবে সাপ্লাই করা যেত না, লিস্ট যেটা বিশেষ করে খরিদ্দারের কাছ থেকে আনানো হয়েছিল, খরিদ্দার যে তৈরি মালের চাইতে আমদানি করা ইস্পাতের ওপরে বেশী আগ্রহশীল ছিল।

বরিয়মের 'সফলতার গল্প' সাহেবও শুনেছিল এবং সে খুশী হয়েছিল। বরিয়মের অদ্ভুত ব্যাপার কুশলতার ছাপ সাহেবের মনেও পড়েছিল যেমন পম্মীর বাবার ওপর পড়েছিল। বরিয়ম হয়তো ভেবেছিল পম্মীকে পাওয়া কোন মোটা রকমের ইম্পোর্ট লাইসেন্স পাওয়ার চাইতে কোন অংশের কম হবে না। ও বাবার সামনে নিজেকে নিজে বিছিয়ে দিয়েছিল। তিনি গদ্‌গদ হয়ে উঠেছিলেন আর তখন থেকেই বরিয়মকে নিজের ভাবী জামাই-এর রূপে দেখতে লাগেন। ওর প্রশংশা করতে তিনি ক্লান্ত হতেন না।

এবং একদিন বরিয়ম পম্মীর ড্রইংরুমে দাঁড়িয়েছিল, হাত জোড় করে, সজ্জনতা আর শালীনতার মূর্তি সেজে! ঠোঁটের ওপর সেই ছলনাময়ী মুচকি হাসি, বাবা যেমন বলেছিলেন একেবারে সেইরকম। লজ্জায় পম্মীর গাল লাল হয়ে উঠেছিল। ও কিছুটা নিজেকে নিজে সামনে নিয়ে আধুনিকার মতো হেসে তাকে স্বাগত করেছিল। সেদিনের পর থেকেই বরিয়ম তো আমাদের বাড়ি আসার ছাড় পেয়ে গেল। ও আর পম্মী প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে যেত। ও খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, সমস্ত পৃথিবী সংসারের, কিন্তু সব কথার সুর স্প্রিং-এ এসে শেষে হতো। ও স্বপ্ন দেখতো। ···ওর স্প্রিং শুধু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র নির্মাতাদের কাজেই না, প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকোবে, ফৌজী ওয়ার্কসপে, জাহাজী তার বিমান কোম্পানীতে, মোটর কোম্পানীতে, রেলে···মানে এই যে প্রত্যেকটি কারখানাতে যেখানেই যন্ত্র তৈরি হয়।

আজকাল তো ওর ফ্যাক্টরীতে সিকি ভাগ ইঞ্চির হাল্কা স্প্রিং থেকে এক ফুট পর্যন্ত ওজনের এক গ্রাম থেকে দু কিলো পর্যন্ত—স্প্রিং বানানো হয়। কিন্তু ও প্ল্যান

বানিয়ে নিয়েছে যে যদি লোন পাওয়া যায় আর লাইসেন্স পেয়ে যায় তো ও মণ মণ ওজনের স্প্রিং বানাবে।

পদ্মী শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেল; 'বরি! এখন বন্ধ করো তোমার স্প্রিং-রাগ। আমার তো মনে হয় তোমার মগজের কোন স্প্রিং ঢিলা হয়ে গেছে।'

বরিয়ম হাহা করে হেসে উঠত। বলত, 'যদি এরকমভাবে আমাকে বকতে থাকো তো বিয়ের পর আমার কাটবে কি করে?'

'কাটবে, খুব কাটবে ডার্লিং,' ও বলতো, 'এমনি হাজব্যাণ্ডই মেয়েরা পছন্দ করে যার মগজের স্প্রিং একটু ঢিলা, যাতে সময়ে সময়ে তাকে টাইট করবার সুযোগ মেলে।'

বরিয়ম আরও জোরে হাহা করে হেসে উঠত।

আর এ ভাবে হাসতে—বলতে বলতেই দু'জনে একদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। বরিয়মের স্বপ্ন তখন থেকেই ওর স্বপ্ন হয়েছিল। ওর বরিয়মের মতো, রোজ রোজ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে বাড়তে দেখার চিন্তা লেগে থাকত।

ওরা দুজনে একসঙ্গে একটা ইংরেজী বই দেখেছিল। যার নায়ক (খল-নায়ক বলাই উচিত) নিজের আসল, কুরূপ বীভৎস চেহারাকে দিনে মোমের আকর্ষক মুখোশে ঢেকে রাখত আর রাত্রে নিজের আসল, ভয়ংকর রূপে মেয়েদের হত্যা করতে বেরুত··· পদ্মী তো চেঁচাতে গিয়ে থেমে গেল, ও বরিয়মের কাঁধ জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। ও আস্তে আস্তে হেসেছিল, 'এত দুর্বল মন তোমার পদ্মী?—মনকে শক্ত রাখো!' —আর শো শেষ হবার পর ও অভ্যাসানুযায়ী মনে সাহস রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর এক লম্বা চওড়া ভাষণ দিয়েছিল। সেই ছবিটা বরিয়মের খুব পছন্দ হয়েছিল। ওর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষকে যাকে 'কাউন্ট' করা হয়, অথবা যে বোকা নয়, দুটো চরিত্র হয়। এক আসল, অপরটি নকল। তার ছদ্মবেশ-মানে যে রূপে সে পাব্লিকের সামনে আসে—এক মস্ত বড় সত্য। কারণ এই রূপ ওর নিজের জীবনে ওপরে ওঠার সহায়তা করে। বরিয়ম বলেছিল যে ঐ ছবিতে নায়ক প্রতীকরূপে এই সত্যেরই উদ্ঘাটন করে।

অবাক! ও বরিয়মের মুখ দেখতে থাকল। ওর ভাষণ ছাড়াও ও সেই ভয়ানক চরিত্রকে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি আর মনে মনে তাকে ঘৃণা করতো, আর ওর দুর্ভাগ্য, যেমন যেমন দিন যাচ্ছে পদ্মীর কাছে সেই ভয়ঙ্কর ফিল্মের নায়ক আর বরিয়মের চরিত্রে খুবই সাম্য দেখা যাচ্ছিল। যখন কখনও সন্ধের আবছায়ায়

বরিয়মের সঙ্গে হঠাৎ ওর সামনাসামনি হয়ে যায় তো ওর শরীর শিরশির করে ওঠে।

ও খবর পেয়েছিল যখন ও নার্সিং হোমের মেটারনিটি ওয়ার্ডে পড়েছিল তখন নীনা আর লুসি আর কখনও কখনও সাধনাও) মাঝ রাত পর্যন্ত পম্মীর ঘরেই ওর পালঙ্কে, বরিয়মের সঙ্গে শুয়ে থাকত, নেশায় বুঁদ! আর সকালে সকালে সেই বরিয়মই হেসে হেসে 'ডার্লিং ডার্লিং' করে তাজা ফুলের বড় বড় তোড়া নিয়ে যখন পম্মীর কাছে আসত তখন ওকে মনের ব্যথা চেপে হাসতে হতো। সত্যিই ও ওর মনকে 'শক্ত' করছিল!

পম্মী ভাবছিল যদি বরিয়মের কুকীর্তির একটু আভাসও বাবাকে দিয়ে দেয়… এক মুহূর্তের জন্য ও যেন দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার সিং, ওর বাবা, সোজা ধীর পদক্ষেপে বরিয়মের ঘরে প্রবেশ করছে। উভয়ের চার চোখের মিলনেই তাঁর ওষ্ঠ কেঁপে উঠছে, 'শয়তান, কুকুর,' চাপা আওয়াজ বেরুচ্ছে—আর তিনি কোমরে বাঁধা পিস্তল বের করে ফায়ার করে দিচ্ছেন ঠাঁয় ঠাঁয়।

বরিয়মের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

পম্মী প্রস্তর মূর্তিবৎ, হতবুদ্ধি প্রায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা তেমনি ধীরভাবেই ওকে দেখছেন। বলছেন, 'আমি তোর সোহাগ কেড়ে নিয়েছি মা, আমায় মাপ কর!'—আর তিনি পিস্তলের নল নিজের বুকে লাগিয়ে গুলি ছুঁড়ছেন।

পম্মী যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। না, না, এসব হবে না। ও নিজের মনকে শক্ত করবে।

বয়ে গেছে! ওর ধন দৌলতের নেশার কাছে সব নেশাই ফিকে হয়ে যায়। পম্মী দ্বিতীয়বার বিছানায় শুল, তখন পূর্বদিকে হালকা হালকা লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছিল, ঘুরতে ঘুরতে ও খুবই ক্লান্ত ছিল, 'এখন তো দু'ঘণ্টা নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা যায়।' ও ভাবল আর চাদর টেনে নিল।

তৃতীয় দিন চোপড়ার সম্মানে ডিনার হয়। পম্মীর মনে হল বরিয়ম কিছু নার্ভাস, যদিও ওপরে ওপরে ও বেশ শান্ত। প্রত্যেকবার ওর স্প্রিংগুলো প্রেসার টেস্টে ভেঙে যেত। যদি চোপড়া সেগুলো পাস করে দেয় তো সারা হিন্দুস্থানে রেলকে ও নিজের স্প্রিংগুলো সাপ্লাই করতে পারবে। রাতারাতি কোটিপতি হবার বাসনা ওর চরিতার্থ হতে পারে। চোপড়াকে কোনও ভাবে, যে-কোনভাবে কাবু করতে হবে।—ও চাপা গলায় বলে উঠছে, 'সাহেব এত জোর তো স্প্রিং-এর উপর

অ্যাকসিডেন্ট হলেই সম্ভব। আর তখন স্প্রিং-এরই বা কি সারা রেলগাড়িই ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাবে। নর্মাল প্রেসার সহ্য করতে আমার স্প্রিংগুলো, দেশী স্প্রিং-এর থেকে কোন অংশেই কম নয়।

শুনে চোপড়া হেসে ফেললো।

বরিয়ম পম্মীর কানে বললো, 'এতে আজ নাগালের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।' ও চোপড়াকে স্কচে ডুবিয়ে দিয়েছে, নাক পর্যন্ত। কিন্তু ও এমনি পানাসক্ত যে খাবার খাবার পরও গিলে যাচ্ছে। স্টাফের লোকেরা ছাড়া সব অতিথিরা বিদায় নিয়েছে। আর কেই বা ওর জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে।

ময়ুরপঙ্খী কেয়ারীর পাশে বেতের সোফায় তিনজন বসে আছে। স্টাফদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুইপাশে বরিয়ম আর পম্মী মাঝখানে চোপড়া। সামনে আকাশে পূর্ণচন্দ্র, মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশ। যেন অভ্র ঝরে পড়ছে। বরিয়ম নীনা আর লুসির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়েছিল। ও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল। বাঘ যেমন মৃতকে ছোঁয় না। খুব ঘাঘু লোক এই চোপড়া, বরিয়ম ভাবতে লাগল। ওর হঠাৎ গরম লাগতে লাগল। ও কোট খুলে ফেলল, লাইলনের পাতলা জামার পকেটে শ শ নোটের তাড়া উঁকি মারছিল। বরিয়ম হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি সেবা করতে পারি? কিছু আদেশ করুন—।'

চোপড়া বললো, 'আপনার স্প্রিং-এর কোয়ালিটি ঠিক করুন!' কিছুক্ষণ থেমে বললো, 'জানা গেছে আমদানি করা অ্যালয়স্টিলের মিশ্রণে আপনি স্প্রিং বানান! ইউ নো! আই অ্যাম আফটর দা পিউর স্টাফ!' ও হাহা করে হেসে উঠল।

বরিয়ম রাগে গরগর করতে লাগল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই এক ঘটনা ঘটল যাতে বরিয়মের চোখে চমক এল। চোপড়া হঠাৎ পম্মীর হাত হাতে নিয়ে বুলোতে লাগল। বললো, 'ইউ আর সো সুইট অ্যাণ্ড পিউর, অ্যাণ্ড লাইক ইউর স্প্রিংস্! হী, হী!' পম্মী 'থ্যাঙ্কু থ্যাঙ্কু' বলে হাত সরিয়ে নিতে চাইছিল দেখে বরিয়ম ওকে চোখে ইশারা করল। পম্মীর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বরিয়ম বললো, 'চলুন চোপড়া সাহেব, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে!'—ও লুকিয়ে ঘরের দিকে ইশারা করল যেটা এই সময় চাঁদের আলো আর ছেঁড়া ফাটা ছায়ার মিশ্রণে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট মিউরল' মতো লাগছিল।

'ও কে!' চোপড়া উঠে দাঁড়ালো। বরিয়ম আর পম্মীও উঠল। বরিয়ম

কোহলীকে ডেকে বললো, 'সাহেবকে গেস্ট রুমে নিয়ে যাও। আমরা এক্ষুণি আসছি।'

চোপড়া চলে গেলে বরিয়ম উল্লাসপূর্ণ স্বরে বললো, 'আমিও ভেবেছিলাম ডার্লিং, কি এই মানুষটির কাছে আমার মনোবিজ্ঞান ফেল করছে। এখন এতক্ষণ পর, শালার উপর মদ কার্যকরী হয়েছে। পুরুষমানুষের দুর্বলতা জানো, পয়সা অথবা নারী। তোমার রূপের জাদু ওকে বশ করেছে। লাখ টাকার ঠিকাদারীর প্রশ্ন। ইউ টেক ইট ইজি, ডিয়ার জাস্ট ইউমার হিম! আই উইল লীভ্ বোথ অফ্ ইউ অ্যালোন।'

পদ্মীর মস্তিস্কে মনে হল যেন কোন স্প্রিং টেনে ভেঙে পড়ল, ভেঙে গিয়ে ঝনঝন করে উঠল। একটুক্ষণ ও হতপ্রভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ফের চোট খাওয়া হরিণীর মতো গোঙাতে লাগল, 'তুমি···তুমি একী বলছ বরি?'

'ডোণ্ট বী সেন্টিমেণ্টাল, হানি, ইটস এ গেম, ইটস বিজনেস।'

'ইউ শাট আপ্!'—পদ্মীর মনে হল যে এত জোরে বলে ফেলেছে যে দূরে দাঁড়ানো স্টাফের লোকেরাও শুনে নিয়েছে, ও ঘুরে বরিয়মের চেহারা দেখলো। সেটা বরিয়মের চেহারা ছিল না। ওর মনে হল এক নেকড়ে লাল লাল চোখে ওকে একদৃষ্টিতে দেখছে।

পদ্মীর শিরশিরানি এল, ওর মাথা ঘুরতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে ও সোজা নিজের ঘরে চলে গেল আর ভেতর থেকে দরজা এঁটে বন্ধ করে দিল।

জখম ॥ ভীষ্ম সাহনী

ট্রেন চলতে শুরু করলে, সে অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে দেখতে থাকে। কখনও ডানদিকে ইঞ্জিনের দিকে মাথা ঘোরায়, কখনও বাঁ-দিকে গাড়ির পেছন দিকে। বৃদ্ধ লোকটি কি দেখছে এমন করে, এটা জানার জন্য আমিও জানালা দিয়ে মাথা বাইরে বের করি। এখন কিছু বিশেষ আমার চোখে পড়ে না, কেবল স্টেশন পেছনে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে লাইন পালটাচ্ছিল। মনে হল, তলায় যেন চাকা নেই, গোটা ট্রেনটাই বুকের ভরে লাইন ক্রশ করে চলেছে। ট্রেনের সামনের বগি এখন এক নম্বর লাইন ক্রশ করে তিন নম্বর লাইন ধরে চলেছে। আমি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি···ট্রেন বার বার লাফিয়ে ওঠে, আর তাতে এক ধরনের ঢেউ সৃষ্টি হতে থাকে। ঐ বুড়োটা কি এসবই দেখছে? বৃদ্ধের উৎসাহ আমার কাছে ছেলেমানুষি ও বেমানান মনে হয়। ট্রেন এখন গতি ধরে ফেলে, লাইনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির গাছপালা প্রকৃতি দ্রুত সরে যেতে থাকে, ঘাটির ওপারে স্থির গাছপালা প্রকৃতি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কাছেপিঠে সমস্ত এলাকা গাড়ির গতির সঙ্গে গতিশীল হয়ে ওঠে।

তখনই সে দরজা বন্ধ করে তার বসার জায়গায় ফিরে আসে। এখন নিশ্চয়ই সে ট্রেন সম্পর্কে দু-একটা মন্তব্য করবে। যতক্ষণ ধরে ট্রেনে চলেছি, এই বৃদ্ধ কেবলই মন্তব্য করে চলেছে। কথায় কথায় তার মতামত, পরামর্শ দিয়ে আসছে।

—এখন ট্রেনে চাপলে তেমন ঝট্‌কা বোধ হয় না, আগে যেমনটি বোধ হতো। বেশ আত্মপ্রসাদে সে বলে—ট্রেন বেশ সমতল গতিতে বেগ ধরে। তারপর, ডানহাত তুলে শূন্যে সাঁতরিয়ে ট্রেনের সমতল গতির দিকে সংকেত করে বলে—এখন অবশ্য ডীজেলে ইঞ্জিন চলে। আগে স্টীমে চলত। স্টীমে চলা ইঞ্জিনে একটু ঝটকা লাগতো।

আমি ভদ্রতাবশে মাথা নাড়াই।

—স্টীম ইঞ্জিনের যুগ অবশ্য এখন শেষ হয়ে গেছে। সেই সব দিনে চলতো, যখন কয়লা খুব সহজলভ্য ছিল। এখন কয়লাও বেশ আক্রা হয়ে পড়েছে। তারপর, সহসা সে নাসিকা-ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে—ফায়ারপ্লেসে সারাদিনমান কয়লা ফেলা। ওফ্, তাঁতে কাপড় নোংরা হয়, হাতও নোংরা হয়। ডীজেল বেশ পয়-পরিষ্কার জিনিস। বোতাম টেপো, অমনি ট্রেন চলতে শুরু করে…

আমি আবার মাথা নাড়াই। কিন্তু, কেবল মাথা নাড়ানোতে সে সন্তুষ্ট থাকে না।

—ফ্রান্সের লোকেরা একটা ভাল উপায় বার করেছে - তারা দুই ট্রাক লাইনের পরিবর্তে এক ট্রাক লাইনে ট্রেন চালাচ্ছে। ইলেকট্রিক কারেন্ট নিচে স্লিপারের ভিতর দিয়ে চলে। দ্বিগুণ উৎসাহে সে শোনাতে থাকে—ট্রেনের তলায় তারা ট্রান্সফর্মার এঁটে দিয়েছে। এখন কি হচ্ছে জানো, ট্রান্সমিশান লাইনে এ সি থাকে কিন্তু ট্রান্সফর্মার আঁটার ফলে এখন ব্যবহার ডি. সি-তে হয়। সেটা সস্তা পড়ে, এবং কাজও বেশ পয়-পরিষ্কার হয়—

বৃদ্ধ তার জ্ঞান প্রকাশ করে চলেছে। এর চেয়ে বেশী রাগের কথা যে সে প্রচুর উৎসাহে এসব বলে চলেছে। আমি এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা প্রচুর উৎসাহে কথা বলে, কথায় কথায় হাসে, নিজের আশাবাদীতার প্রদর্শনী খুলে বসে। এই বৃদ্ধকে কোন অবসরপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার বলে মনে হয়। একে বেশী উৎসাহ দিলে, রেলওয়ের সমগ্র হিস্ট্রি শোনাতে বসবে। এবং কামরায় আমরা কেবল দুইজন যাত্রী, আমাকেই সব শুনতে হবে। কিন্তু, তাকে উৎসাহ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—আমাদের এয়ার-কণ্ডীশন্‌ড কোচ পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল…তবুও এখনও কোথাও কোথাও ক্রুটি পাওয়া যায়…ধুলোবালি এখনও ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া, একটা কমপার্টমেন্টে চারটে কল-বেল রাখার দরকার কিসের? একটা কল-বেলেই কমপার্টমেন্টের সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের কাজ চলতে পারে। আমি রেলওয়ে বোর্ডকে এ বিষয়ে লিখেছি।

বৃদ্ধ প্রায় ৭০ বছরের…নিজের আড্ডা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ইঞ্জিনিয়ার, অবসর প্রাপ্ত হবার পরেও যে নিজের পরিবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। রোগা, শ্যামবর্ণের আগাপাস্তালা একহারা চেহারা, এবং মাথায় নৌকা ধরনের টুপি।

তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে আমার কোন ইচ্ছে নেই। চুপচাপ

নিজের সীটে আলাদা থাকতে চাই। আমার এও প্রশ্ন করতে ইচ্ছাও নেই যে সে কে, বা কোথায় যাচ্ছে। সমস্ত সহ-যাত্রীদের সঙ্গে কে আর ভাই-বন্ধু পাতায়।

সম্ভবত সে আমার অনাগ্রহের ব্যাপারটা ধরে ফেলে। আপনার বুঝি এতে কোন বিশেষ কৌতূহল নেই? সে কিছুটা অপ্রস্তুত গলায় বলে। আমি তার দিকে চেয়ে থাকি।

না · না, আজকাল কত কিছু হচ্ছে, এতে কৌতূহল ও রুচি থাকা স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে—সম্ভবত আমার অনাগ্রহের কারণে। কিন্তু আমি জানতাম, সে কথা বলবেই, না বলে থাকতে পারবে না। বার্ধক্যে পা রাখার পর সমস্ত ভারতবাসীদের মগজে নানান্ ধরনের পরামর্শ, যুক্তি, কাটা-কাটা ভাবে বেরিয়ে আসতে থাকে। প্রতিটি বৃদ্ধের কাছে দেশের সমস্ত রোগের প্রতিশোধক মজুদ আছে—গরীবী দূর করার, ভ্রষ্টাচার নিরোধ, ভারতীয়দের চরিত্র উঁচু করার। একেও এ ধরনের কোন সমাজসেবী মনে হয়। এমন লোকেদের আমি অপছন্দ করি।

আপনি দিল্লী থেকে ফিরছেন বুঝি? দিল্লীতে আপনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ঘটেছে! আমি ব্যঙ্গ স্বরে বলি।

সে খুব সহজ ভঙ্গিতে আমাকে দেখে নিয়ে বলে—উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। আমি আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি।

—রাষ্ট্রপতিও নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলেন? আমি পুনরায় ব্যঙ্গ স্বরে বলি।

সে মাথা নাড়ায়। জানা গেল, সে সত্যি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে, এবং তাঁকে পরামর্শ দিয়ে এসেছে।

—বস্তুত দিল্লীতে আমি ইনকাম ট্যাক্স বোর্ডের কোন সদস্যের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। ইনকাম ট্যাক্স-পদ্ধতির সংস্কারের আশু প্রয়োজন। অবশ্য আমি আমার অভিমত লিখে রেখে এসেছি।

অবসরপ্রাপ্ত না হওয়াটাই ভাল ছিল, আমি মনে মনেই বলি। কোনরকমে ডুবে যাওয়ার চেয়ে রক্ষে পেত। বেঁচে থাকার জন্য এই বৃদ্ধ লোকটি সমাজ-সেবার আঁচল ধরে আছে।

সে ওঠে, এবং সীটের তলা থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে আনে। বাক্স কাগজে ভরা। ছোট ছোট, দু-তিন পাতায় ইংরেজী টাইপ করা লেখাসমূহ, সে বের করে একে একে শিরোনামা পড়ে কাছেই রাখছিল। কিন্তু সে ইনকাম ট্যাক্স সম্পর্কিত অভিমতের কাগজ খুঁজে পায় না।

—আমি আমার ধারণা লিখে রাখি। ধারণাগুলো লিখে রাখলে, নিজের কাছে একটা স্পষ্ট রূপ ধরা দেয়।

তারপর সে চার পাঁচটা লেখা বেছে-বেছে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সেগুলি লেখাই, ছোট ছোট, নানান্ বিষয়ে। আমি শিরোনামা পড়ি, পড়ার পর বিতৃষ্ণার পরিবর্তে হাসি পায় : 'গণতন্ত্রবাদের দোষ,' হিন্দুসমাজে বিধবার অবস্থান,' 'রামের কমেডি', 'সীতার ট্রাজেডি',—একটি সাক্ষাৎকার-বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে,' 'নগ্ন সত্য' ইত্যাদি। আমার মন অনাগ্রহে ভরে ওঠে আবার। সেই একই ব্যাপার বছর বছর ধরে ঘষামাজা সমাধান···মেয়েদের স্বয়ং স্বামী নির্বাচন করার অধিকার থাকা উচিত, পণপ্রথা থাকা উচিত নয়, বিধবার পুনর্বিবাহে অনুমতি দেয়া উচিত। আমি দৃষ্টি তুলে তার দিকে চেয়ে দেখি। আর মোটে তিন চার বছরের খেলা, বেশী হলে সাত-আট বছরের—, আমি মনে মনে আওড়াই। লিখতে দাও, কত আর লেখা সে লিখবে! সমাজ-সংস্কারের কত সমাধান সে আর জানাবে! আমি তার লেখা ফেরত দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি। তার ছোট ছোট চোখ নিষ্প্রভ। কিন্তু, ভ্রান্ত দৃষ্টি নয়। বরং স্থির, আশ্বস্ত দৃষ্টিময় চোখ—যেন জীবনের অস্থিরতা থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কিন্তু, এ ধরনের চোখ যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের চেহারায়ও দেখা যায়,—যে নাকি অপাঠ্য স্থূল রচনা লেখার পর আশ্বস্ত, উদ্ভাসিত হাস্যে কাটায়। এখন অসংখ্য সাধুদের চেহারায়ও সেই চোখ,—যারা একটা মুখোশে মুখ আড়াল করে রাখে।

তারপর, সহসা সেই লোকটার প্রতি আমার ধারণা পাল্টে যায়। হ্যাঁ, এই লোকটাকে খোঁচাও ; আমি মনে মনে আওড়াই। যে লোকটা সংস্কার করতে বেরিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ভেতরে কোথাও ভেঙে আছে। এই লোকটা নিশ্চয়ই কোথাও থেকে পালিয়ে সমাজসেবার স্মরণে এসেছে। এঁকে খুঁচিয়ে তোল, যে লোক এই বয়সে সমাজকে সুস্থ আসনে বসাতে বেরিয়েছে, তার অন্তস্তলের গভীরে নিশ্চিত কোন জখম আছে। এ ধরনের লোক পৃথিবীকে প্রতারণা করে, সবচেয়ে বড় কথা নিজেকেও প্রতারণা করে।

সেই লোকটা মৃদু হাসতে থাকে। শান্ত, স্মিত হাসি। ইচ্ছে করে, তার ঐ মুখোশ আড়াল করা স্মিত হাসির আবরণ এক খামচে উপড়ে ফেলি, যার ফলে তার প্রকৃত চেহারা—জীবন থেকে ভীতাকুল ও ত্রস্ত চেহারা—বেরিয়ে আসে।

—আপনার পরিবার বুঝি গাঁয়েই থাকে ?

আমি একেবারে সঠিক প্রশ্ন করেছি। অধিকাংশ জখম পরিবারেই ঘটে থাকে। তার চেহারায় স্পষ্ট ধরা পড়ে, তীর সরাসরি লক্ষ্যাভিমুখে গিয়ে বিঁধেছে। লহমায় কালো ছায়া তার মুখের উপর ছুটে যায়।

সে তার ছেলের সম্পর্কে পরে জানায়, উন্মাদ মেয়ের সম্পর্কেই প্রথমে বলে। মেয়েটি বত্রিশ বছরের, কিন্তু চীৎকার করে না···চুপচাপ বসে থাকে। ছোটখাটো কাজও করে। তাকে আমি আমার বোনের কাছে অন্য গাঁয়ে রেখে এসেছি। অবশ্য তার খরচপত্র আমিই দিই। পাঁচ বছর আগে ছেলের মৃত্যু ঘটেছে··· আমার রিটায়ার হবার পর···হঠাৎ হার্টফেল করেছে! সে তার দিদির থেকে মাত্র তিন বছরের ছোট ছিল।

বলে—কিন্তু, আমার কোন দুঃখ নেই, সকলকে একদিন-না-একদিন মরতে হবে—দেরিতে অথবা তাড়াতাড়ি, মরণশীল ব্যক্তির জন্য কান্না কিসের!

আবার সে মিথ্যে বলতে আরম্ভ করেছে। নিজের জখম আবার ঢাকতে শুরু করেছে। পরিষ্কার বলছো না কেন ছেলের মৃত্যু এবং মেয়ের উন্মাদ হওয়ার কারণেই আমি সমাজ সংস্কার করতে বেরিয়েছি। আমিও সৌজন্যবশত মাথা নাড়িয়ে চলেছি। এই সৌজন্য-বোধই আমাদের সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু, যথার্থতার সঙ্গে কখনই মুখোমুখি হতে দেয় না। আমি চাই, এই লোকটা নিজের জখম দেখুক এবং বলুক, এই জখম কখনও নিরাময় হবে না, কেন না আমি নিজেকে মিথ্যেয় জড়াচ্ছি। এটা সে জানে, তবুও এই কথাটাকে স্বীকার করছে না কেন?

—আপনার ছেলের বিয়ে হয়েছিল কি?

আমি আবার তাকে খোঁচা দিই। মুহূর্তখানিক তার চোখ-জোড়া আমার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—পুত্রবধূ এখন একটা স্কুলে পড়ায়। আমাদের গ্রামে আমরা ছেলেদের জন্য একটা স্কুল খুলে দিয়েছি, সে ঐ স্কুলের দেখাশোনা করে। জানেন, আমাদের স্কুল সারা জেলায় সব চেয়ে আদর্শ স্কুল প্রতিপন্ন হয়েছে। এ বছর স্কুলে আরও দুটো ক্লাস শুরু হয়েছে। সে আবার ঠিক তেমনভাবে হাতখানি বাতাসে সাঁতরায়, যেমনটি স্টীমের তুলনা বিদ্যুতের গুণাবলী প্রকাশের সময় করেছিল। তার উৎসাহ দ্বিগুণ হতে থাকে।

সেই লোকটা তার কাগজপত্র জড়ো করে বাক্সে ভরে রাখে। আমি মনে মনে আওড়াই, 'আজ থেকে পাঁচ বছর পর ঐ লোকটার হাত কাগজ-পত্র গোছাতে গিয়ে কাঁপবে।' বলার পর আমি আবিষ্কার করি, আমার মনে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। 'আজ থেকে দশবছর পর এই লোকটা পৃথিবীতে থাকবে না, কোথাও থাকবে না।' চোখ তুলে আমি তার দিকে দেখি। এই বাক্যটিও আমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। এই লোকটির বেঁচে থাকা যতখানি অসঙ্গতি, মৃত্যুর পরও ততখানি। ইতিমধ্যে সে চশমা খুলে হাতে রাখে, তারপর বেশ দার্শনিক কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে -- এযাবৎকাল যত ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নৈতিক নিয়মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা ছিল না। এখন এমন এক ধর্মের প্রয়োজন, যা একধারে বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের উপর আধারিত হবে…।

তার প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আমার সম্মুখে ক্রমশ উলঙ্গ হয়ে পড়ছিল। ধর্মের কথা সে এই জন্য বলেছে, কারণ তার নিজেরই ধর্মের প্রয়োজন বড় বেশী। পুত্রের মৃত্যু উপলব্ধি না করার কারণে কে এখন নতুন ধর্মের কল্পনা করছে। কিন্তু, তা স্বীকার করছে না কেন?

সহসা আমার ভেতর ফেটে পড়ে। জানি না, কেন যে আমার মনে সেই ব্যক্তির প্রতি বিরুদ্ধতা এত তীব্রভাবে জেগে উঠল। সে বুড়ো হয়ে চলেছে বলেই কি? কিংবা তাকে খুব বৃহৎ ভ্রম ও ভণ্ডামির শিকার বলে আমার মনে হয়েছে, অথচ মিথ্যের চাদর আড়ালে স্মিত হাস্যে থাকতে চায়? সে মানুষকে বোঝে না, এমন কি মানুষের নিয়তিকেও বোঝে না?

—আপনার এই অভিমতে কি দেশে রামরাজ্য স্থাপিত হবে?

সে থিতিয়ে যায়। বলে—কি জানি! হয়তো কিছুই হবে না। তারপর, বেশ বিনম্রভাবে বলে—আচ্ছা, সত্যি কি আমার বিচার-ভাবনায় কোন সার পদার্থ নেই? আপনি কি মনে করেন? আমার কি করা উচিত?

আমি চুপ থাকি। তার বিনয়ী ও স্পষ্টভাষণে আমি অহংএর গন্ধ পাই।

ট্রেন এখন ধু-ধু মাঠের ভেতর দিয়ে চলেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নজরে পড়ে। এই লোকটার সঙ্গে কোন শহরে দেখা হলে, এই ধরনের আলোচনায় কোন তাৎপর্য

ধরা যেত। কিন্তু, এখন চলন্ত ট্রেনে মানুষ কেবল যে নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং দীন-দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চলন্ত ট্রেনের পরিপ্রেক্ষেই আমরা এক-অপরকে দেখে চলেছি। না, কোন বস্তুর সামান্যতম স্থায়ী অস্তিত্ব অবশেষ নেই। অস্তিত্ব যা ছিল, তা এই চলন্ত ট্রেনের—ক্ষণ প্রতিক্ষণ ছুটে পালানো সময়ের। মনে হয়, এই ট্রেন বুঝি পৃথিবীর তেপান্তর ঘাঁটি অতিক্রম করে চলেছে, সেই সঙ্গে শতাব্দীসমূহ পশ্চাতে ফেলে রেখে চলেছে। বস্তুত কোন বস্তুরই কোন অর্থ অবশেষ নেই, তখন এটাই বা কার সঙ্গে জুড়ে আছে? যেখানে সব কিছু ভেঙে পড়েছে, সেখানে এটা কোন অংশকে জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছে?

আমার ইচ্ছে হয়, এগিয়ে গিয়ে তার মাথা থেকে টুপি তুলে ছুঁড়ে ফেলি। এবং আমি তা করি। সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। সে-সময় সে তার লেখার বাণ্ডিল খুলে ঝুঁকে বসে ছিল। আমার শব্দ পেয়ে সে মাথা ওপরে তোলে—এই ছাখো, ইনকাম-ট্যাক্স সম্পর্কিত লেখাটা পেয়েছি! এবং সে স্থূল বিনীত হেসে আমার দিকে চেয়ে দেখে। মুহূর্তের জন্য আমার হাত ঠিঠ্‌কে যায়···সঙ্গে সঙ্গে আমিও সংস্কারের মুঠো থেকে ছটফট করে বেরিয়ে আসি। হাত এগিয়ে দিই। সে তার লেখার কাগজ তুলে আমার দিকে এগিয়ে দেয়, এবং আমি লেখার দিকে হাত এগোনোর পরিবর্তে তার মাথার দিকে, তার সফেদ, চকচকে নৌকা-টুপির দিকে এগিয়ে দিই, তারপর একটানে তুলে ছুঁড়ে ফেলি। টুপি উড়ে যায়, গিয়ে কামরার ছাদে গিয়ে ধাক্কা খায়, ইলেকট্রিক ফ্যানে ধাক্কা খায় এবং উড্ডীয়মান পাখির মত ফর্‌ফর্‌ করে ডান দিকের দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খায়—সেখানে খুঁটিতে তার থার্মাস-বোতল ঝুলছিল। সেখান থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ঝুলন্ত অবস্থায় নিচে এসে পড়ে।

—এটা কি ধরনের ইয়ার্কি? অ্যাঁ? এর মানে কি?

—শুধু এটাই নয়, আমি আরও কিছু করতে যাচ্ছি। এগিয়ে গিয়ে একের পর এক, দুটো চড় কষিয়ে দিই তার টাক-মাথায়।

সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে—তুমি আমায় অপমান করছো! আমি তোমার বাপের বয়সী! তুমি কে? অ্যাঁ, কে তুমি? এর মানে কি? আমি এখুনি চেন টানবো। তুমি ভাবো কি?

সে ডান দিকের দেয়ালে এগোয়। আমার মনে হয় চেন টানতে যাচ্ছে, কিন্তু চেন টানার পরিবর্তে সে বস্তুত তার টুপি তুলতে যায়। নিচে ঝুঁকে

আসবাবপত্রের মাঝে পড়ে থাকা টুপিটা তোলে, তারপর আস্তিনে ঘষে মুছে মাথায় পরে।

চুপচাপ আমার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। তার নিশ্বাস ফুলে উঠতে থাকে। তারপর, ধীরে ধীরে তার মুখের মাংসপেশী কিছু কিছু শিথিল হয়ে আসে। আমার এমন মনে হল, যেন তার ঠোঁটে হাল্কা ধরনের হাসি ফিরে এসেছে। সে আবার ভণ্ডামির চাদর ঢেকে নেয়—তুমি আমার পরীক্ষা নিলে নাকি? কিন্তু, আমি পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আমার কথা তোমার খারাপ লাগতে পারে, এটা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি কি ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে? আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম, তখন এক ইংরেজ অফিসারের টুপি তুলে ফেলে দিয়েছিলাম, ফলে তিনটি বছর জেলে থাকতে হয়েছিল। সে যুগ ছিল আলাদা। তারপর ধীরে ধীরে বলে—কিন্তু, সে ছিল দেশের শত্রু, আমি তো শত্রু নই। আমি কার শত্রু?

আমি এগিয়ে গিয়ে সরাসরি একটা চড় কষিয়ে দিই তার মুখে। তার মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। নাক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, আমার হাতের তালু কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে পড়ে। তার টুপি আবার নিচে পড়ে যায়। এত জোরে চড় কষাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, আমার মন একেবারে গলে যায়, বস্তুত আমিও সংস্কার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে পারি নি। তার মুখ থেকে আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে আসে।

—শুয়ারের বাচ্ছা! সে চিৎকার করে ওঠে। তারপর যেন কেঁদে ফেলে, বলে —মেরে ফেল···আমাকে মেরে ফেল! আমি একা আছি, বুড়ো মানুষ, আমার শরীরে শক্তি নেই। এইজন্য কি তুই আমাকে মেরে ফেলতে চাস?

আমি যত বেশী নিজের ব্যবহারে বিস্মিত হচ্ছিলাম, তত বেশী উৎসাহ পাচ্ছিলাম। আমি তাকে অপরাধী করতে চাই। সেই লোকটাকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর মত মনে হয়, যাকে আমি পায়ের তলায় পিষে ফেলতে চাই। ইচ্ছে করে, এগিয়ে গিয়ে তার কাপড় ছিঁড়ে ফেলি, তারপর ফালা-ফালা করে দিই। আমার মনে হয়, যেন সে আমার সঙ্গে আছে, এবং তাকে আমি ত্বক থেকে কিছুতেই আলাদা করতে পারি না। ওকে ছিন্নমূল করে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই আমি।

এগিয়ে গিয়ে জানলার পাল্লা তুলে দিই। তারপর তার কাছে ফিরে যাই। সে যেন তার সীটে ডুবে বসে আছে, এবং আমাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে

থাকে। অথচ, সে আমার কাছে হাত-জোড় করে বসে নি, বা কাকুতি-মিনতিও করে নি। আমি আশপাশ কিছুই দেখি না, কেবল নিচে ঝুঁকে তার লেখার বাক্স তুলে ধরি, তারপর জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। বাইরে পতনের পূর্বেই বাক্স থেকে সমস্ত লেখা বেরিয়ে উড়ে যায়। দু-একটা কাগজ জানলা দিয়ে উড়তে উড়তে ভেতরে এসে পড়ে।

তারপর আমি জানলার পাল্লা নাবিয়ে দিই।

কিন্তু, এ কাজটা করার পর আমার মন সহসা খিন্ন হয়ে পড়ে। সেই লোকটার মত, তার ন্যাকা লেখার মত আমার এই কাণ্ডকারখানাও ছ্যাবলা ও মূর্খামি মনে হয়। সহসা গভীর অবসাদ আমাকে চেপে ধরে। এই সমগ্র যাত্রা, যাত্রার যাবতীয় কার্যকলাপ অর্থহীন ও মূর্খামি মনে হয়। সম্ভবত আমি পুনরায় দুর্বল হয়ে পড়ি। সত্যি, পুরোনো সংস্কার মরেও মরে না।

আমি সিগারেট ধরাই, তারপর আমার সীটে ফিরে আসি। আমার ভেতরের খিন্নতাকে কেবল সিগারেটের গভীর টানই দূর করতে পারে। সে আগের মত ঘাড় হেঁট করে বসে আমাকে লক্ষ্য করে চলে।

দীর্ঘ টান দেবার পর গভীর অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরে। কখন এই যাত্রা শেষ হবে? আমি কেন এখানে বসে আছি? আমার অস্থিরতার, আমার ভাঙা হৃদয়ের, আমার অসহনীয় ব্যথা-যন্ত্রণার কোন চিকিৎসা নেই। বাক্স ছুঁড়ে ফেলার পরিবর্তে আমার স্বয়ং গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়া উচিত ছিল। এমন যাত্রায় এটাই শেষ পরিণতি হতে পারত। পূর্বে, ঐ লোকটাকে অসঙ্গত মনে হয়েছিল, এখন আমি স্বয়ং নিজেকে অসঙ্গত অনুভব করছি। আমি তার জখম খুঁড়ে দেখছিলাম, অথচ আমার নিজের হৃদয় জখমে ছিদ্রময় হয়ে আছে। ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে কামরার দেয়ালে নিজের মাথা ঠুকে ফাটিয়ে দিই। সেই বুড়োটার ওপর আমার এখনও ঘৃণা রয়েছে, কিন্তু আমার সমস্ত মন এখন নিজের অসহনীয় অবস্থার দিকে ফিরে এসেছে···আমি কি? আমি এখানে এসব কেন করছি?

সেই লোকটা সোজা হয়ে বসে আছে। সে কিছু বলে না, কেবল শঙ্কাময় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, ভালই হয়েছে, সে কিছু বলে নি, নইলে আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম, হয়তো তার গলা টিপে ধরতাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সীটে বসে থেকে, তদুপরি ক্রমাগত একের পর এক সিগারেট টানার পর আমি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিলাম। সেখানেই আধভাঙা বসে ঢুলতে ঢুলতে একসময় সীটের ওপর গড়িয়ে পড়ি।

ট্রেন আর্তনাদ তুলে তীব্র বেগে চলেছে। সম্ভবত এই গোটা বীভৎস নাটক এই আর্তনাদিত ট্রেনের কারণে ঘটেছে। আমি তা সহ্য করতে পারছিলাম না··· সম্ভবত এই লোকটার সমতল কণ্ঠস্বর আমাকে অস্থির করে তুলেছিল···তার এই মূঢ় বিশ্বাস যে জীবন বদলানো যেতে পারে, উন্নততর করা যেতে পারে।

যখন আমার চোখ খোলে, গাড়ি কোনো এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। জানি না, কতক্ষণ ধরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমার গা হাত পায়ে খিঁচ ধরছিল। দুমড়ে উল্টো অবস্থায় মুখ চেপে পড়ে থাকার দরুন আমার সর্বাঙ্গ টনটন করছিল। ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, চুপচাপ, যেন কোন আহত জন্তু সহসা চুপ করে গেছে। জানি না, রাত্রি কত প্রহর কেটে গেছে।

আমার দৃষ্টি সামনের সীটে পড়ে। সেই লোকটা সীটের একটা কোণে বসে, হাঁটুর ওপর খাতা রেখে কিছু একটা লিখে চলেছে। হয়তো, কোন লেখা তৈরি করছে, আমি ভাবি, অবস্থার বিড়ম্বনা দেখে আমার হেসে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তার বিপরীত আমার কণ্ঠ চেপে ধরে। মনে হয়, যেন আমি কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছি।

তখনি গার্ডের বাঁশী বেজে ওঠার শব্দ ভেসে আসে, ট্রেন থামতে শুরু করে। তার ঘাড় কাগজের উপর ঝুঁকে রয়েছে এবং টুপি আগের মতই মাথার ওপর। মনে হল, এবার যেন সে আমার প্রতি উপহাস করছে, আমাকে মিথ্যেবাদী করছে। এবার তার টুপি তুলে ছুঁড়ে ফেলার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আমার আর অবশেষ নেই।

তারপর, সে এক আশ্চর্য কথা বলে। আমাকে সীটের ওপর উঠে বসে থাকতে দেখে সে থিতিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ আমাকে লক্ষ্য করে। ক্ষীণ হাসি তার ঠোঁটের উপর খেলে যায়। সে চোখ ফিরিয়ে কাগজপত্রের দিকে দেখে—যাতে সে লিখছিল। তারপর, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে হাত এগিয়ে দেয়, পাল্লা তুলে তুলে ধরে, তারপর হাতে ধরা কাগজপত্র মুড়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে।

—এবার ঠিক হল, তাই না? সে হেসে বলে—হয়তো তুমি ঠিকই বলছো, বুড়োদের জীবন থেকে পাড়ে সরে দাঁড়ানো দরকার! বরং ভাল, এটা অন্ধকারে

ডুবে যাক্। জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাক। তারপর খুব আস্তে-আস্তে বলে —আমি আর দু-তিন বছরেই চলে যাবো। কিন্তু তুমি··· ? তোমার কি হবে ?

ট্রেন ধীরে ধীরে থেমে আসছিল। সেই শীতল ভণ্ডামিপূর্ণ হাসি তার মুখে চেহারায় ফিরে আসে, যেন তার ভেতর আবার কোন সুরধ্বনি বাজতে শুরু করেছে এবং সে ঐ মূর্ছনায় ডান হাতখানি সাঁতরিয়ে আবার কিছু একটা শুরু করতে যাচ্ছিল, আবার হয়তো কোন উপদেশ ঝাড়তে চলেছিল—আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, এবং বাইরে প্রসারিত নিবিড় অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল চোখে দেখতে থাকি।

খোল ॥ রাজেন্দ্র যাদব

এক শহরে একজন ক্লার্ক থাকতো। অত্যন্ত দুর্বল, শুকনো এবং হাড় জিরজিরে। সব দিক থেকে চেষ্টা-চরিত্র করেও সে হেরে গেলো—স্বাস্থ্য সেই তেমনটিই রইলো। শহরের ভিরমি-আসা-গোছের ভিড়, ঠেলাঠেলি-ঠাসাঠাসির দরুন তার মনে দুঃখের অবধি রইলো না। ফাইলপত্র অথবা অন্যান্য কাজকর্মে গলা অব্দি ডুবে থাকায় সে এতটুকু সময় পেতো না। ভিড়ের মধ্যে কারো কনুইয়ের গুঁতো, কারো রামধাক্কা খেয়ে সে বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ব্যথা অনুভব করতো। গুঁতো লাগতো, চোখের সামনে সর্ষে ফুল ভাসতো আর সে টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পেছনে সরে যেতো। প্রায়ই স্বপ্ন দেখতো: একদিন সে যে-কোনো দৈবী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এদের মজা দেখিয়ে ছাড়বে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস—একদিন-না-একদিন এ ব্যাপারটা ঘটবেই। তখনো কিন্তু তার মনে বদ্ধমূল ভয়—যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ তাকে বেদম পিটুনি লাগিয়ে ঠেলে ফেলে দেবে, তার মালপত্র কেড়ে নেবে অথবা তাকে নিছক একটা ধাক্কা মেরে ফেলে রেখে যাবে। অতএব, সদাসর্বক্ষণ সে মাথা নিচু করে কাজ করবার ভান করতো এবং যেখানেই দু-চারজন লোক দেখা যেতো সেখান থেকে সুড়সুড় করে কেটে পড়তো। যথাসম্ভব সে তার অধিকাংশ সময় অফিসে অথবা বাড়িতেই কাটিয়ে দিতো এবং রঙ-বেরঙের ঐন্দ্রজালিক কল্পনায় ডুবে থাকতো। তবু একটা আশঙ্কা তাকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খেতো—যে-কোনো সময়, যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিজের নিঃসঙ্গ কুঠুরিটায় পর্যন্ত শান্তি খুঁজে পেতো না সে। একঘেয়েমি, ভয়, আশঙ্কা তাকে সুস্থ থাকতে দিতো না। চোর-ডাকাত যদি হঠাৎ হানা দেয়—তাহলে? প্রতিটি পথ-চলতি মানুষ তার কাছে মনে হতো যেন তার দিকেই ছুটে আসছে, আবার ঠিক তেমনি সারাটা রাত তার মনে চোর-ডাকাতের

চিন্তা ছুঁচ ফুটিয়ে দিতো। আলতোভাবে খট্‌ করে উঠলেও তার হাড়কাঁপুনি দেখা দিতো। শরীরময় ঘাম ফুটে বেরুতো। এখান থেকে অন্য কোনো শহরে পালিয়ে গেলে কেমন হয়?—সে ভাবতো! কিন্তু সেখানেও তো এজাতীয় মানুষ, এ ধরনের চিন্তা মজুত আছে। একদিন টুপ করে সরে পড়তে হবে। সে ভাবতে থাকে এবং শুকিয়ে আমসি হতে থাকে।

লীলাময়ের লীলা দেখুন। একদিন কবচধারী একজন পৌরাণিক যোদ্ধার ছবি দেখলো এবং নির্নিমেষ দেখতেই থাকলো সে। মনে ধারণা জাগলো: সেও যদি এমন একটা কবচ ধারণ করে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত নানাভাবে মাথা ঘামিয়ে সে একটা পথ খুঁজে বার করলো। সে বাজার থেকে নিজের শরীরের মাপ মতো একটা খোল কিনে আনলো এবং ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঠুকে বাজিয়ে সেটাকে নিজের শরীর অনুযায়ী তৈরি করতে শুরু করলো। তার নিজস্ব বুদ্ধি মতো কাজটা পুরো করতেই সে তার গায়ে খোলটা চড়িয়ে তার ওপর একটা ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি পরে নিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেললো সে। আকৃতিটা কিম্ভূতকিমাকার হলেও কেউ আর তাকে ধাক্কা গুঁতো মেরে বিরক্ত করতে পারবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার গা-গতর ব্যথা করতে লাগলো। খোলটা খুলে সরিয়ে রাখলো সে। একটা ভারী বোঝা সরে গেলো। নিজেই নিজেকে বোঝাতে লাগলো—শীগগিরই অভ্যেস হয়ে যাবে, তখন আর এতটা খারাপ লাগবে না। প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যে বসেই এটাকে পরা অভ্যেস করতে হবে।

অভ্যেস যতোই পাকাপোক্ত হোক না কেন, তার কিন্তু বুঝতে বাকী রইলো না—এটাকে পরে বাইরে বেরুবার সাহস হবে না তার। অন্তত এ শহরে কখনো এমনটা করতে পারবে না সে। তাই, যেমন-তেমন করে সে একটা বড় শহরে ট্রান্সফার করিয়ে নিলো।

বড় শহরে সে প্রথম দিনই ভেতরে খোল এবং তার ওপর ঢিলে পাঞ্জাবি পরে বেরুলো। মন কণ্ঠাগত এবং দৃষ্টি সতর্ক। সব সময় মনে হতে লাগলো—সবাই যেন কৌতূহলী হয়ে তাকেই দেখছে। হয়তো সবাই বুঝে নিয়েছে যে এটা তার শরীরের স্বাভাবিক আকার নয় এবং সে কাপড়-জামার নিচে একটা খোল পরে রয়েছে। এর অর্থ—সবাই তার শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। এ চিন্তাটা তাকে বিরক্ত এবং অনুতপ্ত করতে লাগলো। লোকেরা অবশ্য তাকে লক্ষ্য করছিলো কিনা—কে জানে; তবে এ হেন কাণ্ড করে সে তার পুরোনো কুণ্ঠা আরো বেশী

জাগিয়ে তুললো : আবার কোনো ভুল করে বসেনি তো সে ? আগে শুধু তার নিজের চিন্তা ছিলো। তারপর থেকে শরীর খোল এবং মন তিন তিনটে চিন্তা একসঙ্গে আক্রমণ করলো।

নতুন জায়গা। কাজেই, তার দিকে খুব কম লোকেই নজর দিলো। যাক, এও মন্দ নয়। পুরোনো শহরটায় থাকলে সব্বাই মিলে তার চামড়া খুলে ফেলতো!

তবু, একটু কেমন-কেমন তো লাগলোই। অনেকেই তার এ বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে হাসলো, কেউ কেউ ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলো—কী খবর, ভালো তো ? নতুন পরিবেশ মনের মতো হচ্ছে তো ?

তার মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরুলো—শিরদাঁড়ায় ব্যথা, তাই ডাক্তার একটা জিনিস পরতে দিয়েছে। ঠিক তক্ষুনি তার মনে হলো—ফেলে-আসা শহরে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করায় তার শিরদাঁড়াটা টনটন করতো। অন্তত সে সময় তো তার নিশ্চয়ই মনে হলো যে ব্যথা করতোই। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চোখ-মুখগুলোয় সহানুভূতি এবং দৃঢ় বিশ্বাস দেখে তার মধ্যে বড়ো রকমের একটা দুষ্ট আনন্দানুভূতি ঝিলিক মারলো। বাঃ, কতো সহজে সে সবাইকে বুদ্ধু বানাতে পারে! যে-কোনো কথাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারলে কী সহজে সবার বিশ্বাসপাত্র হওয়া যায়। তার মনে হলো—এ ভাঁওতামিটুকু বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ভালোভাবে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। হয়তো অল্প দিনের মধ্যেই সবাই তাকে এ বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। খোল ধারণ করবার ব্যাপারে কী দারুণ যুক্তি পেশ করেছে সে! এতে তার মনে নিজের বুদ্ধির ওপর একটা আস্থা জাগলো।

ভিড়ের মধ্যে, অবশ্য এক-আধবার কেউ কেউ তাকে ধাক্কা মারলো বটে, কিন্তু তখুনি তারা আবার নিজেরাই ব্যথা পেয়ে ব্যথার জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে সুড়সুড় করে কেটে পড়তে লাগলো। আট-দশ বার লোকেরা এ ধরনের গুঁতোগুঁতি করবে—তারপর নিজেরাই আবার ওর হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজে মরবে!

কিন্তু, তখনো অভ্যেসটা পাকাপোক্ত হয় নি। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাড়ি পৌঁছে দরজা বন্ধ করে খোলাটা খুলে ফেলে শরীরটা আলগা ছেড়ে দিয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। গোটা শরীরটা একই অবস্থায় থাকার দরুন বিশ্রীভাবে ঝিনঝিনি ধরে গেলো। খুলে-রাখা খোলটাকে সে বিমুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলো এবং কতো কী কল্পনা করতে লাগলো—যেন

তখনো সে খোলটার মধ্যে আটকা পড়ে রয়েছে এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে দেখছে—কেমন দেখায়। এইভাবে একেকটি দিনকে পূর্ণ বিস্তারসহ চোখের সামনে মেলে ধরে-ধরে নতুন করে আবার গিলতে থাকলো। ভীষণ আত্মতুষ্টি হলো, হাসি পেলো এবং নিজেরই নাম ধরে খোলটাকে ডাকলো—'হ্যালো মিস্টার, কী খবর? আজ তো দারুণ-দারুণ সব কাপড়-চোপড় পরে ঘুরে বেড়ালে! তোমাকে দেখে তো একবার আমার 'বস' পর্যন্ত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলো!' তারপর নিজেই আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো। ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবি, তার ভেতর স্থূলকায় 'শরীর'···ঠিক কোনো রোমান রাজনীতিবিদ অথবা ঋষি-মুনির মতো মনে হলো যা-ই বলো না কেন, তখন কিন্তু তার একটা ওজনদার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে!

'ডাক্তার'বাবুর ভাঁওতাবাজির প্রভাব অনেকটা কমে গেছে—ধীরে ধীরে এ কথা তার বোধগম্য হলো। কেন না, লোকেদের চোখ মুখের সহানুভূতি আস্তে আস্তে একটা বিচিত্র ধরনের ব্যঙ্গে রূপায়িত হয়ে গেলো। 'এর কারণ আবার এই নয় তো —ইদানীং আমি ভীষণ আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েছি। এ আত্মতৃপ্তিরও একটা হেতু আছে!' যেখানে আশে পাশের লোকেরা তাকে সহানুভূতি দেখায়, অবর্তমানে হাসাহাসি করে অথবা তাকে সান্ত্বনা দেয় যে শীগগিরই তার কষ্ট লাঘব হবে—সেই তাকেই আবার অন্য জায়গার লোকেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—তাদের চোখে-মুখে আশ্চর্য এবং ভয়ের অবধি থাকে না। তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তারা তাকে পথ ছেড়ে দেয়। হয় সম্ভ্রমের দরুন, নয় নিজেদের গায়ে আবার ব্যথা না লাগে তার জন্য তারা সরে দাঁড়ায়। সে দেখলো—তার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি জন্মেছে। সে শক্তি নিরন্তর বিকশিতও হয়ে চলেছে—এ অনুভূতির দরুন তার মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ-শিহরণ দেখা দিতে লাগলো। কে তাকে খুঁটিয়ে দেখছে এবং দর্শকটির দৃষ্টিতে কী ভাব ফুটে বেরিয়েছে—এ কথা সে না নড়ে-চড়েও নির্ভুলভাবে পড়ে ফেলে।

অফিসের কয়েকজন স্মার্ট হবার হুজুগে, তার কাঁধের ওপর চাপড় মেরে কী একটা ইয়ার্কির কথা বলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে যে-যার মতো চুপসে গেলো। এসব সময় তার চোখে-মুখেই সহানুভূতি চিকচিকিয়ে ওঠে। কিন্তু, মনে মনে বলে: 'শালারা স্মার্ট হতে এসেছিলো! কী, এখন কেমন মজা? ভবিষ্যতে আর হিম্মৎ

হবে না!' কোনো বন্ধুর ডান হাতখানা উপরে উঠে ওপরেই স্থির হয়ে আছে—এজাতীয় কল্পনায় এসব মুহূর্তে তার মধ্যে হাসির প্রচণ্ড ঝড় বইতে শুরু করে। বাইরে কিন্তু সে ভীষণ শান্ত-শিষ্ট এবং গম্ভীর হয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, চোখ-মুখ এবং পোশাক-পরিচ্ছদের কল্যাণে সে যে সবার দৃষ্টি-কেন্দ্র হয়ে পড়েছে, তাও সে বেশ ভালোভাবে জানে। তাছাড়া সবাই যে তাকে লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে ইঙ্গিত-ইশারা করে তাও। একথা ভেবে তার মনে লাগাম ছেঁড়া খুশি মাথা চাড়া দেয় যে ভিড় যেমনই হোক না কেন, তাদের মনে যেমনই ভাব ফুটে উঠুক না কেন, লক্ষ্য কিন্তু সবার তার দিকেই। সবার চেয়ে আলাদা এবং কিছুটা বিশিষ্ট হওয়া, সবার মনে ভয়, আশ্চর্য এবং কৌতূহল সৃষ্টি করা, স্বয়ং নিজে খোল-এর রক্ষা-বেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকা, নিজের এ রহস্যের দরুন সন্তোষ এবং গর্ব অনুভব করা—এই একটা উপায় অবলম্বন করে কতোগুলো লাভ এক সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে তার। এ সাফল্যের দরুন নিজেই সে তার পিঠ চাপড়াতে থাকে। অবশ্য দেখতে একটু বাজে লাগে। এর মধ্যে আটক-থাকাকালীন শরীরটা কুঁকড়েও যায়। ঘোরা ফেরার সময় নিজেকে এবং খোলটাকে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। তবু সে ভাবলো—ধীরে ধীরে এসব অভ্যেস হয়ে যাবে এবং সে এই স্থির সিদ্ধান্তে এলো আজীবন সে এ খোল বয়ে বেড়াবে। এতে খোল যদি নিজেকে তার মাপমতো গড়ে নিতে নাও পারে, সে কিন্তু চলা-ফেরা, ওঠা-বসা—সব কাজেই নিজেকে খোলের মাপমতো তৈরি করে ফেলবে!

বাইরে থেকে সব কিছুই ভীষণ গম্ভীর, ব্যথাসঙ্কুল এবং নিশ্চল। কিন্তু ভেতর থেকে প্রতি মুহূর্তেই মনে হতো যেন জীবনটা দারুণ ইন্টারেস্টিং এবং রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা পেরিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। এর আগে কখনো কিন্তু জীবন নিয়ে এতো আনন্দ উপভোগ করেনি সে। এক সময় সে একটা মানুষ প্রমাণ-লম্বা আয়না নিয়ে এলো। তারপর নিয়মিতভাবে, রোজ, তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং ওঠা-বসা করবার অভ্যেস করতে লাগলো। কেন না, সে জানতো—এখনো তার হাঁটা-চলা হাব-ভাব পাকাপাকিভাবে সহজ-সরল হয়ে ওঠেনি। প্রথমবার আয়নার সামনে যেতেই তার চোখে পড়লো—হাসি-তামাশা ওঠা-বসা অথবা চলা-ফেরার সময় তার চেহারা এবং চোখের ভাব অস্বাভাবিক-ভাবে করুণ হয়ে ওঠে। অন্য কারো চোখে-মুখে এ ধরনের ভাব দেখে সে নিশ্চয়ই ভাবতে পারতো—ব্যথার দরুনই এ মানুষটার চোখে-মুখে কী মর্মান্তিক করুণা ফুটে উঠেছে! তাহলে সবাই কী তার চোখে-মুখে এ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করে? অর্থাৎ

যাকে সে সম্মান এবং ভয় ভেবে আসছে, তা দয়া এবং সহানুভূতিরই নামান্তর মাত্র? পেছনে-ফেলে আসা বেশ কয়েক দিন ধরেই এ কথাটা বারংবার তাকে খোঁচা মেরে আসছে যে তার হাবভাব নর্ম্যাল নয়। মাঝে মধ্যে রাগও হয়—কেন সে এ কেলেঙ্কারীটাকে ছুঁড়ে ফেলে আগের মতো সহজ-স্বাভাবিক হচ্ছে না? আবার, এটা তার ভ্রমও তো হতে পারে—তারা তাকে দয়া এবং উপেক্ষার চোখে কখনো দেখেনি। না হয় ধরে নাও—করুণাই করেছে, তাহলেও এ এবং সে পরিস্থিতি দুটোর মধ্যে তফাতটা কোথায়? সেই বিষম পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হবার জন্যেই তো সে এ-বেশ ধারণ করেছে। এখন কথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক না কেন, এ সাঁজোয়াটার মধ্যে থেকেই তাকে সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাওয়া তার পক্ষে মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। নিজেকে খোলহীন করে ফেলার কল্পনাই তার কাছে খাপছাড়া মনে হয়। খোল খুলে ফেললে লোকে হয়তো চিনতেই পারবে না তাকে। তাহলে কী জীবনভোর এহেন ভার বইতে বইতে তাকে গম্ভীর এবং বিমর্ষ হয়ে থাকতে হবে? সে তখুনি নিজেকে বুঝিয়ে দিলো—এ সিদ্ধান্ত তো সে নিজেই গ্রহণ করেছে যে আজীবন এটাকে সঙ্গে করে রাখবে। ঝুট-ঝামেলা যা-ই হোক না কেন, এর নির্বাহ ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন থেকে কী সরাসরি এবং নিবিড় স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে তাকে? চিরদিনই, প্রতিটি নিকটতমের সঙ্গে, খোলের দূরত্ব বজায় রেখে খোলের রক্ষা-বেষ্টনীর মধ্যে থেকেই মেলামেশা করতে হবে? এ কেমন আত্মনির্বাসন দিলো সে নিজের? এখন থেকে এমনিভাবেই নিঃসঙ্গ, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অদৃশ্যই মরতে হবে তাকে?

তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস দানা বাঁধলো—লোকে হয় তাকে করুণার চোখে দেখে, না হয় ভয়ের। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় যেন সে কোনো সংক্রামক ব্যাধির অস্পৃশ্য রুগী। সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট। এই দয়া এবং ভয় আগে তার বেশ ভালোই লাগতো। আত্মরক্ষণ এবং অহংতুষ্টি ঘটতো। কিন্তু, ধীরে ধীরে মনে হতে লাগলো—এ যেন তাকে একপেশে করে রাখবার ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মাত্র। সে যেই আসে, অমনি, কথা বলতে-বলতে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। সে যেখানেই উপস্থিত থাকে, সেখানে কেউই যেন প্রাণখোলা ব্যবহার করতে পারে না। এমন একটা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যেন, একটা একান্নবর্তী

সুখী পরিবারের মধ্যে কোনো অবৈধ-প্রবেশকারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর সবাই যেন অপেক্ষা করতে থাকে—কখন সে সরবে। কখন আবার তারা স্বচ্ছন্দ ভাবে কথা বলবার সুযোগ পাবে। অতি অবশ্যই তারা তার পেছনে তারই কথা বলে, তার আকৃতি-প্রকৃতি এবং হাবভাবের সমালোচনা করে। সে বেশ কয়েক-বার একেকটি বিষয় যাচাই করে দেখবার জন্যে বিশ্বস্তভাবে চেষ্টা করে ফেলেছে। তাদের নেমন্তন্ন করে খাইয়ে-দাইয়ে মনোব্যথা ব্যক্ত করেছে। আজকাল সবাই যে কোনো কারো ব্যথা সম্পর্কে কী শোচনীয়ভাবে নিষ্ঠুর! কিন্তু, এসব সত্ত্বেও সে একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না—অন্যদের মনে তার প্রতি হয় বিশুদ্ধ ঔদাসীন্য আছে, নয় দয়া এবং ভয়।

যে জিনিসটা তার মনটাকে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে দিলো—তা হলো সেই নতুন পরিস্থিতি অর্থাৎ সবাই উদাসীন। তারা দয়া করুক, ভয় করুক, ঘৃণা করুক—কিছু একটা করুক। এহেন নিরাসক্তি কী সহ্য করা সম্ভব? না না, উদাসীন কেন থাকবে তারা? তাদের সামনে এমন একটা বৈচিত্র্য ঘোরাফেরা করে বেড়াবে আর তাদের নজরেই পড়বে না, তা কী করে সম্ভব? শেষপর্যন্ত সে নিজের এবং অন্যান্য-দের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে এই কথাই প্রমাণিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো যে না এটা দয়া, না ভয়; বরং এতো নিখুঁতভাবে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কারের, অসাধারণ হবার বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলের সম্মান-প্রদর্শন মাত্র। যাকে সে দূরত্ব মনে করে—তা তাকে সমীহ করা, বিশেষ শ্রদ্ধা দেখানোর ফলশ্রুতি বৈ নয়। সবাই তাকে তার বুদ্ধিমত্তা এবং পরাক্রমের জন্যেই অসাধারণ এবং মহান মনে করে। আত্মরক্ষা এবং অন্যান্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে যে কাজ তারা মাথা ঠুকেও পুরো করতে পারে না—তা কী সুন্দরভাবে শেষ করেছে সে! এ-ই দেখেই সবাই হতভম্ব হয়ে মনে-মনে তাকে 'হিরো' মেনে নিয়েছে।

অন্যান্যদের এবং নিজেকে, নানাভাবে, এসব কথা বোঝাতে-বোঝাতে সে ভেতরে ভেতরে নিজের প্রশংসাও না করে পারতো না—কী সুন্দরভাবে সে তার নিজের কথা বুঝে ফেলেছে! কী সব অকাট্য যুক্তি সে ভেবেচিন্তে বার করেছে! তার মনে দৃঢ় বিশ্বাসও মাথা চাড়া দিলো যে তার মগজ পরিষ্কার হবার মূল কারণ একমাত্র এই খোল। এটাকে যদি সে খুলে ফেলে, তাহলে, আগের মতো 'সাধারণ' এবং 'নগণ্য' মানুষ হয়ে পড়বে। সে আরো গভীর বিশ্লেষণ করে দেখলো—আগে সে নিজের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করতো এবং অন্যান্য সব কিছু তার কাছে নতুন এবং অপরিচিত মনে হতো—সে নিজেই নিজের কাছে

'অসহায়' ছিলো। আজ সে নিজের ভেতর থেকে উঠে এসে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং ওদেরই দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখতে শুরু করেছে। এই জন্যেই অন্যান্যরা তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নতুন এবং অন্য নক্ষত্রের প্রাণী-বিশেষ। প্রতি-প্রত্যেকের মধ্যে নেমে গিয়ে স্বয়ং নিজেকে দেখবার ক্ষমতা, কিন্তু, খোলটারই দেওয়া। আগে তা সে বুঝতেই পারতো না যে সবাই তাকে দেখে কী ভাবছে? এখন সে ধারাবাহিক-ভাবে ওদের মনোভাবের ওঠা-নামাগুলো স্বচ্ছন্দে পড়ে বলেছে। মনে মনে ওদের কথাবার্তা এবং যুক্তি-তর্কগুলোর অনুশীলন করে হেসে কুটিকুটি হয়। এখন তার চাল-চলনগুলো শুধু স্বাভাবিক এবং সহজই হয়নি, বরং চোখে মুখে বিচিত্র ধরনের হাসিখুশিভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছে। অন্যান্যদের মধ্যে কী সব ঘটে চলেছে—তা বোঝার মতো একটা পারদর্শী দৃষ্টি পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা? এ সবের বিশ্লেষণে তার মনে বিরাট একটা আত্মবিশ্বাস গজিয়ে উঠলো: ইস্ বেচারীরা কিচ্ছু করতে পারবে না!

কিন্তু, সে যার ভয় করতো, তাই ঘটলো। শীগগিরই টের পেলো যে তারা প্রত্যক্ষে তর্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অথবা ঝুট ঝামেলা এড়াবার জন্যে 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করলেও—পরোক্ষে ঠিক সেই সবই করে, যা তার মনের ভাঁজে-ভাঁজে ফণা উঁচিয়ে বসে আছে: 'শালা ঢং করছে! বহুরূপী কোথাকার! কী জানি কোত্থেকে একটা ভাঙা-ফুটো খোল কুড়িয়ে এনেছে এবং পরে ভাবছে—যেন—খোদা হয়ে গেছে! নিজেকে আস্ত একটা 'হিরো' ভাবে—নতুন ফ্যাশন চালাচ্ছে…হুঁঃ।'

নিন মশাই, সবাই যাতে নির্লিপ্ত না হয়, তার জন্যে যেই সে নিজেকে খুলতে এবং তর্ক করতে শুরু করে দিলো—অমনি তারা সবাই ফালতু চেঁচাতে শুরু করলো। ওদের সঙ্গে কথা বলতেও সে রীতিমতো বিরক্ত হয়—মিথ্যেবাদী হারামি চোরের দল! পরে যে তোমরা কী-কী বলবে, তাও আমার জানা হয়ে গেছে। একেকটা কথা রিপিট করতে পারি!

শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি এত ঘোরালো হলো যে সে যদি সত্যি কথাও বলতো এবং সামনের লোকটা সমর্থনও যদি করতো, তবু সে এই ভেবে চমকে উঠতো যে অতি অবশ্যই সে কোনো অসংলগ্ন অথবা মিথ্যে কথা বলে ফেলেছে, সেই জন্যেই তো শালা সমর্থন করছে! ইচ্ছাকৃতভাবে বেফাঁস অথবা মিথ্যে কথা বলে যেখানে সামনের প্রাণীটির সমর্থন পেয়ে অন্যান্যদের সহজে বুদ্ধু বানাবার আত্মতৃপ্তি এবং

ভেতরে ভেতরে একটা বদ-আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিতো, ঠিক সেইখানেই আবার সত্যি কথা বলে সমর্থন দেখে কথাটি তার নিজের কাছেই মিথ্যে এবং অসংলগ্ন মনে হতো। তার কাছে সত্যি এবং মিথ্যের পার্থক্যটা ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগলো। একই সঙ্গে, তার কাছে, সব কথা সত্যি এবং একই সঙ্গে সব কথা মিথ্যে মনে হতে লাগলো। একই মুহূর্তে সে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দুঃখী, অসহায় এবং লাঞ্ছিত প্রাণী এবং পরেই আবার সব চেয়ে বুদ্ধিমান, অদ্ভুত এবং অসাধারণ। সত্য-মিথ্যার এমন একটা তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যেতো, যে, তার মাথা লাটিমের মতো বন বন করে ঘুরতে শুরু করতো। তখন থেকে তার মধ্যে এ সংশয়ও উঁকি মারতে থাকতো যে সে নিজেকেই বিশ্বাস করে কিনা ...? সে নিজের কোন কথাটাকে সত্যি ভাববে, কোনটাকে মিথ্যে? সে অন্যান্যদের বুদ্ধু বানাচ্ছে, না স্বয়ং নিজেকেই টুপি পরাচ্ছে...?

কিন্তু, সে অবস্থাটা বেশী সময় স্থির রইলো না। এবং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো—এ হলো একটা যৌথ প্রচেষ্টা, একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র এবং তাকে একপেশে করে রাখা হয়েছে। শালারা জোট বেঁধে তার মাথাটাকে এমনভাবে বিষিয়ে ফেলেছে যে অন্য কেউ হলে এতোদিন পাগল হয়ে যেতো। সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সবগুলো হাড়ে-হাড়ে হারামি...ইতর...ছোটোলোক। সামনা-সামনি 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে, পেছন দিক থেকে ছুরি বসাবার মতলব। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে খানিকটা হাল্‌কামি অনুভব করলো। সে সরল-সিধে এবং অতি মাত্রায় বুদ্ধিমান লোক। তাদের মধ্যে সে উচ্চভাবসম্পন্ন—ব্যস, এটাই তার অপরাধ। সুতরাং একদিন তারা তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তার খোল এবং আলখাল্লা ছিনিয়ে নেবে অথবা ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে—যেমনটা প্রত্যেক জিনিয়াস-এর সঙ্গে হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে—সে 'জিনিয়াস' এবং অন্যান্যরা পোকা-মাকড়ের মতো ফালতু। নইলে খোলের কথা অন্য কারো মগজে ঢুকলো না কেন? সে কখনো তাদের মধ্যেকার 'একজন' হতে পারবে না। শয়তানগুলোর ষড়যন্ত্রই এই। তারা হয় তাকে তাদেরই মতো সাধারণ এবং নগণ্য বানিয়ে ছাড়বে, নয়—সংক্রামক ইঁদুরের মতো তাকে আলাদা করে একসময় সাবাড় করে দেবে। এ সামান্য কথাটা বেশ কিছু দেরিতে মাথায় ঢুকলো, যে, না সে অতটা নিচে নামতে পারবে, না পাজিগুলো অতটা উঁচুতে উঠতে পারবে। এই কারণেই পরস্পর পরস্পরের সামনে এতো আনকম্ফর্টেবল মনে করে। তাদের কাছ থেকে কোনো ফলবান সংলাপ আশা করা সম্ভব নয়। সব শালারা তাকে

এবং তার খোল দেখে জ্বলে-পুড়ে সারা হয়ে যাচ্ছে…।

বিপদের কথা হচ্ছে—তার পক্ষে আর পুরোনো শহরে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর রইলো না। শুধু তাই নয়—সেখানকার কোনো লোক যদি দূর থেকেও চোখে পড়তো—সে এদিক সেদিক লুকিয়ে পড়তো। অবশ্য সে এ কথাও জানতো, যে, লোকটি আর তাকে এ 'পরিচ্ছদে' দেখে চিনতেই পারতো না। তার সামনে দিয়ে যখন কেউ তাকে চিনতে না পেরে চলে যেতো—তখন তার মনটা মোচড় দিয়ে উঠতো এবং একটা তীব্র ইচ্ছা জাগতো যে সে দৌড়ে গিয়ে 'কেউ'-টিকে জড়িয়ে ধরে, তাকে নিজের নাম বলে, নিজের খবরাখবর শোনায়, তার সংবাদ শোনে। কিন্তু, খোলের দরুন সে ওসব কিছুই করতে পারছিলো না। মনের মধ্যে এ সন্দেহও জাগতো—হয়তো ওখানকার লোকেরা তার বিরুদ্ধে তাদের কানমন্ত্র দিয়েছে যার ফলে তারা তাকে আমল দিচ্ছে না। সে দাঁতে দাঁত পিষে বলতো—সব্বাইকে মজা দেখাবো!

এখন তো সব কিছুই জলের মতো স্পষ্ট—তাদের এবং তার মধ্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং সে কোথাও পালাতেও পারছে না। কিন্তু সে পালাবেই বা কোন দুঃখে? সেও তাদের দেখিয়ে ছাড়বে—কার কটা মাথা! এই ভেবে তার মুখে হাসি চিকচিক করে উঠলো। যে যোদ্ধাটির ছবি দেখে তার মাথায় খোল পরবার কথা জেগেছিলো—শেষপর্যন্ত তাকে সেই যোদ্ধাই হতে হলো। ঠিক আছে—যুদ্ধই সই, ব্যাপারটা তো স্পষ্ট হলো!

না, ব্যাপারটা তখনো স্পষ্ট হয়নি। তার মাথায়ই খেললো না যে যুদ্ধটা কোন জায়গা থেকে এবং কার বিরুদ্ধে শুরু করবে…ওপরে-ওপরে তো সব্বাই মিষ্টি বুলি আওড়ায় এবং বক-সন্ন্যাসী সাজে—পেছনে বসে যা বলে তা সে অক্ষরে-অক্ষরে বোঝে। হুঁঃ, এ তাদের যুদ্ধেরই একটা অঙ্গ। সে তাদের ভাঁওতায় ভোলার পাত্র নয়।

এখন থেকে তার চাল-চলন কথা-বার্তায় শহীদ-যোদ্ধার পরাক্রম দেখা দিলো। সে তার যুদ্ধের পুরো একটা ছক তৈরী করে ফেললো। আস্তে-আস্তে সবার সঙ্গে মেলামেশা-কথাবার্তা বন্ধ করে দিলো। তার চোখ-মুখ কঠোর হয়ে উঠলো। ফ্যাঃ, আমার আবার তোমাদের মতো হারামিদের কিসের ভয়?

তারপর থেকে সে তার প্রতিটি কথাবার্তার মধ্যে একটা বিশেষ নিশ্চিন্ততা

এবং উদ্দণ্ড বেপরোয়ামি টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার জন্যেও তাকে রোজ আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করতে হলো। কখনো যদি কোনো মতলুব, দরকার অথবা কিছু জানা-শোনার ব্যাপারেও সে কারো সঙ্গে কথা বলতো, তার মনে একটা গ্লানি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো—ইস, কাদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হচ্ছে!

সে তার প্রতিটি মুখভঙ্গী দিয়ে এই কথাই প্রমাণিত করবার চেষ্টা করলো, যেন, সে তাদের সঙ্গে করুণা করছে। নইলে তারা তার উপযুক্তই নয়। তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু, তার পরিবর্তে যখন তারা এ ধরনের কোনো ভাবভঙ্গীই দেখাতো না, তখন তাদের কৃতঘ্নতা তার চোখে আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়তো। নিজের বুদ্ধিদীপ্তিতে তাদের এইভাবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সে আরো মজা লুটতো এবং নিজের চোখেই নিজে বড়ো···আরো বড়ো হয়ে উঠতো!

একআধবার তার মনে সংশয় জাগতো—আরো কিছু লোক, যার যার কাপড়ের নিচে, খোল পরে ঘোরাফেরা করছে। অর্থাৎ এক্ষুনি যুদ্ধ ঘোষিত হতে চলেছে এবং তারাও তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। শালারা তার চোখ বাঁচাবার জন্যে কী ই না চেষ্টা করছে! কিন্তু, কার বাপের সাধ্য যে তাকে কেউ ধোঁকা দেয়? সে সবার নাড়ী-নক্ষত্র চেনে। সবগুলো অনুকরণপ্রিয় বাঁদর···হারামি···বুদ্ধু!

এতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মতো খোল পরে 'বিশিষ্ট' এবং 'মহান' হতে চায়। আর, সেই জন্যেই তার সাফল্য দেখে তাদের এতো হিংসে। বোকা উল্লুকের দল, আমি তোমাদের সকলকে হাড়ে হাড়ে চিনি! নিজস্ব বলতে তো ঘটে কিছুটি নেই, শুধু নকলই করতে ওস্তাদ তোমরা। কিন্তু, আমিও দেখবো—কী ভাবে আমার মতো হও? ইচ্ছে করে, যদি তার কাছে একটা বুলডোজার থাকতো, তাহলে সবাইকে কোমর অব্দি পুঁতে বুলডোজার চালিয়ে দিতো!

'যোদ্ধা' এবং 'হিরো' হবার জন্যে তার কাছে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারে যে সবাই তার নকল করছে? কথাবার্তা চালচলন সব কিছুই রপ্ত করে নেবার জন্যে সবাই পাগল! এ সব খোলেরই জাদু—সে মানুষের মনে ঈর্ষা জাগাতে পারে, নতুন ফ্যাশনের গোড়াপত্তন করবার ক্ষমতা রাখে। নিজের এ মহানতার প্রমাণস্বরূপ একদিকে যেমন তার মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো, অন্যদিকে একটা আশঙ্কাও জেগে উঠলো—সত্যি সত্যি যদি সব শালারা খোল পরতে শুরুই করে, তাহলে তো সে পাকাপাকিভাবে ফতুর হয়ে যাবে!

কিন্তু, তক্ষুনি আবার সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো—যাঃ এ কী সবার পক্ষে সম্ভব

নাকি ? এর জন্যে ভয়ানক-ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং নিজেকে জ্বালাতে-পোড়াতে হয়। সে দিন-রাত যত না কষ্ট সয়ে, ঘৃণা-উপেক্ষা এবং দয়া হজম করে 'হিরো'র এ সম্মানটুকু লাভ করেছে।

'হিরো' কথাটা মনে পড়তেই তার মনে নিজের প্রতি একটা শ্রদ্ধাভাব জাগলো—আমার মতো দুর্বল, সাধারণ, নীরস মানুষও যে এত উঁচুতে চড়তে পারে—এ কথায় হঠাৎ বিশ্বাসই হয় না। অতি অবশ্যই এ খোলের মধ্যে এমন একটা দৈবী শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, যা হাসিল করবার জন্যে তাকে নিজের শরীরটাকে ভেঙেচুরে ফেলতে হয়েছে। কী-ই না শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে এখনো কী কিছু কমেছে নাকি ? এ তো সরাসরি যুদ্ধ এবং ষড়যন্ত্র। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতেই তার মনে হলো—সে শুধু যোদ্ধাই নয়, জলজ্যান্ত একটা 'শহীদ'! পয়গম্বরেরাও তো ঠিক এতটুকুই কষ্ট ভোগ করে থাকেন। সে হঠযোগ-সাধনার মতো একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছে!

যোদ্ধা···নির্বাসিত বিজেতা···শহীদ···তখন থেকে এই সব শব্দই তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে তার নিজেরই তনু-মন ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলো—তার মতো একটা সাধারণ এবং তুচ্ছ মানুষও কতো মহান এবং কত উঁচু একটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে! এভাবে সামনাসামনি দাঁড়ানো এবং চোখাচোখি করা সবার পক্ষে সম্ভব নাকি ? একটি 'সে' আয়নার সামনে দাঁড়ালো এবং অন্য একটি 'সে' অন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের নীচতার মধ্যে নেমে তাদের' ভাষায় এই 'মহান' লোকটিকে দেখে, শ্রদ্ধা-ভক্তি ভয়ে গদ্গদ হয়ে নুয়ে পড়ে। কারসাজি-মিথ্যা-ছলনা এবং ইতরামিতে কানায়-কানায় ভরা লোকেদের ঈর্ষা, হিংসা এবং উপেক্ষার মধ্যে হাঁফিয়ে-ওঠা এ 'মহান জিনিয়াস' বেচারী কতো নিঃসঙ্গ এবং বিমর্ষ! শুধু এই একটা কথা ভেবে তার আতঙ্কের অবধি রইলো না - যদি তার মধ্যে বুদ্ধি এবং শক্তি না থাকতো তাহলে ওরা তাকে যে কী করে ফেলতো কে জানে!

তার মেলামেশা, বাইরে বেরুনো সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলো। সে ঠিক করলো তার মহানতা-রক্ষা স্বয়ং তাকেই করতে হবে। এতো বড়ো একটা অমূল্য এবং দুর্লভ বস্তু এ মূর্খ এবং ইতরগুলোর দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তারা তো তাকে এক নিমেষের মধ্যে ভেঙেচুরে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। যখনই কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, সে সতর্ক থাকতো ; যাতে তারা মহানতার পাপড়ি ছিঁড়ে না নেয়। সে আগন্তুকটির কাছ থেকে একটা ব্যবধান বজায় রাখে—নাই

'দিলে মাথায় চড়ে বসবে। কাজেই, মেপে মেপে যথাসম্ভব কম কথা বলতে লাগলো সে। সদাসর্বক্ষণ খোল পরে থাকায় এবং যথাসম্ভব কম কথা বলার দরুন তার শরীরটা একরকম বুজেই গিয়েছিলো। তাই সে পারতপক্ষে কম ক্রিয়াকাণ্ডই করতো।

ক্রমশ সে দেখতে পেলো—অন্যদের দৃষ্টিতে সে 'সিদ্ধপুরুষ' হয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে চলতে-থাকা যুদ্ধটুকু অনুভব করেও তার মনে একটা আত্মতুষ্টি জেগে থাকতো যে, লোক তাকে সম্মান করে। সে জানতো—দূরত্ব বজায় রাখাটা, প্রথম দিকটায়, একটু কষ্টদায়ক হলেও, পরে কিন্তু তাদের এবং তার মধ্যে যে 'যোগসূত্র' রচিত হয়—তা শ্রদ্ধাসঞ্জাত। মাঝে-মধ্যে তার নিজের ওপর এই ভেবে গর্ব হতো, যে, কেমন ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার কাছে হাজির হয়েছে! এবং কখনো কখনো রাগ হতো এই ভেবে যে, এরা কারো মূল্যাঙ্কন করতে পারে না! যখন মরে যাবো, তখন এদের কানে জল ঢুকবে যে কতো বড়ো একটা 'মহান মানুষ' এই ইতরগুলোর মধ্যে জলজ্যান্ত বর্তমান ছিলো!

যখন সে খোল ধারণ করেছিলো—তার প্রায়টুকু ভাবনা-চিন্তা তার নিজের চারপাশেই সীমাবদ্ধ ছিলো—অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের সম্বন্ধে অথবা তার সম্বন্ধে অন্যান্যরা কী-কী ভাবে, তার মধ্যে। প্রায় সময়ই এই ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং বেনামী নিরাকার লোকেদের প্রশ্নোত্তরী নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে তার মগজে কিন্তু সত্যি সত্যি ঢুকতো না যে, সামনে বসা সশরীরীটির সঙ্গে সে কী বলবে? যদি সামনে-বসা লোকটির চোখে মুখে নিজের 'মহান ব্যক্তিত্ব'র প্রতি শ্রদ্ধা, আতঙ্ক অথবা আশ্চর্য দেখতো—কথা বলতে একটু সুবিধে হতো। এই 'সিদ্ধি'টুকু পাবার জন্যে সে কতো কতো রাত যে চোখের পাতা এক করেনি—তার হিসেব নেই। অনেকে তার মুখের ওপরই তাকে পাগল এবং বহুরূপী বলে দিয়েছে। বলার সময় তার নিজের ওপর দয়া এবং শ্রদ্ধায় গলা বুজে আসতো। সেই বিশেষ মুহূর্তে সে এমন সব ভাবসাব করতো, যেন অন্য কারো সম্বন্ধে কথা বলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সামনে বসে-থাকা লোকটার মুখমুদ্রায় শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস চিকচিক করতে থাকতো—সে তার বক্তব্য বলেই যেতো। আর, সেই অবিশ্বাস ঝিলিক দিতো, সে এমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে যেতো, যেন কী একটা ভাবতে-ভাবতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মনে মনে দাঁত কড়মড় করে বলতো—তুমি আস্ত একটা হাঁদা, এসব স্তরের কথা বুঝবে কী করে?...

শেষ দিকে যেভাবে এবং যে পরিমাণে লোকেরা তার কাছে আসতে শুরু

করলো, তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, চারদিকে সে আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে…একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা এবং লিজেণ্ড হয়ে পড়েছে!

এবং এই সব চিন্তা, প্রশ্নোত্তরী এবং মগজে টানা-হেঁচড়ার ফলে আস্তে-আস্তে ঘুম আসাটি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেলো। আগে সে রাত্তিরে শোবার সময় খোলটাকে খুলে রাখতো, কিন্তু, যখনি শুতো শিরাগুলো দপদপ করতে থাকতো! এটা উলঙ্গ সত্য যে, খোল খোলার কাজ সে নির্জলা একাকিত্বে চারদিককার জানালা দরজা-গুলো বন্ধ করেই, করতো—ঘুমে এলিয়ে পড়লেও, সব সময়, খোলটার চৌকিদারি করতো। এ কথাটা সে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারতো না যে, তার এবং লোকেদের মধ্যে একটা চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তারা সবাই তার এ দৈব খোলটিকে চুরি করবার অথবা তাকে খতম করে দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে· তারা বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছে যে, তার এ শক্তির মূলে কী আছে। তাই রাত-বিরেতে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। সারাটা রাত সে চোর এবং শত্রুদের পায়ের শব্দ এবং খটখটানি শুনতে পেতো। আর ভগবান না করে, কেউ যদি সত্যি সত্যি ঢুকেই পড়ে—তার মধ্যে এখন আর অতটা সাহস নেই যে খোলটাকে রক্ষা করতে পারে। অতএব বাথরুম থেকে কিচেন অব্দি সে ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতো এবং ওটাকে দেখে-দেখে অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করতো। আরেকটা ব্যাপারও সে লক্ষ্য করতে লাগলো—যখন তার শরীরে খোল থাকতো না; তখনো তার চালচলনে এমন একটা ভাব ছেয়ে থাকতো, যেন খোল পরে রয়েছে। একটা সজীব জিনিসের মতো খোলটার গায়ে পরম স্নেহে হাত বুলোতো এবং কথা বলতো সে। শেষটায় সে খোল পরেই শুতো। তখন তো ওটাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বের কল্পনাটুকু পর্যন্ত অলীক মনে হতো তার। ভাবতো —খোল ছাড়া সে যখন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না, তখন ধরেই নাও, যদি কখনো সে বাইরে বেরোয়, লোকে তাকে কিসের সাহায্যে চিনবে? মনে হবে—যেন ছদ্মবেশে ঘুরতে বেরিয়েছে। অমনি সে আদ্দিকালের রাজা-মহারাজাদের মতো গুপ্তবেশে লোকেদের মধ্যে ঘোরার এবং তাদের মনোভাব বোঝবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। গোটা পৃথিবীতে তার কাছে দুটো জিনিসই সত্য এবং খাঁটি হয়ে দাঁড়ালো—সে এবং তার খোল…!

'সে এবং তার খোল…অথবা সে অথবা খোল?' একদিন হঠাৎ এ প্রশ্নটি তার ভেতর জেগে উঠলো। তন্দ্রা, ক্লান্তি দ্বন্দ্ব এবং একঘেয়েমির দরুন এ নিয়ে বেশী একটা মাথা ঘামানো তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তবু,

সে দেখতে পেলো সেও অন্যদের মতোই—ভাবে। কাল-স্থান এর মধ্যে ঘুরপাক খায়। তবে, তার সব কিছুই এই খোলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। সেও কী অন্যান্যদের মতো 'বাইরের মানুষ' হয়ে গেলে নাকি, যার মনের কোনো গোপন কোণে খোলটার প্রতি একটা দুর্ভাবনা বাসা বেঁধেছে? না না, এতোটা কৃতজ্ঞ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, তার এবং খোলের মধ্যে সম্পর্কটা কিসের তবে? সে তার আত্মরক্ষা, সম্মান এবং শক্তির জন্যে একটা 'সিদ্ধি' পেয়েছিলো—এখন কী সে আসল 'সে'টি নেই?—এই ধরনের ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে প্রশ্ন এদিকটায় তার মনের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছিলো…।

একবার বেশ কয়েকদিন ধরে সে ঘর থেকে বেরুলোই না এবং তার ঘর থেকে একটা বিচিত্র ধরনের গন্ধ বেরুতে লাগলো। জানলা-দরজা-ভেন্টিলেটার—সবকিছু বন্ধ। শেষপর্যন্ত সবাইকে দরজা ভাঙতে হলো…বিছানার ওপর খোল সহ শুয়ে আছে সে। সবাই ভয় পেলো। অতএব, তুমুল তর্কাতর্কি, সঙ্কোচ এবং দুঃসাহস নিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তার কাছে যাওয়া হলো। শরীর নিস্পন্দ। মরে গেছে। খানাতল্লাশী-টাশীর গ্যাঁড়াকল চুকিয়ে যখন তার শবাধার বাইরে বার করা হলো, তখন কিন্তু কেউ টের পেলো না—ছুঁচোর মতো শুকনো 'সে' কবে এবং কোথায় হারিয়ে গেছে?…বাদামের পচা এবং শুকনো দানার মতো কিছু একটা হয়তো ছিলো…।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটলো। শবাধারের ফুল এবং মালা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে 'খোল' হঠাৎ উঠে বসলো এবং এমনভাবে হাত জোড় করে দাঁত কেলিয়ে দিলো, যেন এদের অভিবাদন এবং অভিনন্দন স্বীকার করছে। সবাই চনমন করে উঠলো।

…'রাম নাম সত্য হ্যায়' এবং 'হরি হরি বোল'-এর আওয়াজ গলার মধ্যেই আটকে রইলো। কারো মাথায় খেললোই না যে, শবাধারটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে তারা চেঁচাতে চেঁচাতে এদিক-সেদিক ছুট লাগাবে, না…?

ছুটির পরে ॥ নির্মল বর্মা

বড়ো জোর কুড়ি-বাইশ বছরের হবে ও। প্রাণোচ্ছল এবং হাসিখুশি। খাঁটি প্যারিসের বাসিন্দা এবং পাকা প্যারিসিয়ান।

আমি ওকে পরে দেখলাম। আগে কুলি এলো। তারপর মেয়ে দুটি। সব শেষে ও। ঠিক ততো বড়ো একটা ভারী স্যুটকেস কাঁধে করে, যেমনটা কুলির কাঁধে ছিলো। মেয়েদের হাতের ছোট্ট-ছোট্ট ব্যাগও ঠাসাঠাসি করে বোঝাই। মনে হলো—ওরা আদ্দেকটা প্যারিসই যেন বাক্‌সো-প্যাঁটরা ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে!

দিনভোর শহরময় ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি হয়েছে। এখন আবার ভ্যাপসা গরম। প্যারিসের বাসি এবং ভিরমি-আসা গরম স্টেশনের পাঁচমিশেলি ভিড়ে আরো প্রাণান্তকর মনে হলো। ছেলেটি মাথার ঘাম মুছলো। ওর কাঁধের বোঝা নেমে গেলেও, আমার কিন্তু মনে হলো, চোখে মুখের বোঝা যেমনটি তেমনটিই আছে। ও ঠিক সেই সব আমুদে লোকেদেরই একজন, যারা চোখে মুখের ঔদাসীন্যটুকু সিন্দুকে বন্ধ করেই মুক্তি পায় না—তার কোনো-না-কোনো অংশ ঢাকনির শাসন অমান্য করে বাইরে উঁকি-ঝুঁকিও মারতে দেয়।

বড়ো মেয়েটি কুলিকে সধন্যবাদ পনেরোটা ফ্র্যাঙ্ক এগিয়ে দিলো। মজুরির পরিমাণটা আমার কাছে অনেক বেশীই মনে হলো। এবং আমার মধ্যে একটা ফালতু ধারণা গজালো—আমি ঐ ফ্র্যাঙ্ক ক'টার বিনিময়ে আরো দুদিন প্যারিসে থাকতে পারতাম—ধন্যবাদ-টন্যবাদের ধার না ধেরে।

মালপত্র গুছোবার পর ছেলেটি ঘাম মুছলো। পুরো বার্থটায় আমার একচ্ছত্র আধিপত্য। অতএব, ও আমার কাছেই বসলো। মেয়ে দুটির সামনে ও নিতান্ত নিঃলজ্জ হয়ে পড়লো।

—"মার্থা, তোমার যদি খিদে পেয়ে থাকে—তাহলে কিছু বার করি ?" বড়োটি জিজ্ঞেস করলো। সে গা-গতরে একটু বড়ো-সড়ো হলেও বয়েসে তার সঙ্গিনীটির সমানই হবে মনে হয়।

কিন্তু মেয়েটি, যার নাম মার্থা, উত্তরে নীরবই রইলো। সে তার সুডৌল হাত দুখানা প্যারিসিয়ানটির হাতে সঁপে দিয়েছিলো এবং ও সে দুখানাকে এমনভাবে কচলাচ্ছিলো, যেন তা হাত নয়—বেড়ালের সদ্য বিয়ানো দুটো বাচ্চা—কিছু দেখতে না পেয়েও আশেপাশের সব কিছুকেই নিজেদের দিকে টানতে থাকা।

দুজনেই পরস্পর পরস্পরকে নিষ্পলক দেখছে। দুজনেই নিশ্চুপ এবং দুজনের মধ্যেই প্যারিসের হাভাতে গরম, যার সঙ্গে একটিরও কোনো সম্পর্ক নেই—শুধু সেই জবজবে ঘামের ফোঁটাগুলো ছাড়া, যা তাদের কব্জিতে ঝলমল করছে।

বড়োটি ওপরের সিট থেকে চামড়ার ব্যাগ নামালো এবং তার ভেতরে থেকে খাবার বার করতে লাগলো—ব্রাউন রুটি, ঠাণ্ডা সালামি এবং রেড ওয়াইনের বোতল। এখন ওরা কথা বলছে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো কথায় হাসছেও। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম—ছেলেটি খাঁটি ফরাসী, মেয়ে দুটি বাইরের।

আমি দেখে আশ্চর্য হলাম যে, ছেলেটি কিছুই খাচ্ছে না—মাঝে মধ্যে রেড ওয়াইনের একেকটা লম্বা এবং ভরপুর চুমুক নিচ্ছে শুধু। ছোটো মেয়েটি যার নাম মার্থা, জানালা গলিয়ে ঘন ঘন স্টেশনের ঘড়ি দেখে নিচ্ছে, অবশ্য তার কব্জিতেও ঘড়ি বাঁধা। একটা কথা ভাবতে আমার ভীষণ হাসি পায়—অনেকেই ট্রেন ছাড়বার আগে, প্রায়ই নিজের ঘড়ি না দেখে স্টেশনের ঘড়ি দেখে। বিশেষত তারা, যারা কাউকে বিদায় জানাতে আসে অথবা নিজেরাই বিদায় নিয়ে যায়।

ট্রেনের করিডোরে ভিড় বাড়তে শুরু করলো। বেশ কয়েকজন দরজা টেনে ভেতরে উঁকি মারলো এবং যেই দেখলো যে আমরা চারজন বসে আছি, অমনি দরজাটি বন্ধ করে দিতে লাগলো। এবং বন্ধ করার শব্দ খোলার শব্দের চেয়ে কর্কশ মনে হতে লাগলো।

হয়তো উঁকিঝুঁকি মারার দরুনই ফ্রেঞ্চ ছেলেটি অপ্রস্তুত ভাব বোধ করছিলো। ও হঠাৎ দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো চারদিকে তাকিয়ে আবার হয়তো থপ করে বসে পড়তো, যদি ছোটো মেয়েটি ওর হাত ধরে বাইরে না নিয়ে যেতো।

যেতে যেতে ওর চোখ-মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। কিন্তু ছেলেটির চেহারায় একটা নিঃসঙ্গতা জড়ানো, যা শেষপর্যন্ত তার খালি জায়গার চারপাশে পাকসাট খেতে

থাকে। আমার ধারণা হলো—এ 'শূন্য স্থান'টুকু অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সহযাত্রী হবে।

বড়ো মেয়েটি উদাস চোখে ওদের বাইরে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে খাবারের ভাগ শেষটুকু ব্যাগে ভরতে লাগলো। ওপরের বার্থের খালি জায়গাটা ঠিক আমার মাথার ওপরে। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং ওর হাতে থেকে ব্যাগটা নিয়ে সেই পেরেকটায় ঝুলিয়ে দিলাম—যেখানে ওভার কোট টাঙানো হয়।

গরমের দিন। খালি পেরেকগুলো দেখে মনে হলো—বেশ কয়েক মাস ধরে এগুলো শূন্য থাকবে।

ব্যাগ দেবার সময় ওর মনে এতটুকু সঙ্কোচ জাগলো না—যেন আবহমান কাল ধরে ও অপরিচিতদের সাহায্য পেতে অভ্যস্ত। ধন্যবাদ দেবার পরিবর্তে ও লক্ষ্য করে প্রথমবার অথবা প্রথমবার লক্ষ্য করে আমাকে দেখলো এবং তারপর নিতান্ত আটপৌরেভাবে জিজ্ঞেস করলো—"আপনি ভিয়েনা অব্দি যাবেন?"

—"না। সাল্‌সবুর্গ পর্যন্ত।"

—"তাহলে তো রাতভোর ঘুমুতে পারবেন!" ও বললো। তারপর নিজের সিটের দিকে যাবার পরিবর্তে আমার সামনের খালি সিটটায় বসে পড়লো, যেখানে কিছুক্ষণ আগে ওর বান্ধবীটি বসেছিলো।

আমার তেষ্টা পেলো। ব্যাগ থেকে কার্লস্‌বর্গ বিয়ার বার করলাম। ভোরে প্যারিসে কিনেছিলাম।

—"আপনার বন্ধুদের ফিরে আসা উচিত। গাড়ি ছাড়তে খুব বেশি দেরি নেই।" বললাম।

—"বান্ধবীটি বিদায় নিচ্ছে...এতে তো একটু সময় লাগেই।" ও হেসে বললো। কিন্তু, স্বরে ব্যঙ্গের ছোঁয়া নেই।

আমি থার্মস-এর ঢাকনিতে বিয়ার ঢাললাম। সর্ষের তেলের মতো ঝাঁজালো। পিপাসা যেখানে ছিলো, সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো আমি ওকেও বিয়ার দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রেড ওয়াইনের পর ও এমনিতেও বিয়ার নেবে না ভেবে একাই খেতে লাগলাম।

রেলের গলিপথে যাত্রীরা বসতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রীষ্মকালীন টুরিস্ট, যারা প্যারিসে ছুটি কাটিয়ে যার-যার বাড়ি ফিরছে। তাদের

দেখে আমার মনে হাল্‌কা ধরনের একটু ঈর্ষা চিকচিকিয়ে উঠলো—এ পৃথিবীতে এমনও কিছু লোক আছে, যারা ছুটির পরেও বাড়ি যায় না; শুধু অন্যান্যদের দেখে বিশ্বাস করে নেয়—ছুটি শেষ হতে চললো। আমিও ওদেরই একজন। অনেক দিন ধরে এমনি লোকেদের মধ্যে থেকে আসছি।

বড়ো মেয়েটি ব্যাগ থেকে একটা আপেল বার করলে। হাত দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করলো। তারপরে চকচক করতেই কামড় বসালো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কম্পার্টমেন্ট-এ শুধু আপেল এবং ওর দাঁতের কটকটানি শোনা যেতে লাগলো।

—"সাল্‌সবুর্গে পড়েন নাকি আপনি?" ও জিজ্ঞেস করলো।

—"না…!" মাথা নাড়লাম—"পথে পড়বে, তাই কিছুদিন থেকে যাবো ওখানে। আপনি ভিয়েনায় থাকেন বুঝি?"

—"আমি ওখানে থাকি। কিন্তু, মার্থা বাসেল-এ। প্যারিসে সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো।"

—"আপনি খাবেন কিছু?" বিয়ারের বোতল ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। একা-একা খেতে খারাপ লাগছিলো।

—"ধন্যবাদ।" ও ওর ঝুড়ি থেকে গেলাস বার করলো। ভীষণ নোংরা। আশেপাশে কোথাও জল নেই।

—"একটু বিয়ার ঢেলে এটাকে ধুয়ে ফেলুন। এখানে জল আর কোথায় পাবেন!" ও পথ দেখালো।

গেলাস ধুয়ে ধুলোভর্তি বিয়ারটুকু বাইরে ফেলবার জন্যে উঁকি মারতেই ওদের দেখতে পেলাম। আমার দৃষ্টি হোঁচট খেলো।

বাইরে, প্ল্যাটফর্মে মার্থা এবং ফরাসী যুবকটি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ওরা পরপস্পর পরস্পরের মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিলো যে, না আমাকে দেখতে পেলো—না প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়তে থাকা নোংরা বিয়ারটুকু।

চোখ সরিয়ে নিলাম। মনের মধ্যে একটা গ্লানি মাথা চাড়া দিলো এই ভেবে যে, প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এখানে হয়তো কোনোদিন আর আসা হবে না—অথচ, এখানকার সম্বন্ধে এতটুকু ভাবছি না!

ইউরোপে ওটাই ছিল আমার শেষ গ্রীষ্ম এবং প্রতিটি শহর আমি এমনভাবে ছেড়ে চলে আসছি, যেন বহু বছর ধরে একটানা দেখে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি সিটি বাজালো। বড়ো মেয়েটি, যে আমার সামনের সিটে

বসে বিয়ার খাচ্ছিলো ঘাবড়ে উঠলো। ও গেলাস নিচে রেখে দিলো এবং ওদের ডাকবার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি মারলো। অথচ ডাকলো না। মাথাটা আবার ভেতরে ঢোকালো।

সেই মেয়েটি, যার নাম মার্থা, ফরাসী ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিলো।

—"পাগল নাকি ?" বড়ো মেয়েটি আমার দিকে অপ্রস্তুতভাবে তাকালো।

—"ছেলেটি আপনাদের সঙ্গে যাবে না ?" ও আশ্চর্যভাবে আমাকে দেখলো।

—"না। ও প্যারিসেই থাকে। ও শুধু আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে !"

আমার প্রথম অনুমানটি সত্য—ওরা টুরিস্ট এবং ছেলেটি বিশুদ্ধ ফরাসী—প্যারিসে থাকা খাঁটি প্যারিসিয়ান।

মার্থা রেলের দরজা ধরে ফেলেছিলো, কিন্তু ছেলেটি ওকে অতো তাড়াতাড়ি ছাড়তে চাইছিলো না। সে আলতোভাবে ধাক্কা মেরে কাঁধের ওপর থেকে মেয়েটির মাথা সরিয়ে ফেললো, তারপর গালে চুমু খেলো। সর্বত্র—তার চোখে, চুলে, ঘাড়ে, ঘাড়ের নিচে, ওপরে—ছেলেটির ঠোঁট ঘুরপাক খেতে খেতে আবার তার গালের ওপর থমকে দাঁড়ালো—যেন গাল দুটোই লোভনীয় টার্মিনাস ! তারপর আবার ঠোঁটেদের যাত্রা শুরু হলো। ফরাসীদের ভালোবাসাবাসি ওরফে আদর করা দেখাও একটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। প্যারিসে আমি যে বন্ধুটির ওখানে উঠেছিলাম, সে তার বাগদত্তাটির সঙ্গে শোবার আগে ঘরে মোৎসার্ট-এর রেকর্ড, রেড ওয়াইনের বোতল এবং এলুয়ার-কবিতা-সংগ্রহ রাখতো, যেন তারা ঘরের মধ্যে প্রেম করতে নয়—বরং—বাইরে কোথাও, রোদে—সমুদ্রের ধারে, পিকনিক করতে যাচ্ছে !

কিন্তু স্টেশনে দাঁড়ানো ফরাসীটি পিকনিকের আদিখ্যেতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে গড়গড় করে মার্থার সঙ্গে কী যেন বলে যাচ্ছিলো—সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োচ্ছিলোও। তারপর যখন গাড়ি স্পীড নিলো, বড়ো মেয়েটি হঠাৎ তার হাতের বিয়ারের গেলাসটা ওকে ধরিয়ে দিলো। সে একটা ডোজ নিয়ে গেলাসটা আবার মেয়েটিকে ফেরত দিলো। মেয়ে দুটি হাসছিলো। কিন্তু ছেলেটির চোখ দুটো তখনো ঠিক তেমনি উদাস—যেমনটি প্রথমবার দেখেছিলাম। যখন তৃতীয়বার তার হাতে বিয়ারের গেলাস এলো (বড়ো মেয়েটি ঘুণাক্ষরেও ভাবলো না যে বিয়ার আমার। ও ওকে সমানে খাইয়ে যেতে লাগলো) অমনি সে দৌড়োনো ছেড়ে দিলো।

সে গেলাসটিকে শূন্যে উঁচিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো এবং গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ করুণ মনে হলো—দুরন্তও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-

থাকা সময়ের মতো, চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে, মানুষকে গিলে ফেলে!

ফরাসীটি ঠিক ততক্ষণ গেলাস উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, যতক্ষণ না সে একটা কালো দাগে পরিণত হয়ে গেলো—এবং হয়তো তার পরেও—তবে, তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা সোজা নয়, কেন না ট্রেনটা ততক্ষণে স্পীড ধরে ফেলেছিলো এবং আমার সাত দিনের প্যারিস এবং সেখানে ছুটিতে এসে দেখতে পাওয়া প্যারিসিয়ান যুবকটি—তুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেলো।

গরম-গরম ভাবটা একটু কমে যেতেই আমি আবার আমার সিটে এসে বসে পড়লাম। বাইরে প্যারিসের শহর-উপকণ্ঠীয় আলোর জোনাকিরা টিমটিম করে জ্বলছে। স্টেশন থেকে বাইরে আসতেই গাড়ির মধ্যে একটা চাপা অন্ধকার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। বাইরে করিডোরে দাঁড়ানো যাত্রীরা তখন পরম শান্তিতে যার যার জায়গায় কুঁকড়িয়ে বসে পড়েছে। খালি জায়গাটুকু পাবার জন্যে আগের সে হাভাতেমিটুকু কখন যেন সরে গেছে।

মার্থা তখনো বাইরে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বড়ো মেয়েটি জানালা থেকে মাথা সরিয়ে এনে একটা লম্বা শ্বাস টানলো। তারপর দৃষ্টি জোড়া বোতলের ওপর স্থির হলো। গাড়ির ঝাঁকুনিতে বোতলতুটো তুলছিলো।

—"আপনার বিয়ার ওর কাছে রয়ে গেলো!" ও বললো?

—"আপনার গেলাসের সঙ্গে!" আমি বললাম।

—"গেলাস ও ডাকে পাঠিয়ে দেবে।" ও হেসে বললো—"আপনি হয়তো রসিকতা ভাবছেন। কিন্তু ও এমন ছেলে—যদি সত্যি সত্যি গেলাসটা বাই পোস্ট পাঠিয়েই দেয়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

—"আপনি প্যারিসেই ওর দেখা পেয়েছিলেন?"

—"আমি নয়, মার্থা। ও যে আর্ট স্কুলে ছিলো, মার্থাও সেখানে যেতো।"

ও হয়তো আরো কিছু বলতো, কিন্তু তক্ষুনি মার্থা দরজা ছেড়ে কম্পার্টমেন্টের মধ্যে চলে এলো। আমরা যদি রেলগাড়ির বাইরে কোথাও হতাম, তাহলে অন্য কোনো দিকে তাকানোর অজুহাত জুটতো। কিন্তু এখানে পরস্পরকে না দেখার ভান করা অর্থহীন মনে হলো।

—"মার্থা, তুমি তো খেলে না কিছু—নেবে কিছু?"

বড়ো মেয়েটি সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলো, যেন সব কিছুই আগের মতো আছে। মাঝখানে কোনো রদবদল হয় নি।

—"না। কিচ্ছু খাবো না। সিগারেট থাকলে দাও।" ও চুপটি করে সিটের ওপর বসে রইলো। গলার স্বর থমকালো। কান্নার লক্ষণ অনুপস্থিত। চোখ-মুখ শুকনো-শুকনো। আমার হৃদয় একটু আশ্চর্য হলো—অতোগুলো এলো-পাতাড়ি চুমু খাবার পর কোনো চোখ-মুখ এতো শূন্য থাকে কী করে ?

আবছা অন্ধকারে দুজনেই সিগারেট ধরালো। বড়ো মেয়েটি ওর ব্যাগটা মাথার নিচে লাগিয়ে নিলো। গাড়ি দুলছিলো—ওর শরীরও। শুধু মার্থাকে দেখে মনে হলো—ওর আশেপাশের সব কিছুই যেন থেমে রয়েছে। যেই যেই বাইরের ল্যাম্পপোস্ট আসতে লাগলো, সেই সেই গাছগাছালির ছেঁড়া-ভাঙা ছায়া ওর মুখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগলো। ও আধপোড়া সিগারেটটা সিটের নিচে ওর স্যাণ্ডেলের ওপর রেখে দিলো এবং ক্লিপটা কামড়ে ধরে অবাধ্য চুলগুলো বাঁধবার চেষ্টা করলো।

প্যারিস অনেক পেছনে ফেলে এলেও তার ভ্যাপসা গরম, তখনো আমাদের সহযাত্রী ছিলো। টাটকা ঘামের গন্ধ বাসি বিয়ারের সঙ্গে মিলেমিশে না বিয়ারের গন্ধ রইলো, না খাঁটি ঘামের ; তবু সেই জারজটা আমাদের জাপটে ধরলো বাইরে, করিডোরে সবাই যে-যার মালপত্রের ওপর বসে ঢুলছে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই হুঁশ হলো—ছুটি শেষ হতে চলেছে !

ছুটি শেষ হয়ে এলো।

বিয়ারের খালি বোতলটা নিচে রেখে দিলাম এবং পুরো বার্থটায় শুয়ে পড়লাম। কেবিনে শুধু এমন একটা ফ্যাকাসে লাইট জ্বলছে যার আলোয় কিছু পড়তে গেলে আবছা মনে হয়—অথচ ঘুমুতে গেলে ঝলমলে। তার নিচে বসে ঝিমুনো যায় শুধু। আমার মনটা থেকে থেকে প্যারিসে-কাটানো দিনগুলোর মধ্যেই হারিয়ে যেতে লাগলো।

আলতোভাবে চমকে উঠলাম। সামনের বার্থটার একটা কোণ থেকে হাল্কা একটু নাক ডাকানি ভেসে এলো—ভীষণ আস্তে এবং ধোঁয়ার পাতলা ভাঁজের ওপর ওড়ার মতো—যেন এক জোড়া শ্বাস-প্রশ্বাস একটা গিঁটে বাধা পড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করছে—ছোট্ট অথচ গরম নাক ডাকানি, যা শুধু বাঁধভাঙা যৌবনেই বেরোয়। পৌনঃপুনিক শব্দে মনে হলো, যেন হাল্কা আঁচে কিছু একটা টগবগ করে ফুটছে !

মার্থা ঘুমুচ্ছে।

সে শোয়াটা কান্নার পরের শোয়া—প্রার্থনার মতো।

আমি নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালাম।

—"নেবাবেন না।" সামনের সিট থেকে বড়ো মেয়েটির গলা শোনা গেলো। ও একটা আনকোরা সিগারেট ঠোঁটে চেপে শুয়েছিলো। যেন এতোক্ষণ ধরে দেশলাই জ্বলবার অপেক্ষা করে চলেছে।

—"ইস, কী যে গরম!" ও কনুইয়ে ভর দিয়ে সিগারেট ধরালো—"আপনি এখনো ঘুমোন নি?"

ওকে সজাগ দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম। মার্থা ঘুমিয়ে থাকায় আমরা চুপচাপ একজন আরেকজনের কাছাকাছি চলে এলাম অথবা মনে হলো—আমরা যদি ইচ্ছে করি এক্ষুনি ঘনিষ্ঠ হতে পারি!

—"আমি প্যারিসে ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম।" বললাম।

—"ওমা দিনের বেলাতেই?" ও আশ্চর্য হলো।

—"অনিচ্ছাসত্বেও।" বললাম—"যে বন্ধুটির ওখানে উঠেছিলাম, সে ভুল করে বাইরে তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছিলো!"

—"তাহলে বেরোলেন কী করে?"

—"বেরোইনি।" বললাম—"বিকেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না এলো—গাড়ি ছাড়বার একঘণ্টা আগে অব্দি!"

—"তাহলে এটাই বুঝি প্যারিসে আপনার শেষ দিন?"

—"হ্যাঁ, শেষ দিনই বলতে পারেন।" বললাম।

—"বাব্বাঃ কামরা বন্দী হয়ে ঘুমুতে লাগলেন?" ওর চোখে-মুখে কৌতুকের ঝিলিক। আমি আলগোছে একটু খুশি হলাম। মেয়েদের হাসিয়ে দেবার পর হয়তো, পৃথিবীর সব পুরুষই এতোটুকু খুশি হয়ই। ছোট্ট একটু বিজয়—আসলে হয়তো ঘোড়ার ডিম; তবু মনে হয় যেন, যে পরিচয় এতোক্ষণ ধরে বুকে হেঁটে চলছিলো, এখন মাটি থেকে উঠে জোর পায়ে হাঁটছে।

জানালার পাশে সেই মেয়েটি ছিলো, যার নাম মার্থা। ও ঘুমুচ্ছিলো এবং প্যারিস অনেক পেছনে পড়ে রয়েছিলো। আমরা ভীষণ আস্তে আস্তে কথা বলছিলাম।

বড়ো মেয়েটি (আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার নাম জানতে পারিনি) ওপরে রাখা সুটকেস থেকে শাল বার করলো এবং আস্তে আস্তে মার্থার চারপাশে জড়িয়ে

দিলো—যদিও এতটুকু ঠাণ্ডা ছিলো না। তবু, শুয়ে থাকা প্রাণীটিকে ঢেকে রাখা ঠিক ততোটুকু প্রয়োজনীয়, যতটুকু—মরে থাকা মানুষটির চোখ বুজিয়ে দেওয়া। দুটো নিয়মই নিরর্থক হয়েও একটা বিচিত্র ধরনের আশ্বাস উৎপাদনকারী।

—"আপনি কখনো সুইজারল্যাণ্ডে নামেন নি?" ও জিজ্ঞেস করলো।

—"না। আমি প্রায়ই ক্রস করে যাই। থাকাথাকি হয় নি কখনো।" আমার উত্তর।

—"অনেকগুলো দেশ শুধু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে যায়!" ওর গলায় হাল্কা অবসাদ ফুটে উঠলো—যা যে-কোনো পুরনো অতীতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

—"প্যারিসে আপনি এই প্রথমবার গিয়েছিলেন বুঝি?" জিজ্ঞেস করলাম।

—"আমি অনেকবার গেছি—মার্থা এই প্রথম। ও একবার ওখানে ভীষণভাবে আসতে চেয়েছিলো।" ও এমনভাবে কথাটা বলল, যেন প্যারিস কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে, যাকে একবার ধরে ফেলা—জীবনের শেষ ধরা।

—"ফ্রেঞ্চ ছেলেটিকে..." বাললাম—"ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো।"

—"এমনটা হয়ই।" ও নির্বিকার গলায় বললো—"ওর অতীতটা ভীষণ আনন্দে কেটেছে—মার্থারও।" ও ভেবে চিন্তে বললো। তারপর নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তারপর আবার আমার দিকে তাকালো—যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে—আমি কে। ওর হয়তো বিশ্বাস হলো—আমি ঠিক আছি এবং যেহেতু ছুটি ফুরিয়ে আসছিলো, সেইহেতু ও হয়তো এও ভাবলো—আমার দ্বারা ওর কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

ট্রেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পাসপোর্ট পরীক্ষক ইন্সপেক্টর পালাক্রমে সবার কাছে পাসপোর্ট দেখতে চাইলো।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের গাড়িখানা কখন যে ফ্রান্সের সীমানা পেরিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছিলো—আমরা ঠাহরই করতে পারিনি। বেশ কয়েক বছর আগে, যখন আমি ইউরোপে প্রথমবার এসেছিলাম, প্রত্যেক নতুন সীমানা পার করবার সময়, আমার মধ্যে একটা বিচিত্র কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো!

তারপর থেকে সে রকমটা আর মনে হয় না। এখন শুধু পাসপোর্টের ইন্সপেক্টরদের দেখলেই বুঝে ফেলি অন্ধকারের মধ্যে আমাদের গাড়ি কোনো নতুন বর্ডার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তক্ষুনি এই ভাবনাটা আমার কাছে একটা

আতঙ্কে পরিণত হয়, যে, ইদানীং আমি বিদেশের ঠিক ততোটা ভক্ত হয়ে পড়েছি, যতোটা কোনো এক সময় নিজের দেশের ছিলাম।

সে ভাবনাটা খুব বেশী সময় টিকলো না। তখন আমি শোবার জন্যে ব্যস্ত। মাঝে বেশ কিছু স্টেশন এলো। বড়ো মেয়েটির কথা মনে পড়লো—কিছু দেশ আমরা জানালা দিয়ে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়ে যাই। আমার কাছে সুইজারল্যাণ্ডও ততো আকর্ষণীয় নয়—সে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখি। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে সোজা ভিয়েনা পর্যন্ত এইভাবে শুয়ে বসে চলে যেতাম।

কিন্তু তা হলো না। আমাকে মাঝখানেই উঠতে হলো—প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। মেয়েটি আমার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলো।

—"মার্থার মালপত্র নিচে নামাতে পারি?" ও বললো।

বাসেল পৌঁছুতে আর বেশী দেরি নেই।

আমাদের খুব একটা সময় লাগেনি। মালপত্রগুলো ওপরে রাখতে যা একটু কষ্ট, নামাতে তার আদ্দেকও না। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সুটকেসগুলোকে রেলের প্যাসেজ অব্দি নিয়ে এলাম। এ সব আমাকে একা করতে হয় নি—বড়ো মেয়েটি সব কাজে আমাকে সাহায্য করেছে।

কিছুক্ষণ পরে মার্থা যখন এসে আমাকে ধন্যবাদ জানালো—আমি ওকে নির্নিমেষ দেখতে লাগলাম। এটা বলা ভুল হবে যে আমি ওকে চিনতে পারিনি, কিন্তু, প্যারিসের স্টেশনে যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম, সে এই প্রভাতী মার্থার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও টয়লেট থেকে সবে ফিরেছিলো—ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক, ভুরুতে নীল ল্যাম্পশেডের মতো শেড—সেখানে যে কখনো অশ্রুকণা ছিলো—একথা ভাবাও অসঙ্গত মনে হলো।

সব কিছুই খোলামেলা মনে হলো—শুধু চুলগুলো ছাড়া, যা বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধা।

—"বেশ লম্বা ঘুম লাগালাম!" ও আমাদের দুজনের দিকে তাকালো এবং তখন আমার মনে হলো—চোখ-মুখের ভাব এক রাত্তিরের মধ্যেই পাল্টে ফেলা যায়, শব্দ বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পারে।

—"আমি যদি তোমাকে না জাগাতাম—তুমি আমার সঙ্গে ভিয়েনা অব্দি চলে যেতে!" বড়ো মেয়েটি হেসে বললো।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এলো। বাসেল আসছিলো। মার্থার চোখ দুটো

পার্সের মধ্যে কী যেন হাতড়াতে লাগলো। কিন্তু আঙুল স্থির। ও না আমাকে দেখছিলো না বাইরের দৃশ্য। ওর ঠোঁট দুটো শুধু হাঁ হয়ে ছিলো।

ও পার্স থেকে একটা আংটি বার করলো এবং অভ্যস্তভাবে পরতে লাগলো। খুব একটা কষ্ট হলো না। আঙুলের পুরনো দাগের ওপর আংটিটা নিজে নিজেই গিয়ে বসলো।

গাড়ি থামতেই আমরা তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে দিলাম। মার্থা বড়ো মেয়েটির গালে চুমু খেলো, আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো এবং স্বয়ং নিজে নিচে নেমে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত ও ওর মালপত্রের মধ্যে হারিয়ে রইলো, যেন ওর চোখ কী-একটা খুঁজছে। তারপর ছুটতে লাগলো ও। এবং তারপর একজন বলিষ্ঠ পুরুষ, যার মুখ আমি ভালো করে দেখতে পাইনি, আস্তে আস্তে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লো এবং মার্থার মাথাটা ওর চওড়া কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো।

আমার জন্যে সেটাই ছিলো তার শেষ ঝিলিক—যার নাম মার্থা। গাড়ি ছাড়লো। ওরা দুজন কিন্তু একইভাবে পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। প্ল্যাটফর্মের মধ্যিখানে। শুধু ওর স্যুটকেসটা উপেক্ষিত অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে রইলো—যেটা প্যারিস থেকে গাড়িতে ওঠবার সময় আগের-বলা প্যারিসিয়ান ছোকরাটি কতো কষ্টে ওপরে চড়িয়ে দিয়েছিলো।

কম্পার্টমেণ্ট-এ কয়েক মুহূর্ত নৈঃশব্দ্য ছেয়ে রইলো। তারপর বড়ো মেয়েটি আলতো করে হেসে উঠলো—"আমার তো ভীষণ ভয় করছিলো—ও আবার আংটি চিনতে ভুল করে না বসে!" ও বললো।

—"কোন আংটি?" আমার চোখ সরে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর সেঁটে গেলো।

—"বাক্‌দান-এর।" ও বললো—"প্যারিসে ছুটিতে থাকাকালীন ও ওটা খুলে রেখে দিয়েছিলো।"

ও ব্যাগ থেকে নতুন আপেল বার করলো এবং আমি আমার বিয়ার…!

আমার মনে আশা গজিয়ে উঠলো—ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও নতুন করে আবার ছুটি শুরু করা যায়।

শুরু হচ্ছে!

মাংসের নদী ॥ কমলেশ্বর

পরীক্ষা করে লেডী ডাক্তার এইটুকুই বলেছিল, তার শরীরে কোন গুপ্ত রোগ নেই, তবে যক্ষ্মার বীজাণু থাকতে পারে। সেই সঙ্গে তাকে একখানি প্রেসক্রিপ্‌শান লিখে দিয়েছিল। খাবার জন্য কিছু পথ্যও বলে দিয়েছিল।

কমিটি আগে থেকেই তাদের পেশার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিল। সকলেই বিব্রত। বোঝা যাচ্ছিল না কি হবে? ডাক্তারী পরীক্ষার পর অনেকের পেশা বারোটা বেজে গিয়েছিল। ইব্রাহীম ঠিকেদার যাদেরকে বেছে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সকলেই উৎরে গিয়েছিল। ফলে, ইব্রাহীমের ডাঁট অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সে ঘাড়গর্দান ফুলিয়ে অহংকারী গলায় নিজের বংশমর্যাদার কথা বলত।

ইব্রাহীম অবশ্য বেছে চোস্ত-দোরস্ত মেয়েদের আলাদা করে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ, সেই সব মেয়েরা শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে। ইব্রাহীম তাদের দেখাশুনা করত, যাদের নিয়ে গিয়েছিল, তারা ব্যবস্থা মত পয়সা প্রতিমাসে শোধ করে দিত।

জুগনূ একবার বেশ বিব্রত ও অসহায় হয়ে পড়ে, ইব্রাহীমকে সে অনুরোধ করেছিল, একটা ভাল জায়গা-টায়গা দেখে তাকে বসিয়ে দিক! কিন্তু ইব্রাহীম সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপর জবাব দিয়েছিল – 'এ তো আর বিয়ের ব্যাপার নয় যে কারো চোখে ধুলো দিয়ে গছিয়ে দেয়া যাবে। হুঁ, যারা আসে, তারা খুঁটে খুঁটে নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখে।' তারপর প্রচণ্ড উপেক্ষায় সে চলে গিয়েছিল।

সেদিন, বস্তুত জুগনূর বুকে প্রথম আঘাত বাজে—হায়, এখন সে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়বার আঘাত পায়, যেদিন ঝুল-বারান্দা থেকে শাহ্‌নাজ আঙুল মটকে গালাগাল দিয়েছিল—'হায় আল্লা, তোকে সেদিনের মুখ দেখতে হবে, যেদিন খদ্দের তোর দোরের সিঁড়িতে পা রাখবে না।'

শাহ্নাজের এই কথায় পাড়ায় বেশ শোরগোল পড়ে যায়। এ রকম গালাগাল শত্রুকেও দেয় না···সকলের খদ্দের যেন বেঁচেবত্তে থাকে। খোদা যেন পুরুষদের রুজি-রোজগার দেয়···কোমরে জোর দেয়!

সেদিনই সেই লোকটা তার কাছে প্রথম এসেছিল, একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গিমায়। ফত্তে তাকে নিয়ে এসেছিল। তার হাতে একটা বড় গোছের থলে। পরনে খাকি প্যাণ্ট ও নীল শার্ট। দাড়ি বেশ বড়-বড়। কানের রোমগুচ্ছে ও ভ্রূতে ধুলোর ঈষৎ প্রলেপ। ঘরে ঢুকতে দেখে জুগনূ খাটের উপর উঠে বসে, লোকটা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, থলেটাকে রাখবে কোথায়। তখনি, জুগনূ খুব সহজভাবে থলেটা নিয়ে মাথার কাছে রেখে দেয়। লোকটা চুপচাপ খাটের উপর উঠে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জুগনূই বলে ওঠে—'জুতো জোড়া খুলে ফেলুন···' লোকটা কেডস-এর জুতো খোলার সঙ্গে সঙ্গে একধরনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে··· কিছুটা, যেমন অনেকের কাপড় খুলে ফেলার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত···বিশেষত মনসু কেরানীর কাছ থেকে সে দূরে সরে থাকত, রাত ১১ টার পরেই সে আসতো, এবং কাজ শেষ হবার পর কোমরের বেদনা নিয়ে পাথরের মত বসে থাকত। জুগনূই তখন তাকে তুলে ধরত, তারপর উরু চুলকোতে-চুলকোতে সে কেটে পড়ত। কুঁয়রজীত হোটেলওলা, যে দুর্গন্ধ ছড়াত, ওঠার আগে খাটের ওপর বসে কেবল ওম্ ওম্ শব্দে ঢেকুর তুলত।

জুগনূ দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না, বলে—'জুতো পরে নিন।'

লোকটা জুতো পরে আবার বসে পড়ে। জুগনূর এবার বেশ রাগ ধরে। মিনিটখানেক তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর একটু রাগত স্বরে বলে—'এটা বাড়ির বৈঠকখানা পান নি···খালাস করে নিজের পথ দেখুন।' লোকটা অপমানিত বোধ করে, এবং নিজেকে সামলে নিয়ে কোনরকমে বিব্রত কণ্ঠে বলে—'তোমার নাম কি?'

—'জুগনূ!' সে বলে।

—'কোথাকার?'

—'আপনি নিজের কাজ দেখুন তো···' জুগনূ আবার ফুঁসে ওঠে।

তারপর সে অন্য সকলের মত প্রশ্ন করে বসে—'তোমার এই পেশা ভাল লাগে?'

—'হ্যাঁ! আপনার পছন্দ নয়?' বলতে বলতে জুগনূ শুয়ে পড়ে। হাঁটুর ওপরে

শাড়ি তুলে দেয়। লোকটাও পাশে শুয়ে পড়ে, তারপর জুগনূর ব্লাউজের ভেতর হাত ঢোকানোর বিব্রতময় চেষ্টা করতে থাকে।

'বিরক্ত করবেন না…' জুগনূ বলে, 'কেন খুলছেন…'

তাঁর জন্য কিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। জুগনূর মুখে সস্তা পাউডারের প্রলেপ… ঘাড়ে-গলায় পাউডারের স্থতো তৈরী হয়ে পড়েছে। ঠোঁটে রক্তহীনতার আভাস। ব্যাঙের চোখের মত কানের টাপ-জোড়া ফুটে উঠেছে। চুল তেলে জবজবে। বালিশ নিতান্তই নোংরা এবং বিছানার চাদর কোঁচকানো—দলিত চামেলি ফুলের মত, অপরিষ্কার।

সংকীর্ণ ঘরে বিচিত্র ধরনের গুমোট দুর্গন্ধ ছেয়ে আছে। এক কোণে জলের কুঁজো রাখা, পাশেই অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে। কয়েকটা ন্যাকড়া পড়ে আছে কোণে।

লোকটা শুয়ে-শুয়ে ইতস্তত চেয়ে দেখতে থাকে। জুগনূর মাথার দিকে একটা ছোট আকারের আলমারি রাখা, তার পাথর তেলের চেকনাইয়ে চকচকে। একটা ভাঙা চিরুনি, সস্তা নখপালিশের শিশি ও খোঁপার কয়েকটা ক্লিপ পড়ে আছে। আলমারির গায়ে পেন্সিলে লেখা কয়েকটা নাম ও ঠিকানা, কয়েকটা সিনেমা গানের বই একপাশে রাখা, আর তারই কাছাকাছি মরা সাপের মত বেণী পড়ে আছে। দেখতে-দেখতে তার মনে শিহরণ জেগে ওঠে। সে স্বীকৃতির আশায় জুগনূর উরুর কাছে হাত রাখে। বাসি মাছের মত তুলতুলে, খদ্দরের মত খরখরে সেই উরু। জুগনূর আধখোলা শরীর থেকে মৃদু স্থবাস ফুটে উঠছে। হাত কাঁপতে কাঁপতে উরুর কাছাকাছি চাদরের উপর এসে পড়লে, লোকটার মনে হয় চাদর সিক্ত হয়ে পড়েছে…

—'এখনি তো টাকা কামাবার সময়…এতক্ষণে চারজন খুশী তৃপ্ত হয়ে পড়ত।' জুগনূ বলেই, দুহাত আঁকড়ে তাকে আক্রমণ করে।

তারপর, লোকটা উঠে বসলে, জুগনূ ইয়াকি-ঠাট্টায় তার থলে খুলে দেখে। —'ওম মা, অনেক টাকা পয়সা নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন দেখছি।'

লোকটার মনে হয়, হয়তো জুগনূ ঠাট্টায় একআধ টাকা আরও বেশী হাতাতে চায়। কিন্তু থলেতে কাগজ, সংবাদপত্র ও রুটি দেখে জুগনূ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

'আবার এলে খোঁজখবর করে নেবেন…সোজা চলে আসবেন, কেমন? জু'নূ ঘর থেকে বেরোবার মুখে বলে। তখন সেই লোকটা জুগনূকে প্রথমবার ভাল করে লক্ষ্য করে, তারপর চুপচাপ চলে যায়।

যখনি জুগনু বাজারে বেরোয়, মাথায় আঁচল ঢেকে নেয়। সে মোটেই ছ্যাচড়া নয় যে কেউ তাকে টিট্‌কিরি মারবে। অবশ্য, সকলেই তাকে দেখে, তবে এমন-ভাবে যেন তার ওপর তাদের সমান অধিকার আছে। রাস্তায় হাঁটাকালীন জুগনুও তাদের দিকে চোরা-চাহনিতে লক্ষ্য করে, যাদের ভাল করে চেনে এবং যারা পুরুষের মত তার কাছে যাতায়াত করে। তারপর সহসা একদিন তাকে দেখা গিয়েছিল—সেই থলেওলা লোকটি। একটা দালানবাড়ির একতলার বারান্দায় কনুই ঠেকিয়ে সে বিড়ি টানছে। পরনে সেই পরিচিত শার্ট। দালানের মাথায় লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, তারই ছায়া গায়ের উপর কাঁপছে।

ছেঁড়া চটি মেরামত করার জন্য জুগনু দাঁড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে লোকটি সম্ভবত ভিতরে চলে গেছে।

রাত্রে সে আসে। চোখে পরিচিত আভাস। এবার ততখানি সঙ্কোচগ্রস্ত নয়। খাটের উপর বসে জুগনু তাকে জিজ্ঞেস করে—'আপনি কিসের কাজ করেন ?'

'কিছুই না।' লোকটি বলে, 'মজদুরদের সঙ্গে কাজ করি··· ।'

'আমার কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিন না···আমিও মজদুর।' জুগনু ঠাট্টা করে।

'তোমার দেরি হচ্ছে না।' লোকটা বলে।

'আজ শরীর তেমন জুত নয়।' জুগনু আলস্যভঙ্গিতে জবাব দেয়।

'কি হয়েছে ?'

'কোমরে বড্ড ব্যথা। গোটা শরীরে হাড় বিঁধানো যন্ত্রণা···জুগনু বলে—জানি না, আবার কি হলো···তারাকে ডেকে দিই ?···সে ভালো মেয়ের মতই ব্যবহার করবে···বুদ্ধিমতী মেয়ে···'

লোকটা বারণ করে। মিনিট কয়েক বসে সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, কেবল এইটুকুই বলে, 'না, এমনিই আজ চলে এসেছি।' তারপর সে আর কোন কথা না বলে চুপচাপ অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। জুগনু নির্বাক, নিস্পন্দ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই অন্য কারো ঘরে গিয়ে ঢুকবে। গলিতে তেমন বেশী লোক সমাগম ছিল না। কিছুটা ব্যবধান

রেখে লোকজনের তিন-চারটে দল ঘোরাঘুরি করছে। নানবাঈয়ের চিমনি বেয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে···জুগনূ লোকটাকে লক্ষ্য রাখে। না, সে কোথাও দাঁড়ায় না।

ধীরে ধীরে গলি পেরিয়ে রাস্তায় বাঁক নেয়—সেই রাস্তা, যেখানে ঐ দালান-বাড়ি দাঁড়িয়ে, যাতে সে বাস করে।

এমনভাবে লোকটাকে ফিরে যেতে দেখে জুগনূর, ভাল লাগে। হাল্কা ধরনে খুশী খুশী ভাব জাগে। ফিরে এসে খাটের উপর শুয়ে পড়ে।

ঘরে কিছুটা স্যাঁতসেঁতে ভাব ছেয়ে আছে, সেই সঙ্গে ভ্যাপসা দমবন্ধ দুর্গন্ধ। দরজা সে বন্ধ করে দিয়েছিল, আলমারি থেকে ফিল্মী গানের চটি বই তুলে মনে মনে গুন্‌গুন্ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়ে, মাসীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'জুগনূ! অ জুগনূ! বিটি আমার, অজ্ঞান হয়ে পড়িস নি তো!

'ঘরে কেউ নেই মাসী।'

'তাহলে বারান্দায় বেরিয়ে আয় বিটি···কি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে···গলিও বেশ জমজমাট···' বলেই মাসী দরজার পাল্লা খুলে দেয়, 'শরীর ভালো ত?'

'একটু খারাপ লাগছে মাসী।'

'এক গেলাস দুধ খেয়ে নে বিটি···এখনি তো সময়! কেউ এসে পড়তে পারে···জুগনূ উঠে বসে। তার ঘাড়ের কাছে তালুর উল্টো পিঠ ঠেকিয়ে মাসী জ্বর দেখে, তারপর কোমরে উপরে পিঠের নীচে মাংসের পুরু ভাঁজ দেখে বলে, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়া তুই ছেড়ে দিয়েছিস দেখছি···দিন দিন কোমরে কি মোটা চামড়ার পরত জমছে···একটু-আধটু রোজ টিপিয়ে নিস না কেন···' বলেই পাশের ঘরে চলে যায়। একটু বাদে পাশের ঘর থেকে সশব্দে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। মাসী আবার বক্‌বক্ করতে করতে বেরিয়ে চলে যায়, 'হতচ্ছাড়ী মেয়ে! ঝগড়া না করে লাগাম টানতে দেয় না···দেখিস, কোনদিন এ ঘরে খুন না হয়ে যাবে না···।'

এটা রোজকার ব্যাপার···বিলকীসকে মাসী এমনি শাপমন্যি করে। বিলকীস বলে, তার কাছ থেকে কোমরের ব্যথা না চেপে কেউ ফিরে যেতে পারে না। বিলকীস এতে বেশ মজা পায়। লোককে ছেড়ে দেবার পর সে তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়াত, এবং পরাজিত লোকটাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে হাততালি দিয়ে দরাজ গলায় হেসে উঠত, 'ওমা অ মরকুটি জুবেদা! এদিকে চেয়ে ছাখ···রুস্তমবাবু যাচ্ছেন। হু বড় এলেন পালোয়ানের বেটা। এই মেড়া নাকি মেয়েমানুষের সঙ্গে শোবে!'

লোকটা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, 'কি বক্‌বক্‌ করছো ?'

'আরে যা-যা ভিস্তির পো…নে, এই সিকি নিয়ে যা, এক ছটাক রাবড়ি গিলে নে…'

লোকটা তারপর তীব্র অপমানে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে গিয়েছিল। বিলকীসকে নিয়ে গোটা বাড়িটায় ভয় ছেয়ে থাকত। কি জানি, কখন আবার ঝগড়া না করে বসে। হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বেশ দেমাগী গলায় বিলকীস প্রায় বলে, 'আমি যে ব্রহ্মচারীর মেয়েমানুষ গো…'

জুগনূকে দেখলেই বিলকীস ঠেস দিয়ে কথা বলে সর্বদা, 'তুই কারুর ঘরে গিয়ে বাঁধা হয়ে থাক…' কিন্তু জুগনূ কখনও তার সঙ্গে বিবাদ করে নি। সে জানে, বিলকীসের ঠোঁট বড় কাটা। মাসীকেও এতটুকু লেহাজ করে না। আর মাসী সকলের শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়। শরীর চোস্ত-দোরস্ত রাখার জন্য চেঁচামেচি করে প্রায়। 'মোষের মত যে ছড়িয়ে পড়ছিস, এবার সাটিনে সায়া ধর আলু খাওয়া একটু কমা তো পোড়ামুখী।'

পেটের চামড়া ঢিলে হয়ে আসতে, জুবেদার জন্য বাক্সের ভেতর থেকে পুঁটলি বের করে আনে, 'নে দিনের বেলায় এটা দিয়ে বেঁধে রাখ। চা খাওয়া একটু কম কর…' এবং সে বুকের সমস্ত মাপের ব্রেসিয়ার এনে রেখেছিল। তার কেবল একটাই চিন্তা—'আমার ইচ্ছে খাটলে, তোদের জন্য বয়স ধরে রাখতুম…'

দুপুরের দিকে মাসী খুব আন্তরিকভাবে কারুর চুলের জট পরিষ্কার করতে বসে, কখনও বা রাতের জন্য শাড়ি ইস্ত্রি করে। ফত্তের জন্য রুমালে রঙ করতে ভোলে না। ঈদ-বকরঈদ, দোল-পরব বেশ ধুমধাম সহকারে পালন করে, এবং কখনও-সখনও কমলার কথা মনে পড়লে ড্যাবডেবে চোখে বলে ওঠে—'ঐরকম মেয়ে হাজারটা পেটেও জন্ম দিতে পারবে না…খোদা কি খাপসুরত রূপ দিয়েছিল, যেন হাত ঠেকালে ময়লা হয়ে যাবে…পয়সাঅলাদের ঈর্ষাই ওকে খেয়ে ফেলেছে। বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল কুত্তারা…খুব ছটফট করেছিল বেচারী! আহা, আমি ওকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি…'

জুগনূ বারান্দায় এসে বসে। যাতায়াতকারী লোকজন লক্ষ্য করে। ভিড় ধীরে ধীরে ক্রমশ পাৎলা হয়ে আসে। মালাওলারা একে একে উঠে চলে যাচ্ছে। জুগনূ দেখতে পায়, রোজকার মত মন্নন মালী যাবার সময় একটা মালা কলাবতীর জানলা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে, এবং কলাবতী রোজকার মত

মুচকি হেসে মৃদু গালাগাল দেয়। বম্বে কলইওলা ধোয়া তহমদ ও জালিদার বেনিয়ান পড়ে আসে, সোজা শাহ্‌নাজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

শংকর পানওলার সামনের চত্বরে নিম পাগল চুনীলাল ছালা বিছিয়ে বসে আছে, এনামেলের মগে চা খেতে খেতে বক্‌বক্ করছে, 'ওরে অ জালিম (নিষ্ঠুর)···এখানে নেমে আয়···এই ছালার উপর শুয়ে ফুলশয্যা হবে··· হায় জালিম!'

এবং তখনি চকিতে গলির মোড়ে সেই নীলশার্টের আভাস দেখা দেয়। সম্ভবত সে আবার ফিরে এসেছে, লুকিয়ে কোন এক ঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু না, তার ভ্রম ছিল। সেই লোকটা নয়, অন্য কেউ।

আবার অনেকদিন পর সে ফিরে আসে। জুগনূর ঘরে ঢুকে ঠিক বাড়ির মত খাটের উপর শরীর ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু, জুতোজোড়া খোলার সাহস তবুও তার হয় না।

'আপনার নাম কি তাতো বলেন নি।' জুগনূ তার পাশে শুয়ে প্রশ্ন করে।

'মদনলাল···কেন?'

'এমনিই···এখানে বুঝি ছিলেন না?'

'জেলে গিয়েছিলাম···অ্যারেস্ট হয়েছিলাম, তাই···'

'কেন?'

'ধর্মঘট চলছিল···মালিকপক্ষরা বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে শেষাবধি রেহাই পেয়েছি···'

'এইসব ধর্মঘটে কিছু হয় কি? কেন করেছিলেন?'

'বিনা নোটিসে ছাঁটাই হয়েছিল···তুমি এসব বুঝবে না। এ ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার ছিল···জুতোজোড়া খুলে ফেলি···' মদনলাল সসঙ্কোচে বলে।

'বেশ তো, খুলে ফেলুন···'

কেডস্‌এর জুতোর ভেতর থেকে এবং ঘামসিক্ত পা থেকে যে দুর্গন্ধ বেরোয়, জুগনূ তাতে খুব একটা বিব্রত বোধ করে না···ধীরে ধীরে সেই গন্ধ যেন তার চারদিকে মিশে যায়···তারপর, তার শরীরে ছেয়ে যায়।

মদনলাল ফিরে যায় বটে, কিন্তু গন্ধটা তার শরীরে ছেয়ে থাকে। এবং সেই রকম সময়ে সমস্ত পেশাদারী মেয়েদের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য হাজির হতে

হয়েছিল। লেডী ডাক্তার তাকে শুধু এইটুকুই বলেছিল, তার শরীরে কোন গুপ্ত রোগ নেই, তবে যক্ষ্মার বীজাণু থাকতে পারে।

ক্রমশ তার কাশি বৃদ্ধি পায়। গায়ে জ্বর চেপে থাকে। মাসী তাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে আনে, কিন্তু রোগ কমে আসার কোন লক্ষণ দেখা দেয় না। ক্রমশ, সে কাজ করার মত থাকে না। একদিন থুতু ফেলতেই বিলকীস বাড়ি মাথায় করে তোলে, 'ওমা, এটা বাইরে কোথাও ফেলে আয়। আমরা মরবো নাকি?' শুনে মাসী তাকে ধমক দিয়েছিল, কিন্তু সেও ভেতরে ভেতরে ভয়ে কেঁপে ওঠে। নানাভাবে সে জুগনুকে বোঝায়, নিজের স্বাস্থ্যের জন্য অন্যত্র কোথাও চলে যাক। দরকার হলে শ-পঞ্চাশ টাকা নিক, কিন্তু এ রকম দায়িত্বহীনতা যেন না করে···

জুগনু বুঝে উঠতে পারে না, সে কোথায় যাবে। তার কাছে তেমন পয়সাও নেই, তা ছাড়া এক'শ দু'শ টাকায় কতদিন আর চলবে। শেষে হার মেনে যক্ষ্মাহাসপাতালে ভর্তি হয়ে পড়ে। মাসীর দেয়া, ও তার নিজের সঞ্চিত সমস্ত টাকা একসময় শেষ হয়ে আসে। চারমাস এক নাগাড়ে তাকে স্যানাটোরিয়ামে থাকতে হয়। তারপরেও তাকে ছুটি দেয় নি, তবে কোথাও কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া-আসায় তেমন বাধা ছিল না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মাসীর কাছে দু-চারবার আসে, মাসী তাকে বলে—'ও মেয়ে কাউকে যেন বলিস না কোথায় ছিলি · আমি বলেছি রামপুরে গেছে, বোনের কাছে, দিন কয়েক পরেই ফিরবে···কিন্তু, মুখপোড়া দারোগা বড্ড জ্বালাতন করছে···ওর সন্দেহ তুই নাকি এখানেই কোথাও বসেছিস···'

মাসীর চোখে আন্তরিকতার আভাস পেয়ে তার একটু ভরসা হয়। মাসী তার অবস্থা দেখে বস্তুত দুঃখী হয়েছে। জুগনুর শরীর অনেকটা ঢিলে হয়ে পড়েছে···মাথার চুল শণের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং মুখে লাবণ্য হারিয়ে গেছে।

জুগনু আয়নায় যখনি চেহারা দেখে, ভয়ে চমকে ওঠে। এরপর কি হবে? কি করে কাটবে এই পাহাড়ের মত রুগ্ন জীবন। সাহায্য—অন্য কোন সহায়-সম্বল নেই, কোন কাজ করার গুণও নেই তার···

পেশায় বাধা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক নতুন মেয়ে লক্ষ্ণৌ বেনারস থেকে এসেছে, এবং তারা গোটা বাজারকে মন্দা করে রেখেছে। শুনেছে, শাহ্‌নাজের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে, এবং কলাবতীর অবস্থা না-খেতে পেয়ে মরে যাবার দাখিল।

এইসব শুনে-বুঝে জুগনূর বুক কাঁপে।

ফিরে যাবার আগে সে মাসীর কাছ থেকে কিছু ট্যকা চায়। মাসীও এখন কাঁদুনে গাইতে শুরু করে, বিপর্যস্ত অবস্থার বয়ান করে। তার অবস্থাও খাস্তা হয়ে এসেছে।

স্যানাটরিয়ামে ফেরার পথে জুগনূ ঐসব পরিচিত জনের দিকে আশ্রয়-মাখা দৃষ্টি ফেলেছিল, যাদের সে জানত। ওপচানো যৌবনের দিনে তার কাছে যাতায়াত করত যারা।

মনসু কেরানীকে দোকানে বসে থাকতে দেখে জুগনূর শরীর ঘৃণায় পাক দিয়ে ওঠে…কোমর আঁকড়ে ধরে তার বসে পড়ার ভঙ্গিমা, তারপর উরু চুলকোতে-চুলকোতে ঘর থেকে পাগলের মত বেরিয়ে যাওয়া…

কুঁয়রজীত হোটেলওলা ময়লা পাজামা পরনে নোট গুণছিল…ওঠার সময় সর্বদা ওক্ ওক্ করে ঢেকুর তুলত, আর জুগনূ গা গুলিয়ে উঠত…

জুগনূ অন্যান্যদেরও লক্ষ্য করেছিল…যাদের সঙ্গে তার সামান্যতম দেখাশুনা ঘটত।

স্যানাটোরিয়ামে জুগনূকে বেশীদিন থাকতে হয় নি। একসময় তাকে ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু, সকলের প্রতি সে কৃতজ্ঞ ছিল, যারা তার কষ্ট ও দুঃখের দিনে চোখ ফিরিয়ে নেয় নি।

এবং যার কাছ থেকে যা কিছু সে গ্রহণ করেছিল, সবই ঐ প্রেসক্রিপ্-শানের পেছনে লিখে রেখেছিল। এতদিন বেশ কিছু টাকা ধার হয়ে পড়েছে। কুঁয়রজীত হোটেলওলা উদারতা দেখিয়ে সাতচল্লিশ টাকা তাকে দিয়েছিল। মনসু অবশ্য ততটা দাক্ষিণ্য দেখায় নি, কিন্তু টাকাটা সে তাড়াতাড়ি ফেরত দেয়ার কথা বলে দিয়েছিল—যেন পঁচিশ টাকার অভাবে তার কারবার ডুবে যাচ্ছে।

সন্তরাম ফিটার তাকে কুড়ি টাকা দিয়েছিল এবং যাবার সময় ইতর ঠাট্টা করে, 'সুদের বদলে এক রাত…রাজী আছো ত…' কিন্তু, তার ইতর ঠাট্টায় জুগনূর মনে হয়েছিল, যাক্ লোকেদের চোখ এখনও তার ওপর টিকে আছে। শরীর ততটা নষ্ট হয় নি, যতটা সে ভেবেছিল।

অভাবের সেই সব দিনে সে একদিন মদনলালের সঙ্গে দেখা করে ত্রিশ টাকা চেয়ে নিয়েছে। কেবল এই কথাই বলেছিল সে, 'এটা চাঁদার টাকা দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফেরত দিলে ভাল হয়, আমার কাছে এত পয়সা নেই যা

দিয়ে ভরতুকী করি।' তার কথায় নিশ্চিত অসহায়তা ছিল। বেশ অপ্রস্তুত-ভাবে সে কথাগুলি বলেছিল, এবং সেই সঙ্গে এও বলেছিল—জুগনু যেন তাকে ভুল না বোঝে···তেমন সামর্থ্য তার নেই। আর কোন কথা না বলে সে পার্টি অফিসে ঢুকে পড়ে।

দরকারের সময় বুকের ওপর পাথর রেখে জুগনু টাকা চেয়েছিল কিন্তু কষ্টও হয় তার।

এখন, স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরে আসার পর, পুলিশের লোকেরা আবার তাকে বিরক্ত করতে শুরু করে। সাতমাস ধরে তারা পয়সা পায় নি। এই বাড়িতে সকলের নামে আলাদা-আলাদা করে পয়সা ধরা আছে।

ফিরে আসার পর, সে ভিতরে বেশ দুর্বল বোধ করে। শরীরে আর তেমন কুলোয় না। কেউ একটু বেশী হুড়োহুড়ি করলে হাল্কা ধরনের কাশি ঠেলে বেরোয় ···পাঁচ-দশ মিনিট দম বন্ধ হয়ে আসে···দস্যুরা তার বুকের ওপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দেয়···

থেকে থেকে মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ত, যেমন প্রথম দিকে শুরু হত। তার মনে হয় যেন সে এইসব ক্রিয়াকাণ্ড নতুন শুরু করেছে। চুলের একটা ফল্‌স সাত টাকায় কলাবতীর কাছ থেকে কিনেছে, সেই সঙ্গে বুকেও সে 'কাপ' আঁটতে শুরু করে। প্রতিবার সেটা খোলা ও আঁটার সময় বিরক্ত বোধ করে। কলপ দেয়া শাড়ি পরতে তার ভয়ানক রাগ হত, কিন্তু এখন কলপ দেয়া শাড়ি ব্যবহার করে। শরীর থরথর করে, তবুও।

এতসব করা সত্ত্বেও তার আয় এমন কিছু হয় না। কোন কোন রাত এমনিই ফাঁকা পেরিয়ে যায়। ঘরে একা শুয়ে ভয়ে হিম হয়ে উঠত···এই পর্বতসদৃশ জীবন ···দিন দিন ভেঙে পড়া শরীর···

নপুংসক লোকেদের কাছ থেকে সে বেশ বিরক্তি বোধ করে। তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়···খুঁটে খুঁটে সব কিছু দেখত, তারপর, উত্তেজনার প্রতীক্ষায় তাকে জ্বালাতন করে। যখন-তখন হাত সেঁধিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে নানান ধরনের ইতরামিও করে।

বরং তারা অনেক ভাল, যারা বন্দুক উঁচিয়ে আসত···তারপর কাজ শেষ করে চলে যায়। তারা বেশী বকবকানি করে না, এমন কি বেশী জ্বালাতন করে না। তবুও, জুগনুর আয় এমন কিছু হয় নি, যাতে দিন কাটে। দেনা শোধটুকুও হয় না।

প্রেসক্রিপ্‌শানের পেছনে সকলের টাকা নোট করে রেখেছে…কিন্তু শোধ করার মত কখনও তা হাতে আসে না।

অবশেষে আর কোন উপায় থাকে না। জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে স্ফুটিত ফোড়া দেখানোর জন্য জুগনূ যখন ক্ষত চিকিৎসকের কাছে যায়, রাস্তার মাঝে মনসু তাকে বাধা দেয়— 'অনেকদিন হল…এখন তোমার কাজ-কারবারও ভাল চলছে!

হাঁটতে হাঁটতে তারা একপাশে এসে দাঁড়ায়। শেষে ভয়ানক অসহায় ভঙ্গিতে জুগনূ বলে ফেলে, 'একটা পয়সাও হাতে থাকে না, কি যে করি…তুমি তো আসা-যাওয়া ভুলে গেছ…'

'আমি কানে মন্ত্র নিয়েছি…মাগীবাজী আর করবো না। তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করেছি, এই দ্যাখো।' মনসুর কথা শুনে জুগনূর হাল্কা ধরনের হাসি পায়, সে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে।

জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে ফুটে ওঠা ফোড়ার দরুন জুগনূর হাঁটতে বেশ যন্ত্রণা বোধ হয়। সে কিছুটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে হাঁটে…জুগনূর মন কাঁপতে থাকে। গলির মোড়ে এসে মনসু ধীরে ধীরে বলে, 'তা হলে…বললে না যে…কবে ব্যবস্থা করবে।'

'সুযোগমত শোধ করে দেবো।' জুগনূ তার অসহায়তা ঢোঁক গিলে কৃত্রিম চপল দৃষ্টি তুলে বলে। তারপর গলিতে ঢুকে পড়ে। নিজের কথাতেই সে লজ্জা বোধ করে…পরে মনে হয়, সে ঠিক বলেছে…খামোকা মান ইজ্জতের অর্থ কি? তাছাড়া কারো ঋণ নিয়ে সে মরবেই বা কেন? যত নামুক ততই মঙ্গল।

ক্ষত চিকিৎসক জানায়, এখনও ফোড়া পাকতে দেরি, দিনকতক লাগবে। তাকে বাঁধার জন্য পুলটিস দেয়। জুগনূ যখন ফিরে আসে তখন দুপুর। সকলেই নিজের-নিজের চত্বরে বসে কথা বলাবলি করছে। এখনি সময়, যখন সকলেই জেগে উঠে পড়ে, বিকেলের জন্য তৈরী হবার আগে মিলেমিশে একসঙ্গে বসে। গলি থেকে কাঁচা বয়সের ছোকরাদের দল ঘুরঘুর করে। দূর থেকে তারা ইতর ইশারা করে মেয়েদের রাগায়, প্রত্যুত্তরে বাপ-ঠাকুরদার নামে দেয়া গালাগাল উপভোগ করে। এই সব বাউণ্ডুলে ছোকরারা প্রত্যহ ঘুরঘুর করে…এবং প্রতিদিন এই বিনোদন তাদের রুটিন বাঁধা। চলতি বয়সের মেয়েরা নোংরা ইঙ্গিত দেখে বাপ-ঠাকুরদার নামে গালাগাল দিতে থাকে, কমবয়সী মেয়েরা হাসতে থাকে। মাঝে মাঝে হাসান, বানোয়ারী বা খোঁড়া মাতাদীন ঐ সব ছোকরাদের হাঁকিয়ে

দেয়, তখন তারা গলির মোড়ে পৌঁছে গালাগাল দেয়, প্যান্ট বা হাঁটু তুলে নানা-ধরনের অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ করে। ছোকরাদের এই দলটা মসজিদের পেছনের বস্তি থেকে আসে…

দুপুরেই সুখ-দুঃখের আলোচনা হয় এবং চুগলি-চর্বণও। অধিকাংশ চুগলি সেই সব মেয়েদের উদ্দেশ্যেই যারা এই পাড়া থেকে উঠে গিয়ে একটু উঁচু তলায় গিয়ে বসেছে…যাদের বেছে বেছে ইব্রাহীম নিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধে পড়লেই গলি গরম হয়ে ওঠে। ফুলওলা আসে। পানওলার দোকান সেজেগুজে তৈরী আর গফুরের দোকানে একজন পুলিশ এসে বসে পড়ে…সে বসে পড়লে গফুর তখন খোলাবাজারে বোতল বিক্রি করতে শুরু করে দেয়।

জুগনূ সন্ধের আগে পুলটিস নাবিয়ে রেখে দেয়, এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরুৎসাহ ভরে সেজেগুজে বসে থাকে। ফোড়া শক্ত গুটলি হয়ে এসেছে, তাই বেশ যন্ত্রণা হয়। তবুও এরই মধ্যে দু-একজনকে যে করেই হোক খুশী করে দেয়।

বারান্দায় বসে যখন সে ভাবনায় ডুবে যায়, তার চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে পর্বত-সদৃশ জীবন, তখন সে ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়ে। কি হবে? সে যে প্রতিটি অন্নের দানার জন্য মুখ চেয়ে থাকবে। খোঁড়া অশ্বের জীবন সে কাটাবে কি করে …তাকেও কি বোরখা পরে মসজিদের সিঁড়ির ওপর বসতে হবে এবং আল্লার নামে হাত বার করবে? আখতারির মত·· বিহব্বো বা চম্পার মত…বুক ধড়ফড় করে উঠলে সে বিষ খাবার কথা ভাবে…কিংবা ডুবে মরার কথাও ভাবে।

কত পুরুষ এল-গেল…কিন্তু, এমন কেউ নেই, যার ছায়ার তলে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া চলে।

একটু বেশী জানাশোনা তাদের সঙ্গেই ছিল, তাই তাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। কিন্তু, সেখানে কোন আশ্রয় ছিল না। কার কতটুকুই বা ভরসা…কে কোথায় চলে যাবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ফিরে যায়। ছেলেপেলে একটু বড় হলেই তাদের যাতায়াত বন্ধ। মেয়েদের বয়স একটু বাড়লে পুরুষেরা তখন অন্য পথ ধরে অন্য মুখ খোঁজে…তখন কে আর আসবে? পুরনো পরিচিত চেহারাও তখন দেখা দেয় না। নিজেকে কত বিচিত্র ও ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ হয়…অতীত সময় নিয়ে বেঁচে থাকাও কত যন্ত্রণাদায়ক…

গত কয়েকদিনের ব্যাপারে তার ধারণা জন্মেছে, পাওনাদারেরা টাকা আদায়ের জন্য তার কাছে আসা-যাওয়া করছে…তবুও তার আশা ছিল, মনসু নিশ্চয়ই আসবে, সে তার টাকা নিশ্চয়ই আদায় করবে…অবশেষে সে এল।

মনসুর গা থেকে সেরকমই তাপ উথলে ওঠে, সে আসে প্রায় রাত এগারোটার পর এবং কাজ শেষ করার পর কোমর ধরে বসে পড়ে। জুগনুও কাহিল অবস্থায় পড়ে থাকে। ফোড়ার ওপর চাপ পড়ায় সে কাতরে ওঠে, তবুও তার সাহস হয় না যে মনসুরকে তুলে দরজা অব্দি এগিয়ে দেয়, যাতে চিরদিনের মত উরু চুলকোতে চুলকোতে চলে যাক্।

মনসুর আঁকড়ে ধরা কোমর কিছুটা আলগা হয়, বলে, 'মনে রেখো…'

জুগনু তাকে 'আচ্ছা' বলে, মনসুরকে ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়।

বেশ রাত হয়। সে বিছানায় শুয়ে থেকে ঘরের দেয়াল দেখতে থাকে। অবশ্য দেখার কিছুই ছিল না। স্যাঁতসেঁতে ঝুরঝুরে দেয়াল, কোন একসময় বাজে পত্রিকা থেকে ফিল্মস্টারদের ছবি কেটে যার গায়ে এঁটেছিল। কোণে পেরেকে একটা দড়ি ঝোলা, পুরনো চুড়ির গোছা ঝোলে, এবং দেয়ালের গা ঘেঁষে নেলপালিশের শূন্য শিশি পড়ে আছে…

খাটের তলায় প্যাঁটরা রয়েছে, টিনের বাক্সও একটা—সেই বাক্সে বছরখানেক আগেকার একটা প্রেসক্রিপ্‌শান আছে, যার হরফ উবে গেছে। এখন সেই প্রেসক্রিপ্‌শানের কোন অর্থ নেই। মুসাবিদা মৃত। এখন আর কে ফিরে যাবে…কেই বা ফিরে আসার জন্য ডাকবে…জীবনের মাঝ থেকে সময়ের নদী তীর ভেঙে এগিয়ে গেছে…কেউ কোথাও নেই…কেউ কোথাও নেই। সকালে উঠতে গিয়ে মনে হয় শরীর ভেঙে গেছে। ফোড়ায় সাংঘাতিক যন্ত্রণা। জঙ্ঘার জোড় যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। সে আবার পুলটিস বেঁধে নেয়। সন্ধেবেলায় কোনরকমে তৈরী হয়ে নেয়। ঘরে ঢুকে সকালের হিসেবটা দেখে নেয়। আলমারির গায়ে সে দাগ কেটে রেখেছিল, কে কতবার এসেছিল, কত টাকা শোধ হয়েছে। সন্তরাম ফিটার বাস্তবিক খুব কদর্যভাবেই তার কাছে হাজির হয়। কুড়ি টাকার বদলে সে চার বার বসে, পঞ্চম বার যখন সে উঠে যায়, জুগনু খুব আস্তে তাকে বলে—শুধু শুধু চলে যাচ্ছ?

'কেন?' সন্তরামের চোখে শয়তানি দৃষ্টি।

'গতবারেই সব টাকা শোধ হয়ে গেছিল।' খুব বিরক্ত, অথচ স্পষ্ট গলায় সে বলে।

'এবারটা সুদের বদলে।' সন্তরাম বেশ কদর্য ভঙ্গীতে বলে, 'টাকা ফোক্‌টে আসে না, বুঝলে।' ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেবে যায়।

জুগনু হতাশ হয়ে চেয়ে থাকে। সহ-পসারিনীদের মত সে ঝগড়াঝাঁটি

করতে পারে না। চেঁচামেচি, হৈচৈও করতে জানে না, এমনকি লোকেদের বেইজ্জৎ করে তাড়িয়ে দিতে পারে না।

কুঁয়রজীত হোটেলওলার টাকাই সবচেয়ে বেশী বাকী পড়ে আছে তার কাছে। তিনবার এসে গেছে ইতিমধ্যে। মোট পনরো টাকা শোধ হয়েছে। মনস্থর কুড়ি টাকাও নেমে গেছে…ভার কমে। দম ফেলার অবকাশ পেয়েছে, অমনি ফোড়া টিস্ করে ওঠে। সে পা ছড়িয়ে সেখানেই বিছানার উপর শুয়ে পড়ে।

দরজায় পদশব্দের আঁচ পেয়ে দেখে মদনলাল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে মুহূর্তখানি ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝিয়ে ওঠে। যেন আরেকটা সুদখোর পাঠান সামনে এসে দাঁড়িয়েছে…নিজেরটা আদায় করার জন্য।

মদনলাল এর মাঝে আসে নি। এই সময় তার আগমন জুগনূর মনে রাগ জাগিয়ে তোলে। তবুও অসহায় অবস্থায় সে তাকে ভেতরে ডেকে নেয়… মদনলাল খাটের ওপর এসে বসে। থলেটা মাথার দিকে সরিয়ে রাখে। জুগনূ দ্বিধাহীন তার থলে হাতড়াতে থাকে। তাতে কয়েকটা পোস্টার আর ভাঁজ-করা একটা ঝাণ্ডা পায়। দু-একটা পুরনো রেজিস্টার ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক কেঁপে ওঠে, না জানি সে আবার নগদ পয়সা চেয়ে বসে। এদিকে ফোড়া টিস্ করতে থাকে।

মদনলালের শরীরে সেই পুরনো পোশাক, সেই পরিচিত জুতো। ঘামের পচা গন্ধ গোটা ঘরে ভরে ওঠে।

'অনেকদিন পর আসা হল।' কোনরকমে জুগনূ বলে।

'জুতোটা খুলবো।' মদনলাল হাল্কাভাবে বলে।

'খোলো…'

'দরজা বন্ধ করে দিই…'

'আজ একটু ব্যথা আছে…কুঁচকির পাশে ফোড়া উঠেছে। কোনরকমে সোজা হয়ে থাকা যায়, কিন্তু পা মুড়তে গেলেই প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্থা…' জুগনূর কথা শুনে মদনলালের হাত জুতোর ফিতে খুলতে গিয়ে থমকে যায়। মনে মনেই সে একটু লজ্জিত হয়। জুগনূ নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কিন্তু, মদনলাল তা কাটিয়ে ফেলে। সে ইতস্তত নানান কথা শুরু করে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে জুগনূর ভয় এই বুঝি ঘুরে ফিরে শেষে টাকায় এসে কথা থামবে…

'আচ্ছা চলি তাহলে…' মদনলাল থলে হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সরাসরি, পূর্ণদৃষ্টিতে জুগনূকে লক্ষ্য করে…যেন আজ ফিরে যেতে তার কষ্ট বোধ হয়।

সমস্ত ব্যাপার বোঝা সত্ত্বেও জুগনু এখন দ্বিতীয়বার তাকে বসার জন্য বলতেও পারে না। তবুও, কিছুটা সঙ্কুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে—'তোমার সেই টাকাটা…'

'তার জন্য নয়—' মদনলাল বলে, 'তোমার জন্যই এসেছিলাম।'

তার বগলের তলায় ভেজা ঘাম কালির দাগের মত চিক্‌চিক্ করতে থাকে। বাহুজোড়ায় ফুলে ওঠা শিরা ঘর্মাক্ত। সে ঘর্মাক্ত হাতে জুগনুর হাত ধরে, মনে হয়, যেন হাতের তালুতে গরম মোলায়েম রুটি হাল্কা ধরনের উত্তাপ এসে লাগে।

'আমি আবার আসবো…' বলেই মদনলাল চলে যায়। জুগনু বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কিছুটা অনুতাপ ছিল মনে, তাকে এমনি ফিরে যেতে হচ্ছে। মদনলালকে সে লক্ষ্য করে…গলির তিন চারটি ঘর অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে থাকে। গলিতে এভাবে থেমে দাঁড়িয়ে পড়া জুগনুর সহ্য হয় না। কিন্তু মদনলাল, তারপর উপরে বারান্দায় একবার দৃষ্টি ফেলে পঞ্চম ঘরের সিঁড়িতে উঠে পড়ে।

জানি না, একধরনের চিড়চিড় তার শরীরে ছেয়ে ওঠে। ফোড়া আরও জোরে টিস টিস্ করে ওঠে!…তারপর যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কমে আসে। যদি সে মদনলালকে বাধা দিত, তাহলে নিশ্চয়ই সে যেত না…যাই বল না তারও হয়তো…যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত। সে কেবল জুগনুর কষ্টের কথা ভেবে ফিরে গিয়েছিল—তার ঘর্মাক্ত হাতের উষ্ণতায় কোনরকমের কপটতা ছিল না…

তখনই কুঁয়রজীত এসে হাজির। হঠাৎ-ই মনে হয় যেন অপর কেউ ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে সে হেসে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বিলকীস ওদিকে কোণে দাঁড়িয়ে জনৈক মস্তানের সঙ্গে কথা বলছে। জুগনু চুপচাপ কুঁয়রজীতকে নিয়ে ঘরে চলে আসে। দরজা ভেজিয়ে দেয়। কুঁয়রজীত শেকল তুলে দেয়।

'আজ বেশ টাটাচ্ছে…ফোড়াটা পেকে গেছে!' জুগনু বেশ আদর গলায় তাকে বোঝায়।

'এখনও শুকোয় নি?' কুঁয়রজীত জিজ্ঞেস করে।

'হুঁ, দু-একদিনের মধ্যেই ফেটে যাবে।' জুগনু যেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

'একটুও ব্যথা হতে দেবো না…খুব আলগোছে…কেমন…' বলতে-বলতে কুঁয়রজীত খাটের ওপর শুয়ে পড়ে।

'আজ…' জুগনুর স্বরে বাধার সুর, বিব্রতভাব দেখে, কুঁয়রজীত খুব আদর করে তাকে পাশে শুইয়ে ফেলে, বলে—'একটুও ব্যথা হতে দেবো না…'

জুগনু খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। ভেবে পায় না কি করে তাকে বোঝাবে, আর তক্ষুনি সে তার বুকের ওপর হাত রাখে। আলগোছে পাশ ফিরে জুগনু বাতি নিবিয়ে দেয়, তারপর, ব্লাউজের ভেতর হাত সেঁধিয়ে কাপ দুটি বের করে খাটের তলায় সরিয়ে ফেলে।

কয়েকবার সে কাৎরানি চাপে, কুঁয়রজীতকে থামিয়ে দেয়। অবশেষে চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে আসে, চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্ঘা যেন ফেটে পড়তে চায়। কুঁয়রজীত তিন-চার বার থামে, কিন্তু তারপর তার মাথায় শয়তান চেপে বসে…

'আঃ থামো ত…' সে ধমক দিয়ে ওঠে জুগনুর পায়ের উপর চাপ দিয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে।

'ওহ্ মা…মেরে ফেললে রে…' জুগনু জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, যেন কেউ তাকে মেরে ফেলছে। ছটফট করতে করতে অজ্ঞানের মত হয়ে পড়ে।

'শ্‌শালী!' হাঁফাতে হাঁফাতে কুঁয়রজীত বলে, তাকে ছেড়ে দিয়ে শরীর এলিয়ে বসে পড়ে।

মিনিট কয়েক পরে জুগনুর জ্ঞান ফিরে আসে। যন্ত্রণাটা কিছুটা কম, কিন্তু হাত পা কাঁপতে থাকে। বালিশের তলা থেকে শাড়ি বার করে সে লাইট জ্বালায়। দেখে, ফেটে পড়া ফোড়ার পুঁজে গোটা উরু নিতম্ব মাথামাখি হয়ে আছে, কিছুটা দূরে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে কুঁয়রজীত বসে 'ও…ও…' শব্দে ঢেকুর তুলছে।

'ফেটে গেছে, যাক্‌…' কুঁয়রজীত উঠে দাঁড়ায়, জুগনু হাঁটুর কাছে শাড়ি টেনে দেয়।

'মনে রেখো, এটা চতুর্থবার। কুঁয়রজীত বলে, তারপর ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে যায়।

শাড়ি সরিয়ে জুগনু পুঁজ মুছতে থাকে। সহসা তার মন ভয়ানক ঘাবড়ে ওঠে। খুব আস্তে ফত্তেকে ডাকে। ফত্তে আসে, তখন সে ঘড়া থেকে জল তুলে, কাপড় ভিজিয়ে পুঁজ মুছতে মুছতে বলে 'শোন ফত্তে…ওদিকে বিমলার ঘরে একজন লোক আছে…যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে ওকে ডেকে আন। গায়ে নীল শার্ট, সঙ্গে ব্যাগ আছে, বুঝলি।'

'খদ্দের নাকি?" ফত্তে জিজ্ঞেস করে।

'না, জানাশোনা লোক!' জুগনু বলে, আরেকটু জল দে তো…'

ফত্তে ঘড়া থেকে জল বের করে আনে। তখন আবার জুগনূ কি ভেবে বলে, 'থাকগে···তুই বরং নিজের কাজে যা। সে বলে গেছে, আবার কখনও এলে···' বলতে বলতে ফোড়ার চারপাশে জোরে টেপে, আরও কিছু পুঁজ বেরিয়ে পড়ে; যন্ত্রণায় আবার তার মুখে ঘাম ফুটে ওঠে।

বাজার ॥ রমেশ বক্সী

আমার চেহারা দেখে কেউ অনুমান করতে পারবে না যে আমার খিদে পেয়েছে এবং সকাল থেকে এযাবৎ অভুক্ত আছি। একটা কারণ অবশ্য এই যে, আমি এখন চৌরঙ্গির ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে গাড়ির যাতায়াত দেখছি। কয়েকটা বাস ইতিমধ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, চলে গেছে, কিন্তু আমি যেমনটি দাঁড়িয়েছিলুম সেরকমই দাঁড়িয়ে আছি। বাসস্টপের লাল গোল বোর্ড যদি আমার মাথার ওপর এঁটে দেয়া হয়, তাহলে যে কোনো স্থির পোস্টের মত গোটা দিন একই রকম, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য নিজেকে ভাড়া দিতে পারি। আরেকটা কারণ এও হতে পারে, আমি দামী ভালো পোশাক পরে আছি, চেহারাও মোটামুটি ভদ্রগোছের। সকালে যখন চৌরঙ্গিতে এলুম, আমার সমস্যা ছিল মাত্র তিনটি টাকার। এখনও, ঠিক ঐ সমস্যাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে। সকালে অবশ্য তার মুখ রুদ্ধ ছিল, এখন উন্মুক্ত, ধীরে ধীরে আরও বেশী উন্মুক্ত হয়ে চলেছে। সকালে, বাস থেকে যখন এক লাফে নেবেছিলুম, আমার ডান হাতের মধ্যমায় একটি সোনার সুদৃশ্য সুন্দর আংটি ছিল। প্রথমে ঠিক করেছিলুম এটা বাঁধা দিই। কয়েকটা জায়গায় ঘোরাঘুরি করলুম। বললুম, 'এটা আমার আংটি, বাঁধা রাখতে চাই। যা টাকা দেবেন, তাতেই রাজি।' কেউই আংটিটাকে হাতে তুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করে নি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছে—'মাফ করবেন দাদা। আমি সোনার জিনিস বাঁধা রাখি না।'...একজন স্বর্ণকার প্রায় কসাইয়ের মত, আমার প্রস্তাব শুনে সাংঘাতিকভাবে ধমকে দিল। আরেকজন আমার কথা বেশ মন দিয়ে শোনে। আমি কিছুটা কাকুতি-মিনতি গলায় বলে ফেলি—'এটা রেখে তিন টাকা দিলেও আমার প্রয়োজন মিটবে।' কথা শুনে প্রথমটা সে হেসে ফেলে তারপর চা খেতে খেতে বলে,—'দাদা, জানেন তো, আটকে থাকা টাকা শেষে কয়লার দামে বিকোয়।

আমার এমন চুলকানি হয় নি যার জন্য তিনটে টাকা জোর করে কয়েদখানায় ফেলে দিই।...'

তখন আমি আরও বেশী বিনম্র কণ্ঠে বলি—'তাহলে আপনি এটা কিনে নিন।' সে মৃদু হাসে—'বড্ড সরল হে তুমি... ।'

আমি সেখান থেকে সরে পড়ি। তারপর, এই আংটিটাকে বিক্রি করার চেষ্টা করি, কিন্তু কেউই এটা কেনে না। এই আংটিটা বস্তুত উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে পাওয়া। উনি যখন কোথাও যেতেন, তখন কোঁচার গিঁটে বেঁধে নিতেন যদি কোন কারণে সংকটাবস্থায় পড়েন, তাহলে এই আংটিটা কাজে লাগতে পারে। কিংবা উনি কোন বিবাহ-উৎসবাদিতে উপস্থিত হতেন, এই আংটি তখন আঙুলে শোভা পেত, এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা লক্ষ্য করত তাঁর পাথর সবচেয়ে জ্বলজ্বলে।

ঘোরাঘুরি করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন একটা পানওলাকে অবশেষে জিজ্ঞেস করি—'এই, এটা কিনবে?'

পানওলা আংটিটাকে হাতে তুলে নেয়, গভীরভাবে লক্ষ্য করে পরখ করে। তার হাবভাব, ভঙ্গিমায় মনে হয়, সে নিশ্চয়ই কিনবে। কিছুক্ষণ পরে বলে—'এটা যে খাঁটি দেখছি, পাথরটাও খাঁটি।'...এবং কথা শেষ করার আগেই আংটিটা আমায় ফেরত দিয়ে দেয়। আমি প্রশ্ন করি—'কি হলো? খাঁটিই যখন, কিনছো না কেন? আমার টাকার দরকার বলেই বিক্রি করছি।'

সে পান সাজাতে সাজাতে বলে—'বুঝলেন বাবু, আংটিটা নকল হলে আমি সহজে কিনে নিতাম, বাড়ির বাচ্চাকাচ্চারাও পরতো—। কিন্তু, এই আসল আংটিটা কিনে আমি কি করবো?'

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, সে হাত তুলে থামিয়ে দেয়। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—'এবার আমায় দোকান করতে দিন।'

সেই পানওলার পর আমি আর কাউকে আংটি বিক্রি করার কথা বলি নি। আংটিটাকে খুবই তাচ্ছিল্যভাবে আঙুলে পরে ফেলি। তারপর থেকেই এই বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। ঘরমুখো তরঙ্গায়িত ভিড় বেয়ে চলেছে। একে একে লাল-নীল বাতি জ্বলে উঠছে, নিভছে—কিছু লেখা হচ্ছে মুছে যাচ্ছে। কয়েকটি মেয়ে একা-একা প্যারেড করছে। কয়েকটি ছেলে একা-একা তামাশা দেখছে। প্রতিবার, চৌরঙ্গিতে এলে আমার মনে হয়, এই বুঝি নাটক শুরু হবে, তার আগে ভিড় জমছে। এখনও সেই রকম মনে হতে থাকে। প্রতিটি

পানের দোকানে পানের চেয়ে সন্ততি নিরোধের বস্তু বেশী বিক্রি হয়, সন্ততি নিরোধের ডাক্তারের কাছে লোকেরা জ্বর-কাশির ওষুধ চায়, জ্বর-কাশির ওষুধ দেয়া ছেড়ে কবিরাজ এখন সিগার বিক্রি করে, সিগার বিক্রয়কারক এখন গাঁজা বিক্রি করতে অভ্যস্ত এবং যার কাছে গাঁজার লাইসেন্স আছে, সে এখন চাল ব্ল্যাক করে…

চাল! আমার আবার খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠে। আংটিটাকে আঙুলের ভেতর ঘোরাতে থাকি, এবং অগ্রসরমান এক ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে চোখ চক্‌-চক্‌ করে ওঠে আমার। একবার নিজেকে ভালো করে দেখে নিই, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবনা স্থির করে ফেলি মনে। সেই ভাবনার ফলে খিদে হ্রাস পায়। আমিও সহসা ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

তথাকথিত বাসস্টপ থেকে সরে আমি সামান্য পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। গমনা-গমনরত প্রতিটি পথচারীর প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—কাকে ধরি, কাকে ছাড়ি। একজন প্রায় বাবুগোছের লোক যখন আমার পাশ দিয়ে যায়, মৃদু গলায় আমি বলে উঠি—'প্লীজ স্যার।' সে থেমে পড়ে—'কি?'

'একটা বুশশার্ট কিনবেন? র-সিল্কের, একেবারে এক্সট্রা অর্ডিনারি কালার।'

'কই দেখি?'

'এই যে—আমি পরে আছি, একেবারে নতুন। প্যারিসের টেলারিং করা। পেছন দিক থেকে টি-শার্ট মনে হয়, সামনের দিক থেকে প্লে-বয়। গলা অব্দি বটনিং—ইচ্ছে করলে এর ওপর টাই-ও বাঁধতে পারেন।'

'কিন্তু, তুমি যে পরে আছো।'

'ঠিক পরে নেই, বলতে পারেন শরীরে ঝুলিয়ে রেখেছি। দোকানে দেখে থাকবেন, উইণ্ডোয় বুশশার্ট ঝোলানো থাকে—সেরকম, তফাত এই যে, এই শার্টটি আমার কাঁধে ঝুলে আছে। এমন য়ুনিক শার্ট আপনি সারা কলকাতায় আর দুটো পাবেন না…।'

'ভালোই মনে হচ্ছে। স্মাগল্‌ড নাকি?'

'হুঁ, সেইজন্যই এমন চুপচাপ বিক্রি করছি। শালা, ইণ্ডিয়ান মাল হলে জগুবাজারে দোকান খুলে বসতুম।'…

সে মুগ্ধ চোখে আমার বুশশার্ট ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে। তারপর, প্যাণ্টের পকেটে হাত সেঁধিয়ে ভেতরে ভেতরে টাকা গুণতে থাকে। বস্তুত এই সময় আমার ভয় হয়, পাছে খদ্দেরটা না আবার হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই, সে কিছু বলার আগেই আমি আগ্রহে বলে উঠি, 'মাত্র তিনটাকায় বিক্রি করবো।'

লোকটা কিছু বলতে যাবে, এমন সময় একজন সাহেব, যেতে যেতে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—'তিনটাকায় কি বিক্রি করছো ?'

'সিল্কের এই বুশশার্ট।' আমি বলে উঠি।

'দাও, দশটাকায় আমাকে দাও।' কোটের পকেটে হাত ঢুকোয়।

'পনরো টাকায় আমি কিনতে রাজি।' সামনে রেস্তোরাঁ থেকে একজন বেরিয়ে এসে বলে ওঠে।...

আমার জিভে যেন জাদু এসে ভর করেছে। ডান হাত ওপরে তুলে, বাঁ-হাতে বুশশার্টের একটা অংশ আঙুলে ধরে, আমি বলে উঠি—'র-সিল্কের এই স্মাগলড-বুশশার্ট মাত্র পনরো টাকা।'

'কুড়ি টাকা।' ইতস্তত পথচারীরা আমায় ঘিরে ফেলে।

আমি ঠিক একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকি—'এই বুশশার্ট কুড়ি টাকা।' ভিড়ের মাঝে ফিস্-ফিসানি শোনা যায়। কণ্ঠস্বরের পর্দা তুলে আমি আবার বলি—'মাত্র কুড়ি টাকায় এই বুশশার্ট।'

'ত্রিশ টাকা।' ভিড় থেকে একটা ডাক ভেসে আসে।

'ত্রিশ টাকা।' আমার চোখ-মুখ চক্‌চক্ করে—'ত্রিশ টাকা এক··· ।'

'পঁয়ত্রিশ টাকা।' একটা ভারি কণ্ঠস্বর আমার সামনে এসে থামে। আমি স্থির দাঁড়িয়ে পড়ি। একটু কেশে নিজেকে সামলে নিই, তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর ঠিক রেখে বলতে থাকি—'এই যে বুশশার্ট দেখছেন—এর দাম মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। দু-চারজন এগিয়ে এসে আমার শরীরে ঝোলানো বুশশার্ট হাতে ধরে দেখে। দু-একজন আমার কাছ থেকে ১০/১২ গজ দূরে দাঁড়িয়ে, বুশশার্টটিকে এমন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে যেন কোন দামী পেন্টিংস দেখছে। তাদের মধ্য থেকে একজন কাছে এসে বলে—'চল্লিশ টাকায় কিনলাম।' 'ঠিক আছে।' আমি তাকে বলি—'চল্লিশ এক, চল্লিশ দুই চল্লিশ তি-ন।'···

নিলামী ভিড় ধীরে ধীরে ভেঙে যায়। কেবল, চল্লিশ টাকা হাতে নিয়ে সেই খদ্দেরটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এক এক করে বোতাম খুলে ফেলি, তারপর খুব সাবধানে শরীর থেকে শার্ট নাবিয়ে ঐ খদ্দেরের হাতে তুলে দিই। ভেতরে গেঞ্জি, ঠেলে ওঠা আমার কাঁধ জোড়া, সেই সঙ্গে হাত দুটি অসম্ভব দীর্ঘ ও নগ্ন বোধ হতে থাকে—যেন মাঠের মাঝখানে খড় গাদার পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

আমি পার্ক স্ট্রীটের দিকে এগোতে থাকি। একবার, মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে টাকাটা ভালো করে গুণে ফেলি। তারপর, শিস্ দিতে দিতে, মেজাজে, প্রায় নৃত্য-

ভঙ্গিমায় হেঁটে চলি—কোনো ভালো হোটেলের সন্ধানে—যেখানে মনোমত মদ্য-পান ও ভোজনপর্ব দুটো সমাধা করা চলে।

প্রতিটি রিক্শাওলা আমার দিকে তাকিয়ে ঘন্টি বাজায়। চল্লিশ টাকার গরমে আমার পা-দুটো একটু বেহিসেবী হয়ে পড়ে। শুধু গায়ে গেঞ্জি আছেই বলে আমায় হয়তো বাউণ্ডুলে, এবং হাঁটা-চলা প্রায় মাস্তান গোছের মনে হয়।

'বাবু, দাঁড়ান।' একটা রিক্শাওলা ছুটে এসে আমাকে থামায়। সে দালাল। সামনে এসে দাঁড়িয়ে, প্রথম বাক্য শুরু করে—'বাবুজী, আজকের রাতটা কিন্তু দা-রু-ণ।'

রাতের কথা উল্লেখ করাতে, আমার হাসি পায়। দালালের মুখেও আমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে, হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে—'বাবুজী, একটু পেছন ফিরে দেখুন না।' আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দূরে ল্যাম্পপোস্টের গা-ঘেঁষে দেয়ালে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পরনে নাইলন শাড়ি, শ্যামবর্ণ, শক্তভাবে বাঁধা খোঁপা, পাউডারের ঘন প্রলেপ, চক্‌চকে লিপস্টিক এত উজ্জ্বল যে মেয়েটি ফর্সা হলেও তার রঙ এসে বিঁধত। মেয়েটি আমার দিকে ঘুরে তাকায়। এমন সময় চারটি মেয়ে কোমর বেঁকিয়ে বেশ শালীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আটজন পুরুষের সঙ্গে আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

আমি জানতে চাই—কত?

'আপনার সঙ্গে কিসের দরাদরি,—সারা রাতের জন্য পঞ্চাশ দেবেন।' দালাল বলে।

'উহুঁ। সারা রাতে কার অত ফুরসত থাকে।'

'তাহলে, দু ঘণ্টার জন্য দশ টাকা।'

'না—না।' আমি এগিয়ে যাই।

'দাঁড়ান—দাঁড়ান্ না। আচ্ছা, ন'টাকা দেবেন।'

আমি এগিয়ে যাই

'বেশ তো, সাত দিন।'

কোন কথা না বলে এগিয়ে যাই

'পাঁচ দেবেন?'

এবার আমি থেমে পড়ি। দালালটা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি স্পষ্ট গলায় বলি—'পাঁচও হবে না।'

'তাহলে তিন-এ রফা করে নিন।' সে ফিরে দাঁড়ায়—'আসুন—আসুন

না।' আমি তার পেছন-পেছন যেতে শুরু করি। ল্যাম্পপোস্টের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে, দালাল তার রিকশার দিকে এগিয়ে যায়, মেয়েটি ল্যাম্পপোস্ট থেকে সরে এসে আমার সঙ্গ ধরে।

আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে এসে পড়ি। মেয়েটি আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে। আমার হাত টেনে ও নিজের মুঠোর ভেতর চেপে ধরে।

'কোথায় যাবেন?' ও প্রশ্ন করে।

'দেখি, কোথায় যাওয়া যায়, কোন ফাঁকা জায়গায়।' আমি ওঁর কাঁধের ওপর হাত রাখি। 'ময়দানে কোথাও ফাঁকা থাকে না, কিন্তু সকলেই মনে করে ফাঁকা জায়গা।' ওর এই কথাগুলো আমার ক্ষুধার খুব কাছাকাছি মনে হয়, ফলে আমি ওকে আরও ঘন-অন্তরঙ্গভাবে টেনে ধরি।

'বরং এক ঘণ্টার জন্য কোন জায়গা ভাড়া নিন।' ও বলে ফেলে।

'কোথায় পাওয়া যাবে?' আমি চারদিকে নজর ফেলি।

ওধারে রাস্তার ওপর একটা ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়ে—একদা যাকে ভিক্টোরিয়া বলা হতো, কোন একসময়ে যার নাম ছিল 'শাহী-সওয়ারী।'

'যাবে।' আমি জিজ্ঞেস করি।

গাড়োয়ান স্বীকৃতিসূচক ঘাড় নাড়ায়, বলে—'কিন্তু, ময়দান এলাকার বাইরে যাবো না। ওদিকে রেসকোর্স, এদিকে রেড-রোড অব্দি…ব্যস, এই রাস্তাটুকুতেই বেড়াবো।'

মেয়েটি ভেতরে গিয়ে বসে। আমি জিজ্ঞেস করি—কত?

'পাঁচ রুপেয়া।' গাড়োয়ান চাবুকে হাত দেয়।

'আসুন না।' মেয়েটি আমার হাত ধরে টানে। আমি ভেতরে ঢুকে বসতেই ও দুদিকের পর্দা ফেলে দেয়। ফিটন চলতে শুরু করে, খুব ধীরে মন্থর গতিতে, কখনও বা না-চলার মত। পর্দা থেকে মাঝে-মাঝে আলো ছেঁকে ভেতরে ঢুকে পড়ে, মিলিয়ে যায়। মুখোমুখি সীট, মনে হয়, যেন আমার ঘরে কেউ ঘোড়া জুতে দিয়েছে।

—'তোমার নাম কি?'

—'লক্ষ্মীবাঈ।'

ও তার শরীরের ভার অসচেতনভাবে আমার কাঁধের ওপর রাখে। আমি তারপর জিজ্ঞেস করি—'তুমি আমার নাম জানতে চাইলে না যে?'

ও হেসে ফেলে—'বাবু, আমি কখনও কারো নাম জানতে চাই না। যারা

জানতে চায় তাদের কথা বাদ দিন, আমার বাবার নামটুকুও আমার জানা নেই···।'

আমার কাঁধে ওর কানের ইয়ারিং স্পর্শ করতে থাকে। খুব আলতোভাবে আমি ওটা তুলে ধরতে, ও আরো গলে গিয়ে আমার বুকের ওপর মাথা এলিয়ে দেয়।

চাবুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান বলে ওঠে—'মাল-টালও পাওয়া যায় বাবু।'

ফিটনওলা ঘোড়া হাঁকালে কি হবে, দূরদর্শীও বটে।

'সাত টাকা—এক বোতল। দেবো নাকি বাবু?' ঘোড়ার লাগাম টানতে-টানতে বলে।

'বেশ, দাও তাহলে—' বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরিয়া থেমে পড়ে। গাড়োয়ান একটু নিচে ঝুঁকে, ঘোড়ার জন্য ঘাস রাখা থাকে, সেখান থেকে একটা বোতল বার করে দেয়।

ফিটন এগিয়ে চলে। রাস্তার উজ্জ্বল আলো পর্দা ছেঁকে ভেতরে আসে। চুমুক দিতেই সাংঘাতিক কটু বোধ হয়, বড্ড ঝাঁঝ। আমার চোখ পেছন দিকে টানতে থাকে। বোতলে আবার চুমুক দিতেই মদ চল্‌কে পড়ে হাতে।

—'লক্ষ্মী, তুমি খাও ভাই।'

—'না।'

—'খাও না।'

আমি এক আঁজলা মদ ওর সিঁথিতে ফেলে দিই। লক্ষ্মী হেসে ওঠে। 'মাইরি লক্ষ্মী, এমন ঝাঁঝালো মদ আমি কখনও খাই নি।···'

লক্ষ্মীবাঈ হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে আমার শরীরের ওপর গলে পড়ে। বোতল শূন্য হলে, রেড রোড়ের উপর ছুঁড়ে ফেলি।

'লক্ষ্মী, দেখি তোমার হাত।' আমার আঙুল থেকে আংটি খুলে লক্ষ্মীবাঈয়ের আঙুলে পরিয়ে দিই। লক্ষ্মী এবার আরো জোরে, উত্তেজিত হেসে ওঠে। আমার গায়ে শুধু মাত্র গেঞ্জি; অথচ মনে হতে থাকে আমি বুশশার্ট পরে আছি। বসে আছি ফিটনের ভেতর, অথচ মনে হয় শুয়ে আছি আমার ঘরে···

—'খাবার। লক্ষ্মী, আমি কিছু খাবো।' জড়িয়ে আসা চোখে টেনে-টেনে আমি ওকে বলি।

—'এখানে খাবার মিলবে না, বাবু···।' গাড়োয়ান বলে।

—'যা পাওয়া যায়, নিয়ে এসো।' চেঁচিয়ে উঠি আমি।

কিছুক্ষণ পরে গাড়োয়ান আমার সম্মুখে খাবার এনে হাজির করে—কয়েকটা কচুরী, ছোলার তরকারী, ভাত। দেখামাত্রই মনে হয় আমার সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে।

'আমার পেট ভরা বাবু।' লক্ষ্মীবাঈ এখন নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবত সময় শেষ হয়ে এসেছে, অথবা চাবি খালি হয়ে পড়েছে।…

'খাবার দাম দশ টাকা।' গাড়োয়ানের হাত আমার সামনে প্রসারিত।

'মাত্তর দশ টাকা। এই নাও—' পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলি।

চোখ রগড়ে দেখতে পাই—টাকা নিয়ে লক্ষ্মীবাঈ ময়দানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। গাড়োয়ান একবার সেলাম জানায়, তারপর অন্য খদ্দের ধরতে চলে যায়।

আমার পা জোড়া সাংঘাতিকভাবে টলতে থাকে, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। চার পা এগিয়ে যাবার পর, আর সাহস হয় না। ময়দানের একপ্রান্তে সরে এসে শুয়ে পড়ি। যেন কেউ বাতাসে কাঠের তক্তা ভাসিয়ে দিয়েছে, আমি তার ওপর শুয়ে ভেসে চলেছি। ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস গায়ে এসে লাগছে—বুকের আড়াআড়ি হাত দুটি বেঁধে ফেলি। ভেসে বেড়ানো তক্তা অবশেষে বিজয়স্তম্ভে গিয়ে ধাক্কা মারে—আমার চোখ খুলে যায়, দেখতে পাই—পুলিশ আমার কোমরে রুল দিয়ে সজোরে গুঁতোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসি।

—'তোর বাপের মসনদ এটা।' সে ধমক দেয়, তারপর আবার রুল তুলে ধরে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সব কটা টাকা ওর হাতে তুলি ধরে দিই।

টাকা গুণতে থাকে—'পনরো। ঠিক আছে। শুয়ে থাকগে।'…

গমনরত পুলিশের পদশব্দ অনেকদূর অব্দি শোনা যেতে থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ফিটন গাড়ি চলতে থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ হাসতে থাকে…এধরনের কিছু একটা ঘটতে থাকে, তারপর বিজয়স্তম্ভ আমার পাশে শুয়ে পড়ে।

চোখ খুলতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি। বিজয়স্তম্ভের ওপর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাতেই আমি চমকে উঠি। একি? আংটিটা আমার হাতে ঠেকেছে। কখন যে লক্ষ্মীবাঈ আমার পকেটে গলিয়ে দিয়েছিল, জানি না।

দুঃস্বপ্ন ॥ দুধনাথ সিংহ

ওদের ওখানেই—পার্কে—রেখে চলে এসেছি।

এবং এখানে এই চুতিয়ামিতে আটকা পড়েছি। তাছাড়া কী? ভাখো না, এ শালা আবার আমার পোঁদে লেগেছে। অন্যের মাথায় কখন কী ঘুরপাক খায়—এ বানচোতরা তা বুঝতেই চায় না। ব্যস ফালতু গ্যাঁজাবার জন্যেই কথার ঘানিতে জুড়ে দেয়। মরস্থম, মূল্যবৃদ্ধি অথবা ট্রাম-বাসের ভিরমি-আসা ঠেলাঠেলি অথবা মিঃ শেঠের প্রেম-প্রসঙ্গ অথবা কাপড়-চোপড়ের আকাশমুখো ছুটতে থাকা দামের ব্যাপারে 'মতামত' চাইতে শুরু করে। আচ্ছা, এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ একটা মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে?

…এখন আমি ওকে তাড়াতেও পারছি না। এমন কী খিস্তি-খেউড় কিংবা মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বার করা তো দূরের কথা, ওর সামনে হাত জোড় করে একটা কৃত্রিম সভ্যতা ফুটিয়ে ক্ষমা চাইতেও পারছি না। তার মানে, অবশ্য, এই নয় যে এ ধরনের কৃত্রিমতা আমার সামর্থ্যের বাইরে। আমি যা হোক কিছু একটা করতেও পারতাম, কিন্তু, ও যে থেকে থেকে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। আর আমি টগবগ করে ফুটেই যাচ্ছি শুধু। ওদিকে সময়, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে, এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে… !

এবং বারংবার আমার মনে হচ্ছে—ওখানে অতি অবশ্যই কিছু একটা ঘটে চলেছে। অথবা এও হতে পারে যে ওরা ওদের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে এবং রোজকার মতো, এতক্ষণে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। আমি ওদের বলে এসেছি—ফিরতি পথে অবশ্যই দেখা করবো। …আর যদি সম্ভব হয় তো একবার ওদের …সে কথাও ভেবেছিলাম।

কিন্তু ও? গত একটা ঘণ্টা ধরে ওর কথা আমি শুনেই আসছি। আর ও আমাকে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে শুধু ঘুরিয়েই আনছে, কিনতে দিচ্ছে না

কিছু। আমার মনে নানা ধরনের দুশ্চিন্তা উঁকি মারছে। এমন কী, এখন তো মনের ভাব এই, যে, কেনা-কাটার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি এবং কখনো ওর এবং কখনো ওদের সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে সারা হয়ে যাচ্ছি। হারামিগুলো যখন, মিছিমিছি, আমার মনটাকে নিজেদের দিকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন ঠিক মনে হয়—না, কিচ্ছু হবে না। আমি বলে দিচ্ছি—আমার মধ্যে পাকা দুষ্টু বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, এখনো কোনো ন্যায্য কারণের জন্যেও কারুর অপমান করতে পারি না আমি। কতবার সে সব মুহূর্তগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছো, যখন আমি সত্যের পক্ষপাতী হয়েও উল্টো পরাজিত এবং অপমানিত হয়েছি। কিন্তু, আমি কী করবো বলতে পারো! একটা বিচিত্র ধরনের সঙ্কোচ আমাকে এক নিমেষের জন্যেও রেহাই দেয় না। নিজের এ না-পুরুষত্বের দরুনই বিপদের অন্ত নেই আমার। এবং এখনো ভুগছি।

ও যখন আমাকে মাত্রা ছাড়িয়ে বিরক্ত করতে শুরু করলো, বুঝতে বাকী রইলো না—নিশ্চয়ই এ একটি দালাল। দালালদের মিষ্টি বুলি বেশ ভালো করেই চিনি আমি। কিন্তু, জীবনে এই প্রথম বারই দেখলাম—কাপড়ের দোকানের দালালরা বেশ্যাখানার দালালদের চেয়েও হাড়ে হাড়ে হারামজাদা। ইস, একেকটি কেমন তেলানো কথা বেরুচ্ছে—কত সহজ সরলভাবে, যেন মুখস্থ করা বুলি! শুধু ভাষার দৃষ্টিতে একটু দুর্বল, এই যা। কীভাবে যে ও ধরে ফেললো যে আমি অন্য ভাষা-ভাষী—আশ্চর্য!…স্বীকার করতে দোষ নেই—ওর এ আঠালো ভাবটুকু শ্রীমুখ নিঃসৃত 'বুলি' শুনেই ধরে ফেলেছিলাম আমি!

তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো, প্রাদেশিকতায় আমি বিশ্বাসী নই। কিন্তু এখানে, কলকাতায় যখন কোনো বাঙালী হিন্দী বলার চেষ্টা করে—আমার ঘাড়ের পেছনের দিককার কোনো ডানাওয়ালা পোকা পিলপিল করে মাথায় চড়তে শুরু করে। এটা আমার দুর্বলতাও হতে পারে।…কিন্তু, বর্তমানে এটাই সত্য—এ লোকটার মধ্যে একটা শক্ত সমর্থ ঘাতকের সত্তা ফুটে উঠতে দেখতে পাচ্ছি এবং এর কথার মধ্যে সেই সুন্দর মেয়েটির থেঁতলে যাওয়া লাশটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—যাকে আমি একবার রাস্তায় দেখেছিলাম।

আমি টগবগ করে ফুটছি। আমার পরম অনৈতিক শাস্তিটুকু বিস্মিত হলো কেন? এই জন্যেই কী, যে, আমার মনটা এখনো 'ওদের' দিকেই লেগে রয়েছে? অথবা

'এই লোকটা' আমাকে ওর নিজের দিকে লাগিয়ে রাখছে? না, আর ভাবতে সময় দিচ্ছে না। আসলে তাড়াতাড়ি কেনা-কাটা সেরে তোমার কাছে আসতে চেয়েছিলাম আমি। মাত্র কয়েক মুঠো সময়ই তো আমরা পাই!...তারপর বাড়ি ফিরতাম এবং হেলান দিয়ে...! আমি জানি, হেলান দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম এবং নিজের ভেতরকার সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার সামনে উলঙ্গ হয়ে একটা গাঢ় ঘুম মুড়ি দিতাম। এমনিতে আমি প্রায় কথাই সিরিয়াসলি নিই না। এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায়ও আমার মধ্যে স্বার্থভাব জেগে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় না—না আমি উত্তেজিত হই, না হই কারো নৈতিক পক্ষ সমর্থক।...অবশ্য, কোনো এক সময় এসব করতাম—একজন মিশনারির মতো।

এখন তুমি আমার প্রতি অতি মাত্রায় ভাবপ্রবণ। কিন্তু, একদিন মানতে বাধ্য হবে, যে, অতীতের প্রতি সততা দেখানো আমাদের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়।...যাক গে। এখন তো আমি ওদের নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি। অল্প করে বলা সম্ভব হচ্ছে না যে, ওদের আমি চিনি। সত্য, ব্যস, এই যে আমি ওদের দেখেছি মাত্র।

ওখানে, মানে সেই পার্কটার সামনের কুঠুরিটায়, একটানা বেশ কয়েক বছর ধরে আছি। সকালে, তাড়াতাড়িই, আমার ঘুম ভাঙে এবং প্রায়ই চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। এ হেতুটা কম, যে, সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া আমার ভালো লাগে অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে আমি অতি সতর্ক, এই কারণটাই প্রবল যে, ঘুম ভাঙবার পর আমার মগজে অন্য কিছুই ঢোকে না। মনে হতে থাকে—আমি যেন একটা অভাবিত বিপদে পড়েছি...আবার গোটা শহরটা যেন রাতারাতি ভূমধ্যরেখার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অথবা পার্ক সার্কাসের কাছে-পিঠে কোথাও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে...! অর্থাৎ একটা নিঃসঙ্গতা এবং নিজেকে গুটিয়ে ফেলবার চিন্তা!...আমি আশ্বস্ত হবার জন্যেই ওখানে এসে দাঁড়াই। ঠিক তখুনি ওরা দেখা দেয়। পার্কের কোণটায় যেখানে ফেন্‌সটা একটু উঁচু, একটা ঝাণ্ডা ভোরের ছেলেমানুষি হাওয়ায় পত্‌পত্ করে উড়তে থাকে। ওরা তখন স্যালুট করে কিংবা প্যারেড। একটা লোক প্যারেড করতে-থাকা অত-গুলো ছেলের মধ্যে একটা ছেলের পাছায় ঠাস করে চাপড় বসিয়ে দেয়। তার কারণ কী, তা তুমি এখন বুঝবে না। ওটা ওদের প্যারেড কিংবা সংগঠনের আওতায় পড়ে না।...যাক গে, খানিকটা দূরে দাঁড়ানো দুজন লোক—বোধ হয় ওদের নেতৃস্থানীয়—এক মুহূর্তের জন্যে এক ছিটে মুচকি হাসি ছড়িয়ে দেয়।

তারপর চোখের ইশারায় কী যেন বলা-কওয়া করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ···আমি আমার কুঠুরিতে ফিরে আসি। তারপর কোনো রেস্তোরাঁ অথবা বড়-বাজার ভবানীপুর, পার্কসার্কাস অথবা রাসবিহারী এভিন্যুর ফুটপাথে দল বেঁধে হাঁটতে দেখি ওদের। ওরা যে-কেউ হতে পারে : বাধ্যবাধকতা নেই, যে, ওদের কোনো বিশেষ পতাকার নিচেই দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটা নিরাকার সমরূপতা আছে। আমার প্রায়ই মনে হয়—আমি যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলেছি··· !

আমার বারান্দা থেকে—হয়তো—সেই পার্কেই অথবা কোথাও কিংবা ফুটপাথে গড়িয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে অথচ অনায়াসে পড়ে আছি আমরা। অথবা অন্য কোথাও, কোনো রেস্তোরাঁয়—ওদের উত্তেজিত, ঘামে চকচকে শ্যামলা মুখগুলো আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলে। অন্য টেবিল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনে কোনো আটপৌরে মন্তব্য ছুঁড়ে বসি··· !

এখন ওসব ভালো করে মনে করতে পারছি না। চেষ্টা করলে, আজকাল, এই ধরনেরই কিছু সম্ভাবনার দেখা মেলে। পরিচিতির একটা প্রচ্ছন্ন কুয়াশাই শুধু এখানে ওখানে এবং আমার চেহারার সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে।

একদিন, বোধহয়, ওরা আমার 'মতামত' চেয়েছিল—ওরা কী সিরিয়াসলি এসব ভাবে ? আমার প্রশ্ন। দেখলাম—সবাই হাসছে। ওদের দেখাদেখি আমিও হাসছি।

—'আপনি তো মশাই, এত নিশ্চিন্ত—যেন কিছুই হবে না। কিছু একটা হলে, মজা হতো !···রক্তে একটু আগুন জ্বলুক···!'

কথা শুনে ভাবলাম—এরা বোর হচ্ছে। এদের করনীয় কোনো কাজ-কর্ম নেই। নিছক চিত্ত-বিনোদন করে চলেছে। কিন্তু এ চিত্ত-বিনোদনকে আবার চরম সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবে না তো ? বাস্তবিকই, আমার তো মনে হয়—বিশ্বব্যাপী অরাজকতার পেছনে এই অস্থিরতাই কাজ করছে !···'আমাদের কোনো মৌলিক কার্যক্রম দিন, আমরা আপনার গলা টেপা ছেড়ে দেবো !' (···কলেজে যাবার সময় আমি পার্ক সার্কাসের ট্রাম থেকে মাঝপথেই নেমে পড়ি। স্যানিটোরিয়ামে গফ্‌ফার খাঁ আমার সঙ্গে ছিলেন। ওখানেও সেই কথা !···'মশাই, আমরা কী শুধু বসে বসে দেখবো নাকি ? আমাদের রক্ত গরম হয় না বুঝি ?'

গফ্‌ফার খাঁ ওদের শাসিয়ে চুপ করাতে চান। আমাকে চলে যেতে বলেন। ওরা কিন্তু একই ভাবে হাসতে থাকে···!)

আমি সত্য বলছি : ওরা কফি 'সিপ' করে এবং কাফে-ডি-মোনিকোর জানালা গলিয়ে টার্মিনাসের ভিড়ের ওপর দৃষ্টি ছুঁড়তে থাকে। চিত্ত-বিনোদনের নামে ওদের সামনে থাকে—চিকন-এর পাঞ্জাবি, জুতোর দোকান, বোতল ভর্তি শুঁড়িখানা, রেডিওগ্রামের সেট এবং···জোড়াতালি লাগানো অগুণাত পাকস্থলী··· !

আমি শুধু আশ্চর্যই হই। ওদের তর সয় না। আচ্ছা, ওরা কী ওদের রক্ত গরম করতে চায়—না অন্য কিছু ? ওরা কত সততা নিয়ে এবং স্বাভাবিকভাবে এসব কথা বলে ফেলে ! ওরা কত গাম্ভীর্যসহ এবং নিরর্থকভাবে এতে আস্থা রাখে !

এটা কোন বছর ? সে যা-ই হোক না কেন, কিচ্ছু যায় আসে না। আমি সব সময় ভেবে আসছি, যে, ওদের মুখগুলো উত্তেজনাবশত ঝলমলে থাকা উচিত। পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে এবং আমাদের জন্যে অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।

—'ঠিকই ! ওদের মধ্য থেকে একজন প্রায় চেঁচিয়েই বলে ওঠে : 'আমরা তো তা-ই বলি। নইলে, আমাদের আর জাহান্নমে যাওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

ওরা হঠাৎ ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে। উল্লিখিত বক্তাটি কিন্তু একনাগাড়ে বলেই চলেছে। ওর শক্তমুঠোর ঘুষিতে টেবিলের ওপর রাখা 'ক্রকারী' ঝনঝনিয়ে উঠতেই সহসা আমার সংবিৎ ফিরে আসে।···'না না, আমার বলার অর্থ কিন্তু তা মোটেই নয়।'

কিন্তু, ওরা কারো কথার অর্থ বোঝার দরকারই মনে করে না। কত বার এসব ঘটতে দেখা গেছে !···ওরা নম্রতাপূর্বক নমস্কার জানিয়ে নিচে নেমে যায় এবং ভিড়ের মধ্যে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বাসের 'কিউ'-তে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। অথবা হিপ-পকেট থেকে লাইটার বার করে নিজেদের মধ্যে সিগারেট ধরাধরি করতে-করতে যার যার মুখখানা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এনে চোখের মধ্যে গভীরভাবে উঁকি মারে—যেন একটা ভয়ঙ্কর রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। কিন্তু, ব্যস, ওই পর্যন্তই !

···তারপর ওদের রুচির ভাগ-বাঁটরা শুরু হয়। ওরা কোনো ভূমিগত সংগঠনীর সদস্য তো আর নয়, যে, তীরের মতো ভো করে একই দিকে ছুটবে ! ···ওরা প্রায়ই ছড়িয়ে পড়ে এবং নিঃসঙ্গ হতেই ওদের চোখে-মুখে একটা ক্লান্তি এবং সিদ্ধান্তহীনতা ছেয়ে যায়। তারপর, চটপট করে ভরা পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিরুনি বার করে চুলের টেরি ঠিক করতে শুরু করে এবং আত্মগত হয়ে যায়।

তখন হয়তো ওরা আত্ম-পরিচয় পায়। ওদের তখন 'অন্য কিছু'র প্রয়োজন দেখা দেয়। ওদের বাস্তব রূপ এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক প্রতি প্রত্যেকের সামনে ছড়িয়ে পড়ে। আর, সেই মুহূর্তে ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়ায়—দুর্ভাগ্যবশত কোনো মেয়ে না জুটলে, অগত্যা, মাঝবয়েসী মহিলাটির দিকে তাকাতে-তাকাতেই...!

তুমি বলবে—আমি এত উদ্বিগ্ন কেন? আসলে এসব একটু চিন্তার কথাই বটে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—আমি আবার ওদের দলে ভিড়ে যাবো না তো? ...হ্যাঁ, আমি মনোযোগসহ কাপড়গুলোও দেখছি না। না, এর কারণ এটাও হতে পারে, যে, আমি 'এ লোকটার' কথায় মোটেই কান দিতে চাই না। অথচ, ও আমাকে ছাড়তেই চাইছে না। আমিও গোঁ ধরে বসেছি—আমি যদি একে বোর না করে ছাড়ি, আমার নাম মিথ্যে।

...ভেতরে ঢুকতেই ও আমাকে দোকানেই পাকড়াও করেছে। আমি কয়েকখানা তোয়ালে বার করিয়ে দেখছি, ও এসে অমনি আমার পাশের বেঞ্চিতে বসে পড়লো এবং তোয়ালেগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে পছন্দ করতে শুরু করলো। আমি ভেবেছিলাম—হয়তো কোনো খদ্দের-টদ্দের হবে। তখুনি ও বলে উঠলো: 'এ ভালো নেঁহি? নেঁহি? হ্যাঁ ভালো!'

তারপর আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে, হয়তো হেসে উঠলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে—ওর হাসি-ছায়ার আভাস পেতেই আমিও হেসে ফেলেছিলাম এবং এ প্রথম কথাটির পানসেমি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি এর কথায় সায় দিয়েছিলাম। ব্যস, আর কী কথা আছে! অমনি ওর কথার ফুলঝুরি ফুটতে শুরু করলো। আর আমি খচে গিয়ে তখন থেকেই...। হারামি কোথাকার! কী ভাবে যে এরা টের পায়? নিশ্চয়ই ও আমাকে শাঁসালো শিকার ভেবে ফেলেছে। ঠকাবার জন্যে কী-কীই না কেরামতি দেখাচ্ছে! যেই ওর কাজ হাসিল হবে, অমনি, মাঝপথেই ছেড়ে কেটে পড়বে। তারপর কোনো পানের দোকান অথবা রাস্তার রেলিংয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে এবং যাদের ও মনে মনে ঘেন্না করে, তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করবে... !

চাঁদমণি, আমি সব বুঝছি—তুমি যে কিসের জন্যে আমার দরকারী জিনিস-পত্রের সম্বন্ধে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছো! তুমি হাজার বার বললেও আমি ওদিকে, 'ওই কোণের দোকানটায়, কিছুতেই যাচ্ছি না।...'ওখানে সব জিনিস ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়! অন্য সব তো ফর শো।'...তুমি ওই দোকানের দালাল। তুমি যে একটার পর একটা কাপড় বার করিয়ে দেখছো, দোকানদারের বলা দাম শুনে

হেসে মিলের পাইকিরি দর, সেল ট্যাক্স্ এবং ফাঁকি—এ সবের উল্লেখ করে যাচ্ছো তাতে কিন্তু আমি তোমার মায়া ফাঁদে পা দিচ্ছি নে,বাপু তুমি আমাকে টুপি পরাতে পারবে না। তুমি দোকান থেকে বেরিয়েই এ মুনাফাখোরদের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে দিচ্ছো—'হারামি, বোকাচণ্ডী, গুণ্ডা…এদের চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করতে হয়। দেখে নেবেন, একদিন এসব হবেই। এরা সব বলির পাঁঠা। অথচ, মজা করে সব খেয়ে চলেছে! এরা যে দিন দিন মোটা হয়ে চলেছে এবং বিরাট বিরাট মাড়িগুলো খুলে হাই তুলছে, জনতা একদিন বন্দুকের কুঁদো ঢুকিয়ে এসব মুখ চিরে ফেলবে…।' …তুমি তোমার এ ভবিষ্যদ্বাণী নিজের ট্যাঁকেই গুঁজে রাখো, বাপু! এসব অর্থহীন কথা দিয়ে তুমি আমাকে তো দূরের কথা, এ দেশের কোনো লোককেই প্রভাবিত করতে পারবে না! তোমার মন্তব্য আমার সামনেই রয়েছে। তোমার মতো ঢের ঢের পেশাদার দেখেছি! তুমি যে বিপ্লবের কথা বলছো, তার বাস্তব রূপ আমি এখুনি, ওই পার্কে প্রত্যক্ষ করে এসেছি… !

ওর খিক্‌খিকানি শুনলেই আমার পিত্তি জ্বলে ওঠে! ঘাড় ঘুরিয়ে এর দিকে চাইতে শুরু করি। লোকটা হতপ্রভ হয়ে যায় এবং সেই পুরনো আঠালো ভঙ্গীতে মাফ চাইতে শুরু করে : 'আমাকে মাফী দিজিয়ে। ক্ষমা করিয়ে!'

এই প্রথমবারই বুঝি আমি ওকে ভালো করে দেখলাম। রোগা-পটকা। নরকঙ্কাল। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। অথচ জামা-কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দাড়ি কামানো। মাথায় টাক। হলদে এবং শিরা জাগানো হাতের শুকনো কঞ্চির মতো আঙুলগুলো যেন কথা কইছে!

আমার কিন্তু সদা সর্বক্ষণ মনে হয় : মানুষের আঙুল তার চোখ-মুখের চেয়েও বেশী ভাবপ্রবণ এবং সত্য বই মিথ্যা বলে না!…

আমার কটমট করে তাকাতেই ওর মুখখানা করুণ হয়ে উঠেছে, যা ও প্রাণপণ চেষ্টায় শুকনো হাসির ঘনিষ্ঠ ছোঁয়ায় ঢেকে ফেলতে চাইছে।…এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হালকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব ঠিক ঠিক করে ওঠে। কিন্তু, এটা আমার দুর্বল মুহূর্ত। সুতরাং, আত্মসমর্পণ করা উচিত হবে না।…আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে : 'তুমি যাবে কিনা? আমার কিচ্ছু চাই না। যাবে, না আমি…?'

আমি ঘেমে উঠেছি। ভ্যাপসা গরম। এরকমটা প্রায়ই থাকে। এখানে, বাইরে থেকে বাড়ি এলে মনে হয়—যেন, কোনো আগুনের চুল্লীর কাছে আরেকটু সরে এলাম!…

আমার সে সর্বনাশী এবং সর্বব্যাপী সংকোচটুকু আমি ঝেঁটিয়ে আলাদা করে দিয়েছি। এর যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না, যে, আমি জঘন্য ব্যবহারও করতে পারি! 'লোকটা'র মুখখানা হ্যাঁ হয়েই আছে এবং আমার থেকে দু পা দূরে ও এখনো ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন, এক্ষুনি আমি ছুরি বসাতে যাচ্ছি।

দু-চারজন লোক আশে-পাশে জড়ো হয়ে গেছে এবং কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। অথচ এখানে ঘটতে পারা যে কোনো কাণ্ড থেকে তটস্থ হয়ে ও এদিকে-সেদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে চলেছে। ওর মনে আর কোনো আশাই অবশিষ্ট নেই। ওর চোখে-মুখে 'সময় নষ্ট' হবার রাগ এবং 'কিছু করতে না পারা'র হতাশা চিকচিক করছে, যা ও জামার নিচ পকেটে পোরা ধুতির খুঁট বার করে বারংবার মুছে চলেছে…!

আমি হাঁটা দিয়েছি। কিন্তু, মনে হচ্ছে, যেন, ও-ও আমার পেছনে-পেছনে আসছে। আমাদের ছায়া দুটো পরস্পর পরস্পরকে কাটছে।…'শুনুন মশাই, শুনুন না!'

পেছন দিক থেকে হঠাৎ ও আমার কাঁধ ছোঁয়। আমি ঘুরে দাঁড়াই।… 'আপ উস দুকান পর জাইয়ে তো। না, আমি মিথ্যে বলি না!'

ও আমার মুখের দিকে তাকায়।…'না না, আমি সে সব কিছু নই—আপনি যা…? আমি তো…আমি বলবো। আগে আপনি যান তো…হাম জায়েগা নেহীঁ। বিশ্বাস করুন। হাম ওই খান মে প্রতীক্ষা করেগা…।' ও সামনের দিককার থামের দিকে ইঙ্গিত করে।

হয়তো এটা ওর শেষ প্রচেষ্টা। ও আরো করুণ হয়ে উঠেছে। আমার দৃষ্টি এখন ওর শুকনো কঞ্চিগুলোর ওপর—যা চট্‌চট্‌ করে ভাঙতে ভাঙতে কী যেন বলছে।…ও কী আমাকে খুশি করে ফেলেছে, না, আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়েছে? না কী কোথাও কোনো গভীরে একটা কথা মাথা চাড়া দিয়েছে যে, যদি একটু সস্তায় কাপড় পাওয়া যায় তো দোষের কী?

আমি ওকে ওখানে ছেড়ে দোকানে ঢুকলাম। তারপর একবার কাপড় বার করাতে করাতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে নিলাম। থামের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি টানছে ও। নিভে গেছে। ইচ্ছে করেও খুশি হতে পারি না। বরং হাল্‌কা একটু কষ্ট…!

দোকানদারকে আমার মুখের দিকে মনোযোগসহ তাকাতে দেখে আমি হাতের চেটোয় মুখ ঢাকি। সন্ধে-বাতি জ্বলতে-না-জ্বলতেই হাই! আমার হাঁটু টনটন করছে এবং ঘুম পাচ্ছে। সকাল থেকেই আজ—প্রথমে ওখানে, তারপর গফ্‌ফার খাঁর ওখানে, তারপর খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোতে অথবা বাসের জানালায় মাথা ঠেকিয়ে…। ইদানীং আমি দিনভোর ঘুমোই—তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে…ট্রামে বাসে পথে ফুটপাথে অথবা হোমিওপ্যাথ-এর দোকানে…অথবা ওখানে ওদের সঙ্গে। সেই পার্কটায়। অথবা আমার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে।…ওরা প্র্যাকটিস করছিলো। নকল টার্গেট বানিয়ে রেখেছিলো এবং তার ওপর গুলি ছুঁড়ছিলো। …আচ্ছা, এখন আমি এর কি করি—পথ চলতে গিয়েও এ ধরনের দৃশ্য দেখতে অথবা আওয়াজ শুনতে পাই? এমন কী, আজকে, গফ্‌ফার খাঁর বাড়ির ভেতরে পর্যন্ত। যেই আমি চমকে উঠেছি—উনি অমনি একটা এলাচি ধরিয়ে দিলেন! তাহলে কী ওটা বাজির শব্দ? দেওয়ালি এসে গেছে।…আর ওরা পার্কে বের হয়ে একটু ফুর্তি করছে!

তুমি আবার বলে বসবে যে, আজকাল আমি ভীষণ ঘোরালো কথা বলি। আশ্চর্য! তুমি বুঝি আজকালকার মানুষের জীবনে সরল-সোজা কথার প্রত্যাশা করো? নিছক গল্প-কাহিনীর মতো? তাহলে কিন্তু তোমাকে কোনো গঙ্গাযাত্রী বুড়োর বুকের কাছে শোয়া উচিত ছিল—বুঝলে? সেই তোমাকে নরম সরল এবং খুশি উপচানো ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো।…তুমি জানো না যে, প্র্যাকটিস-করতে-থাকা ওই লোকগুলো ভীষণ নিরীহ, অন্তর্মুখ এবং ভয়ঙ্কর…!

তখন কিন্তু আমার, যখন আমি ওদের ছেড়ে চলে এসেছি, সব কিছুই যেন বিশুদ্ধ ফচকেমি মনে হচ্ছিলো। ওরা বন্দোবস্ত করছিলো। সেই নতুন রংরুটটার পরীক্ষা নিতে চাইছিলো। ওরা তাকে উত্তেজিত করছিলো। সে ওদের কথায় সায় টানতে থাকতো, কিন্তু তার পরক্ষণেই আবার তার গালে কালশিটে পড়ে যেতো। কিন্তু এটা হয়তো তার জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সে তা অস্বীকার করতে পারতো না। তাই ওরা ঠিক করলো, যে, অপেক্ষাকৃত কোনো নির্জন রাস্তায় এর 'প্রয়োগ' করে দেখবে। ওরা কয়েকটা গলি এবং পার্কের নাম বলে দিলো। ওরা শুধু ওর সাহস দেখতে চেয়েছিলো। তারপর ওরা অনর্গল কথা বলে চললো। নিজেদের সেই সব মতলবগুলোর কথা স্মরণ করে করে ওরা হাসতে থাকলো।

অজুহাত খাড়া করবার জন্যে ওরা একটা বিশেষ শব্দ—নিছক অর্থহীন শব্দ—

ব্যবহার করে 'মুসলঘটে'।…কিন্তু এ দিয়ে ওরা কিছুই ব্যক্ত করতে পারে না। এ ব্যাপারে ওরা কোনো 'দুশমন'কে ছাড়বে না। চোখ বুজে লাইন-কে লাইন সাবাড় করে দেবে। ওদের সে সব দোকান এবং জিনিসগুলোর কথা ভালোভাবেই মনে আছে যা ওরা লুঠ করতে চেয়েছিলো… !

এখন, কথা প্রসঙ্গে, তোমাকে আমার নিজের একটা বিশেষ পাগলামির কথা বলছি।…ইদানীং, বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তায় চলতে চলতে প্রায়ই গান্ধীর নরকঙ্কালটা আমার চোখে পড়ছে। গর্তে ঢোকা চোখ…কানা, লাঠি বুলিয়ে রাস্তা খুঁজে বেড়ানো। পাঁজরা সর্বস্ব নরকঙ্কাল…খোলা গুহার মতো মুখ… একেবারে ন্যাংটো, আর চামড়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে ! তারপর হাওয়ায় উড়তে থাকা ফেনের বুদ্‌বুদের মতো সবকিছু ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আমি হতভম্বের মতো চেয়ে চেয়ে শুধু দেখি !…

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না—তাই না ? কারুর হবার নয়। আমিও বিশ্বাস করতে চাই না এবং এসব কথা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যেতে অথবা এড়িয়ে যেতে চাই… !

কিন্তু… !

আমি ওদের কাছে কী যেন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বোধ হয় 'দুশমন'দের সম্পর্কে। ওরা ভীষণ জোরে হোহো করে হেসে উঠেছিলো। আমার জিজ্ঞাসা ব্যর্থ। ওরা হয়তো আমার অপমান করছিলো। আসলে আমার কী-ই বা দরকার পড়েছিলো ? ওরাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছিলো। ওদের বেশ কিছু নতুন নতুন স্লোগান ছিল, ভীষণ আকর্ষণধর্মী। তর্ক করতে ওরা ওস্তাদ। তাই ওদের যুক্তিতর্কগুলোকে নাকোচ করে দিতে পারিনি। মানবতার দোহাই দেওয়া মানে সরাসরি নিজেরই উপহাস করানো হতো।

ওদের মধ্যে থেকে একজন আর একজনের কথায় ফোড়ন কেটে বলেছিলো : 'চল শ্লা, বড়ো এসেছে বিবেকানন্দের লেজ !' …আমার বুঝতে বাকী রইলো না, তীরটা কাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো। তক্ষুনি আমার সংবিৎ ফিরলো। অমনি হাঁটা দিলাম। ওদের মধ্যে তখন এত উত্তেজনা, যে, আমার চলে আসায় ওরা আমাকে ঘেন্নামাখা দৃষ্টিতে দেখলোও না। তবে, হাসছিলো কিন্তু ওরা। ওদের বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। ওরা যে কোনো শব্দই মনে মনে ভাবুক না কেন,

আমাকে লক্ষ্য করে ভাবলে তা সত্য হতে বাধ্য—কাপুরুষ…পলায়নবাদী…ভীতু! এগুলো এখানকার এবং এখনকার জনসাধারণের সতোগুণবিশেষ।…আস্থা-বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও। তোমার কষ্ট হবে—যদি সত্যি কথাটা বলেই ফেলি।… কেন না, আমরা সবাই সত্যকে অস্বীকার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিটি ভারতবাসী কী ভেতরে ভেতরে 'জনসঙ্ঘী' নয়? ছোট-বড় সবাই। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি বৌ-ছেলে-মেয়েদের জন্যে জনসংঘী হয়—সে কথা আলাদা। এই দালালটা দুটো পয়সার জন্যে, আমি আমার প্রিয়তমার জন্য এবং জওহরলাল তাঁর পদ-লিপ্সা বজায় রাখবার জন্যে!…আমি জানি, এসব শুনে তোমার ভালোও লাগবে (কেন না, তোমার ওপর আমি আমার আধিপত্য বিস্তার করছি) আর তুমি ঘাবড়েও যাবে এবং এমন একটা অন্ধকার খুঁজতে শুরু করবে—যেখানে তুমি এ সত্যটুকু স্বীকার করেও নিজের মুখখানা অনায়াসে লুকোতে পারো। বাদ দাও এ 'সত্য' ঠাট্টা ছাড়া কী? আমি জানি, লোকেরা এ থেকে 'সত্য' বাদ দিয়ে ঠাট্টাটুকু নিজের-নিজের ট্যাকে গুঁজবে এবং সময়-অসময় আমাকে অবজ্ঞা অথবা অপমান করতে থাকবে। অবশ্য সে অপমানে আমি এতটুকু দুঃখ পাবো না। ওদের ট্র্যাজেডির কথা পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে। ওরাও আমার মতো একটানা আটাশ বছর ধরে একটা সুন্দর ভুলের শিকার হয়ে রয়েছে…।

…দোকানদারের কাছে আমাকে বারংবার ক্ষমা চাইতে হচ্ছে। আমি ওর কথা শুনতে পাচ্ছি না।…অপেক্ষাকৃত কম দামে কাপড় পেয়ে গেছি। এখন 'লোকটার' সঙ্গে একটু… !

এখনো তো থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাতের নিভে-যাওয়া বিড়িটার মতো নিভে গিয়েও মাঝে মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ইঙ্গিতে কার-এর আলোয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে…।

এখন আমরা দুজনেই রাস্তায় হাঁটছি। মাথা নিচু করে—সমান্তরালভাবে। ও মাঝে-মাঝে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। উত্তর দেওয়া কিংবা চোখাচোখি করা আমার কাছে ভীষণ বাজে ঠেকছে। ওর চোখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা চুইয়ে পড়ছে এবং ও ওর আগেকার অপমান প্রায় ভুলেই গেছে। হয়তো তাড়াহুড়ো আছে। তাছাড়া, একজন সভ্য নাগরিকের কায়দা-কৌশল ও পাকাপাকিভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। কাজে কাজেই, ও এ কৃতজ্ঞতাটুকুকে 'অতি'র কৃত্রিমতা থেকে বাঁচিয়ে

রাখছে। ওর এ বিনীতভাব আমাকে আরো বেশী মন্থন করে চলেছে। আমি অনেকবার ভেবেছি—ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। কিন্তু, না। তাতে ও আরো কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবে এবং এক্ষুনি ওর কৃতজ্ঞতার ভয়ঙ্কর অক্টোপাশ আমাকে ভীষণভাবে জাপটে ধরবে। অতএব, আমি চুপ করে আছি এবং অন্যভাবে ভুগছি। আমি ওকে আগে-ভাগেই কেন··· ? তাহলে কী আমি ওই লোকগুলোর সঙ্গে এতই জড়িয়ে পড়েছিলাম যে··· ? হ্যাঁ, হয়তো তাই ঠিক।···আমি ওর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাইনি।

—'আপনি আগেই বলে দেননি কেন? আমি···!' আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বলি।

ও আরো কাছে সরে আসে। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে পুরনো বিনয়ের সঙ্গে বলে: আপনি তো বিশ্বাসই করেন নি! আপনি ভেবেছিলেন···?'

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। কাপড় নিয়ে বাইরে এলাম এবং ওর হাতে 'কিছু' গুঁজে দিতে গেলাম। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং প্রায় ওর চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু, তখুনি ও আবার আমাকে চমক লাগিয়ে দিলো। ···পয়সা নিতে অস্বীকার করে ও পাশেরই একটা ওষুধের দোকানে যেতে বলতে লাগলো। আর আমি ওকে পয়সা নিয়ে কেটে পড়তে বললাম। তখুনি ওকে জেদ করতে দেখে বুঝলাম—ও আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছে। আমি চুপচাপ ওর সঙ্গে চলতে লাগলাম। দোকান থেকে ও কিছু ওষুধপত্র নিলো এবং বিল চুকিয়ে দেবার জন্যে আমাকে কাউণ্টারে দাঁড় করালো। আমি চিরকুটের ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলাম: 'ছেলে। বয়স দু বছর। মেনানজাইটিস।' ···আমি পয়সা মিটিয়ে নিভু নিভু দাঁড়িয়ে রইলাম। মানুষের সম্বন্ধে গভীরভাবে বোঝার আমার অহঙ্কার আছে। তা সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের কথাগুলো বেশ আশ্চর্যরকমভাবে আমার কাছে সত্যি মনে হয়ে ওঠে।··· আচ্ছা, ওসব বাঁধা-ধরা বুলির মধ্যে আছেটা কী—যখন রোজ হাজার হাজার ঘর-বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু, আমি নিভে গেছি এবং আপসোস করছি। মনে হচ্ছে—ধীরে ধীরে আবার খিটখিটে হয়ে যাবো—আমার নিজের এই সামান্য হৃদয় পরিবর্তনের ফলে। কেন না, এ পৃথিবীতে হৃদয়-পরিবর্তনের মতো অবৈধ ব্যাপারে ঠাঁই হওয়া সম্ভব নয়। তবে? তবে, আবার এসব অনুভব করছি কেন? এই কারণেই কী সে ঘটনাটি আমার নিজস্ব আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে?

…ও একথাও বললো যে, ও ওভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। নিছক অভিনয় করছিলো। কেন না, অভিনয় দেখে আজও সাধারণ লোক খুশিতে ফেটে পড়ে। ও একথাও বললো যে, অনেক জায়গা থেকে নিরাশ হবার পরই ওকথা ভেবেছিলো ও এবং এজন্যে ওর মনে লজ্জার শেষ নেই।…এখন ওকে ট্রাম ধরিয়ে দিতে হবে আমাকে।

এখানে হালকা কুয়াশা। দু পাশে উঁচু উঁচু বাড়ি এত ঠাণ্ডা (ঘামে ভেজার মতো, এবং নিশ্চুপ বাড়িগুলোকে দেখে কেন জানি আবার রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে যাচ্ছেন। কলকাতার এজাতীয় পাড়ায় ঢুকলে অর্থহীন এবং বিচিত্র রহস্য কাহিনীগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।…আমি নিজেকে সুরক্ষিত মনে করছি। কেন না, লাইটগুলো অনেক দূরে দূরে এবং ও আমাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। আমি ভাবছি—ট্রাম স্টপ যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই মঙ্গল!

ও হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু, আমি ওর মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এমন ভাব দেখাচ্ছি, যেন. কেউ আমাকে পেছন দিক থেকে ডাকছে। ও ও ওদিকে দেখতে শুরু করেছে। …না কী আমার ভ্রম সত্যি হয়ে দাঁড়ালো? বাস্তবিকই ওদিক থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে। ও, এ দেখি ওরাই সব!

—'বলুন দাদা, খুব তো এলেন আপনি…!'

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ওদের বিশ্বাসই হচ্ছিলো না। ঠিক আছে, ওরা আমাকে কাপড়ের বাণ্ডিলসমেত দেখে নিক! অবশ্য, এখন এর কোনো অর্থ নেই। ওরা কি তাহলে মতলব পাল্টে ফেলেছে? খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। তাহলে ওকে পয়সা দিয়ে দিই? অযথা দেরি হয়ে যাবে ওর।…আমি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াই। কুয়াশার মধ্যেও ওর পেছনে মুখের আলো এবং আঙুলে ধরা ওষুধপত্র …!

ও মুচকি হাসি ছড়ায়। না, তা নয়। অতটা কৃতঘ্ন নয় ও। একসঙ্গে যাবার জন্যে ও আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে।…আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না।

—'হ্যালো, দাদা!'

আমি এই ভেবে মুচকি হাসি ছড়াই, যে সত্যি কথাই বলেছিলাম।…ওরা সবাই আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে। নিশ্চুপ সবাই। আমি ছেলেটির দিকে

তাকাই। সে-ই, যার পরীক্ষা হবার কথা ছিলো। ও-ও চুপচাপ, কিন্তু উত্তেজিত।

—'ইনি কে ?' ওরা সবাই লোকটির দিকে তাকায়।

—'ও আমার বন্ধু মিঃ··· ?' নামের জন্যে ওর দিকে তাকাই।

—'এস দাশগুপ্ত।' ও ওষুধ ধরা হাতে নমস্কার করে।

ওরা সবাই স্থির চোখে ওর দিকে তাকায়। হয়তো সবাই একসঙ্গে কিছু একটা বলতে চায়। অথবা ওদের মধ্যে থেকে একজন বললোও বুঝি : 'আপনি আপনার বন্ধুর নামটা পর্যন্ত···?'

না, একথাটা আমার মধ্যে বকের মতো ডানা মেলেনি···ওরা আমার মনটাকে চারদিক থেকে চেপে ধরে···! আমি ওকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলাম। যেমন, ও পয়সা নিয়ে চলে যাক। না কী ওদের যে, ওরা কী বাস-স্টপের দিকে যাচ্ছে ?

···কিন্তু ওরা আরো ঘনিষ্ঠ, আরো গাঢ় হয়ে দাঁড়ায়। সবাই নির্বাক। তাহলে ? একটা ইঙ্গিত—মাত্র একটাই···!

পলক পড়তে না পড়তে আমার মুখ-ফসকে বেরোয় 'না ..আ···আ আ !' কিন্তু, সে 'না···আ···আ' একটা বীভৎস আর্তনাদের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়··· !

···ফুটপাথের ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকা মিকশ্চারের ভাঙা শিশি, ভাঙা ইনজেকশন এবং ডিস্টিল্‌ড ওয়াটারের সাদা কাঁচের সঙ্গে রক্তে মাখাজোখা একটা মানুষ কাৎরাচ্ছে। কিছু লোক দৌড়োচ্ছে। একটা আটপৌরে ভিড় এবং পুলিস ডাকবার বন্দোবস্ত। অ্যাম্বুলেন্স-এর জন্যে ফোন করবার শলা-পরামর্শ···!

জানি না, এতে তোমার চিত্ত-বিনোদন ঘটবে কিনা! তবে, এতটুকু জানি —তুমি এসব আগ্রহ নিয়ে শুনবে এবং আমার কাছ থেকে আশা করবে : তারপর···?···তারপর ? ?

···কেন না, আমার যথেষ্ট নিষেধ করা সত্ত্বেও, অন্য আর পাঁচ-দশটা মেয়ের মতো, তুমি আমার মুঠো মুঠো আদর্শ, গুণ এবং নৈতিকতার একটা কল্পনা এঁকে ফেলেছো···কিন্তু, আমি হলপ করে বলছি : আমিও ওদের মতো যে কোনো জায়গায় যেতে পারি—বেশ্যালয়, পুস্তকালয়, রেস্তোরাঁ অথবা এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে ভাড়ায় পাওয়া মোলায়েম বিছানায় পর্যন্ত। আমিও সবার সঙ্গে মিশে

গেছি। আমি কৌতূহলের মুখোশ পরে ফেলেছি—এ বেচারা কে? ওরাই বা কে?…আমি, ব্যস, নির্বাক। একজন আমার কাছে জিজ্ঞেস করে, আমি আবার আরেকজনের কাছে জিজ্ঞেস করবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াই…।

হঠাৎ কে যেন পেছন দিক থেকে আমাকে ছোঁয়। আমি ভয়ে শিউরে উঠি। না, কেউ নয়। সেই ওরাই এগিয়ে আসছে—ওকে দেখবার জন্যে।

…আমি ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে পেছনে সরে আসি…!

অন্য একজন ॥ হৃদয়েশ

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ, মহত্ত্বপূর্ণ বা বিশিষ্ট একজন—এমন তিনি নিজেও মানতেন না, কিংবা এই সম্পর্কে তাঁর কোনো সুখময় ভ্রম ছিল না। কিন্তু, কারোর ছোট হওয়া এক ব্যাপার, এবং তাকে ছোট উপলব্ধি করানো আরেক ব্যাপার। সেটা একধরনের সেই ঘা-য়ে আঙুল সেঁধিয়ে খুঁচিয়ে দেয়ার মত, যা স্পর্শ না করলে যন্ত্রণা হয়-না, এবং স্পর্শ করলে যন্ত্রণা হয়। বারবার তাঁর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে। বারবার এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, যাতে অন্য একজন চাগাড় দিয়ে ওঠে এবং সে অনায়াসে ছোট হয়ে পড়ে কিংবা অধিকার যা তাঁর পাবার কথা, তা অপরে লাভ করে।

এমন কেন ঘটে? শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন। এমন প্রশ্ন তিনি অপরকে নয়, বরং নিজেকেই করতেন। এই প্রশ্নের অনেক উত্তর হতে পারে এবং কয়েকটি উত্তর তাঁর সামনে ফুটে উঠে হাজির হয়। কিন্তু, ঐসব উত্তরের সারাংশ এটাই বেরিয়ে আসে যে ইচ্ছে করলেও তিনি এমন পরিণতি রোধ করতে পারেন না। পরিস্থিতি সাংঘাতিক নির্মম ও শক্তিশালী, এবং সেই তুলনায় তিনি নেহাত অসহায়, পঙ্গু ও নাচার। যেমন, একজন যুবককে তিনি ভাল করে চেনেন। একদা দীর্ঘকাল সেই যুবকটি তাঁর ছাত্র ছিল, এবং তিনি তার নাড়ী-নক্ষত্র জানতেন। এখন, চরিত্র সম্পর্কে তিনি তাকে প্রমাণপত্র সহজেই দিতে পারতেন। এবং দেন। কিন্তু তা প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তারপর এক অপরিচিত ব্যক্তি—যিনি অফিসার ধরনের অথবা ক্ষমতাবান—তাকে প্রমাণপত্র দেয় এবং তা মূল্যবান ও মান্য হয়ে পড়ে।

ধরা যাক, তিনি একটি কথা বললেন। শ্রোতারা তাঁর কথা স্বীকার করে নিল, অথবা স্বীকার করতেও প্রায় রাজী। এমন সময় দেখা গেল অন্য একজন

অন্য কথা বলল এবং শ্রোতারা তখন অম্বাপ্রসাদের কথা চেপে দিয়ে অন্য কথাটি উপরে তুলে ধরে।

বারবার এমন ঘটে। বারবার এমন পরিস্থিতি এসে হাজির হয়। বারবার তিনি ছোট হয়ে পড়েন।

সম্ভবত এও একটা কারণ যে, শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের মনে সর্বদা আশঙ্কা ছেয়ে থাকত যে-কোনো সময়ে কোথাও তাঁর কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই দুর্ঘটনা কেমন হবে, তার রূপ ও আকার কি হবে, এটা পরিষ্কার ছিল। তার উপলব্ধি মস্তিষ্কে, কুয়াশার স্তরের মতো ধোঁয়াটে, খুব স্পষ্ট নয়, আবার খুব অস্পষ্টও নয়। একটি অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির চোরামাটি—যাতে তিনি ফেঁসে গেছেন।

সেদিন তাঁর যাত্রা করার কথা ছিল, তাই বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা সময় আগে রওনা হয়েছিলেন। আগে যাবার কারণ এই যে বিলম্বে দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

টিকিট ঘরের জানালা খোলা ছিল না এবং সময়ানুসার তখনও তা খুলতে বেশ দেরি। কিন্তু তিনি জানালার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকেন। সাবধানী কারণে বড় নোটকে ছোট নোটে এবং খুচরো পয়সায় ভাঙানি করে রেখেছিলেন। বাসে সামনের দিকে সীট পেয়ে যান। সীটের তলায় তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ রাখেন যার ভেতর দু জোড়া কাপড় এবং নিত্য ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। সীটখানি জানালার ধারেই এবং তা সুবিধেজনক ছিল। শার্টের পকেট থেকে তিনি রুমাল বের করেন, প্রথমে ঘাড়-গলা, তারপর মুখের চারপাশে জবজবে ঘাম মুছে ফেলেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে দুটি দীর্ঘ নিশ্বাস নেন, তারপর বাইরের দিকে চেয়ে দেখতে থাকেন। আড়াই ঘণ্টার এই যাত্রা, এখন তিনি আরামে, কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই কাটাতে পারবেন।

যাত্রীরা দু-চারজন করে আসছিল, পাখির মত কিচিরমিচির চেঁচাতে চেঁচাতে বাসের ভেতর ঢুকছিল, এবং মুহূর্তে জায়গা ভরে ফেলছিল।

তিনি পেছন দিকে ঘুরে তাকান। লোকেরা বড় বড় আকারের মালপত্র, উপরে ছাদে ওঠা-নামার ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য, ভেতরে এনে জড়ো করে রেখেছিল, যার ফলে বাধার সৃষ্টি হয়। গমনেচ্ছু যাত্রীরা ঐ বাধাকে লঙ্ঘন করে উঠছিল এবং অবশিষ্ট সীটে তুলনামূলক দৃষ্টিতে ভালো নির্বাচন করছিল। একজন যাত্রী যে সীটে বসেছিল, সেখান থেকে কিছুটা ঝুঁকে পিচ্ করে পানের

পিক্ ফেলে। শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের এটা ভালো লাগে না। তার মাঝে অন্তরে কোথাও এক দায়িত্বশীল, সভ্য নাগরিকতার ভাবনা ছিল। সেই যাত্রীটির উচিত ছিল, কায়দা করে জানালার বাইরে ঘাড় বের করে পিক ফেলা।

তারপর জানালার সামনে একজন লোক এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে টেরিন কাপড়ের শার্ট ও প্যান্ট পরনে এবং গলায় টাই বাঁধা—যাতে খুব সুন্দর একটা এরোপ্লেন আঁকা। পায়ে মোজা ও জুতো। জুতো যে ডিজাইন ও চামড়ার তৈরি, মনে হয়, তার দাম পঞ্চাশ টাকারও বেশী হবে। হাতে কালো ডায়ালের সুদৃশ্য ঘড়ি, একটা চওড়া ফিতেয় বাঁধা। বেশভূষার মত তার চেহারাও চাঁচাছোলা, অহঙ্কারী ও দামী।

ঐ লোকটির সামনে-পেছনে আরও দুজন লোক ছিল যারা সপ্রতিভ ও ঐ ধরনের পোশাক ব্যবহৃত ব্যক্তিত্বের ফলে তারই সমতুল্য শ্রেণীর মনে হয়। সেখানে ড্রাইভারও এসে হাজির হয়।

ড্রাইভার জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে, সামনে বসা যাত্রীদের দিকে লক্ষ্য করতে থাকে। তার দৃষ্টি প্রতিজনকে ওজন করে। কোনো কসাইয়ের মত তার চোখ জোড়া তীক্ষ্ণভাবে বুঝে ফেলার মত চক্‌চক্ করতে থাকে। ঐ চোখ জোড়া ক্রমশ শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের দিকে একটু বেশীক্ষণ টিকে থাকে। অথবা অম্বাপ্রসাদের এমন মনে হয়।

—দাদা, আপনাকে এই সীটটা ছাড়তে হবে। আপনি পেছনে গিয়ে বসুন। সেখানে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। ড্রাইভার তাঁর দিকে মুখ না-ফিরিয়ে বলে। তাঁর দিকে না-দেখাটা চালাকি মাত্র। ড্রাইভারের কণ্ঠস্বরে অনুনয় ছিল, অথবা আদেশ এটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অম্বাপ্রসাদের হ্যাণ্ডব্যাগ নিজের হাতে তুলে নেয়। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার কোনো সুযোগ সে ওখানে রাখতে চাইছিল না।

এরি মধ্যে সেখানকার বাসের কোন মালিক এসে হাজির হয়, এসেই সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে কোনো সীট খালি হয়েছে কিনা! তারপর ড্রাইভারকে বকুনি দেয়, সামনের দু-একটা সীট সবসময় খালি রাখা উচিত। কে জানে কখন যে বিশেষ লোক এসে পড়ে।

ড্রাইভার ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, তারপর এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে যেন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসবেন।

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকে যার এখন সীট পাওয়ার

কথা। তার চেহারায় কোনো রকম ব্যগ্রতা বা বিরক্তি ছিল না। পরিবর্তে হাস্যময় প্রসন্ন মুখ—সহজভাবে গ্রহণ করার মত একটা ভাব রয়েছে। একটি নম্র হাসি ও ঔজ্জ্বল্য, সেই সঙ্গে আশ্বস্তপূর্ণ। মিনিটখানেক পূর্বে পকেট থেকে সিগারেট বার করে লাইটারে অগ্নিসংযোগ করেছিল, এখন তা টানতে থাকে।

—দাদা, বেরিয়ে আসুন। চিন্তা করবেন না। আপনাকে আমি পেছনের সীট দেবো। ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর এবার বিরক্তিতে কর্কশ ও রুক্ষ বোধ হয়।

অম্বাপ্রসাদ উঠে আসেন এবং পেছনের সীটে বসে পড়েন। তাঁর ঘাড় ও চেহারা স্যাঁতসেঁতে মাটির মত ভিজে গিয়েছিল। তিনি প্রথমটা লক্ষ্য করেন নি যে কোথায় বসেছেন। ড্রাইভার যেখানে বসিয়েছে, তিনি সেখানেই বসে পড়েছেন। তারপর লক্ষ্য করতেই তিনি দেখেন, তাঁর পাশে একজন বৃদ্ধা বসে আছেন যাঁর শীতের প্রকোপ আছে এবং প্রতিমিনিটে অন্তত দু বার করে কাশেন। অন্য পাশে সেই পান খাওয়া আধা-গেঁয়ো আধা-শহুরে লোকটা বসে। অম্বাপ্রসাদ ভাবতে চেষ্টা করেন ড্রাইভার সামনের সীট থেকে তাঁকেই বা কেন পেছনে যেতে বলল, অথচ সেখানে আরও চারজন লোক বসে আছে। তারপর এই ভাবনার চেষ্টায় তিনি নিজের শার্ট দেখতে থাকেন, ধোপার বাড়ি থেকে কাচানো, কিন্তু ভালো করে ইস্ত্রি করা হয় নি। তারপর ব্যাগ দেখেন, যাতে একটা বদরঙ তালি মারা ছিল এবং যার চেনটি আধ খোলা নষ্ট হয়ে আছে।

সেই বিশেষ লোকটি সামনের সীটে বসে পড়ে। বাস মালিক বেশ মোলায়েম ও মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে তাঁর কোনো কষ্ট হয় নি তো?

প্রত্যুত্তরে সেই লোকটি বলে, দরকারী সময়ে তাঁর গাড়ির ব্যাটারী ডাউন হয়ে পড়েছে, নইলে সে তাদের কষ্ট দিত না।

সেই মনিবটি যেন অনুগ্রহ লাভ করার মত হাসতে থাকে—যাক্‌গে অন্তত এই অজুহাতে আপনি আমাকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তার সঙ্গে তিন চারজন ব্যক্তিও অনুগৃহীতভাবে হাসতে থাকে।

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের চেহারা আবার সেই রকম ঘেমে ওঠে, রুমাল বার করে আবার মুছে ফেলেন। তারপর তিনি যে ভঙ্গিমায় বসে পড়েন তাতে কেবল এটুকুই মনে হয় তিনি সেই অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করতে চাইছেন, এবং এই চেষ্টাতে বাইরে চেয়ে থাকেন। এমন কেন ঘটে, প্রশ্ন জেগে ওঠা মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাপা দেন এই স্বীকার করে যে এমন ঘটা থেকে কিছুতেই তিনি রোধ করতে পারবেন না।

দিন দশেক পরে আরো একটি ঘটনা ও দৃষ্টান্ত, যাতে তিনি বিচ্ছিন্ন হতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না।

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ অবশ্য তাদের জানতেন। বস্তুত তারা রোজকার পরিচিত। তাঁর বাজারে যাবার রাস্তা সেদিকেই ছিল।

তারা দুজনেই সম্পর্কে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই এবং তাদর বাড়ি লাগালাগি এক অপরের সঙ্গে একই দেয়ালে খাড়া ছিল। তারা ঝগড়া করছিল। শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ তাদের ঝগড়াঝাঁটি দেখে থেমে পড়েছেন। আরো কয়েকজন সেখানে এসে জড়ো হয়, এবং রিকৃশা, সাইকেলের মত দাঁড়িয়ে পড়ে।

তারা ঝগড়ায় এতদূর মত্ত হয়ে উঠেছিল, যেন এই মুহূর্তে মারামারির পর্যায় এসে পড়তে পারে।

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ তাদের দুজনের কাছে এগিয়ে যান—এভাবে ঝগড়া করাটা আপনাদের শোভা পায় না। কোনো বিবাদ থাকলে নিজেদের মধ্যে বসে মিটমাট করে নিন।

—ও ঝগড়া মিটমাট করলে তো! দেখছেন। আমায় সরাসরি বেইমান করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। একজন ফুঁসে ওঠে।

—আমি? না, তুমি বেইমান। কাগজে কে জাল লেখা দেখিয়েছে? অন্যজন ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়।

বাড়ির পেছনে আট-দশগজ খালি জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব। একজনের গরু কেনা হয়েছে এবং কে ঐ খালি জায়গায় গরুটাকে বেঁধে রাখতে চায়। অন্যজন বাধা দিয়েছে যে জায়গাটা ওর নয়, তার।

এভাবে ঝগড়া করলে লোকেরা হাসাহাসি করবে। ঝগড়া করলে কি মিটমাট হয়! অম্বাপ্রসাদ একজনের কাঁধে হাত রাখেন, অন্যজনের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন।

—আমি ঝগড়া-বিবাদ মোটেই পছন্দ করি না। আপনি আমার ব্যবহার জানেন, একজন সামান্য ঠাণ্ডা হতেই বলে, তবে, জায়গা যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে আমার পাওয়া উচিত।

—আমিও ন্যায় পছন্দ করি। আমিও নিজের জায়গা চাই—অপরের নয়।

—ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করার তিনটে উপায় আছে, অম্বাপ্রসাদ এখন অন্যজনের কাঁধে হাত রাখেন এবং প্রথমজনের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন। এক, আপসে নিজেরা বসে স্থির করে নেওয়া এবং এটাই সবচেয়ে ভাল। দুই, কাউকে মাতব্বর করে তার বিচার মেনে নেওয়া, এবং এটাও ভাল। তিন, আদালত খোলা আছে, সেখানে যাওয়া চলে। কিন্তু সেখানে গেলে ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাটের ভিড়।

—আপনি যেমন বলবেন, আমি সেইভাবে মিটমাট করতে রাজী।

—আমিও রাজী। অন্যজন সম্মতি জানায়।

—আমার মতানুযায়ী, আপনারা যদি নিজেরা এই বিবাদ মিটমাট করতে না পারেন, তাহলে কাউকে মাতব্বর দাঁড় করিয়ে নিন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের মনের কোণে সন্তুষ্টি ও আত্মপ্রসাদ ছড়িয়ে পড়ে, তারা দুজনেই তাঁর কথা মানছে এবং তিনি তা সার্থক ও সুষ্ঠুরূপে দেখতে পান। পকেট থেকে ডিবে বার করে তিনি একটা বিড়ি ধরান।

—আপনিই তাহলে মাতব্বর হন। একজন বলে।

—ঠিক আছে, আপনি যা রায় দেবেন, তা আমি মানতে রাজী। অন্যজন একই স্বরে বলে।

ঠিক তখনি সেখানে অন্য একজন এসে হাজির। একটু দূরে বাস করতেন বটে, কিন্তু অপরিচিত ছিলেন না। তিনি একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ছিলেন, এবং একটি কলেজের ম্যানেজার। তাছাড়া আরও কয়েকটি সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তিনি তাকেই জিজ্ঞেস করেন কেন তারা ঝগড়া-বিবাদ করছিল, তারপর উপদেশ দেন তাদের এভাবে ঝগড়া-বিবাদ করা মোটেই উচিত নয়। তারপর বলেন, তারা যেন বিকেলে তাঁর কাছে আসে এবং তিনি তাদের ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেবেন।

—হ্যাঁ, আপনি মিটামাট করে দিন, অনেক কৃপা হবে।

—আমি আপনাকে মাতব্বর করছি।

তারপর তারা সেই ব্যক্তিকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। অম্বাপ্রসাদ সেখানে তামাশা দেখা লোকেদের মাঝে উপেক্ষিত ও অবহেলিত জন হয়ে ওঠেন। এখন তাঁর অবস্থা পালিশ ওঠা আয়নার মত মনে হতে থাকে। এমন কেন ঘটে? প্রশ্ন আবার জেগে উঠতেই, তিনি শক্তভাবে চাপা দেন।

তারপর যে দুর্ঘটনা ঘটে, গতবারের চেয়ে আলাদা না হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র ছিল যে তা খুবই তীক্ষ্ণ ও নির্মম—যা শিক্ষক অম্বাপ্রসাদ সহ্য করতে পারছিলেন না। দুর্ঘটনার যে রূপ ও আকারের কল্পনা তাঁর মগজে ধোঁয়াটে গোছের ছিল, বাস্তবে তা আরও বেশী ভয়াবহ ও ঘাতক। সে শেষবারের মত বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। তাঁর জোয়ান ছেলে চলে যায়। না, বরং তাঁর সর্বস্ব চলে যায়।

দিনেশ দোকানে উনুন ধরাতে গিয়ে, কাপড়ে আগুন ধরে যায়, ফলে পুড়ে মারা যায়—লোকেদের এটাই বক্তব্য ছিল। হয়তো এটাই সত্য। কিন্তু, অম্বাপ্রসাদের কাছে এটা সত্য বলে মনে হয় না। অসাবধানতাবশত এত বড় দুর্ঘটনা কি ঘটতে পারে? দিনেশ চেঁচিয়ে ওঠেনি কেন? এবং পুড়ে যাবার পরেই বা লোকেরা কেন জানতে পারল? তাঁর মনে হয়, দিনেশ আত্মহত্যা করেছিল।

প্রকৃতিগত কারণে কারও মৃত্যু হওয়া এক ব্যাপার, এবং কেউ জেনেশুনে মৃত্যু ঘটায়, সেটা অন্য ব্যাপার। দুটোর দুঃখ ও পীড়ার চাপে বেশ তফাত আছে। একটা দুঃখ সরাসরি আসে। আসে এবং দুঃখ দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। আরেকটা দুঃখে ধার থাকে। আসে এবং করাতের মত চিরে যায়। অম্বাপ্রসাদের মনে হয়, কোনো দাঁতাল করাত তাঁকে তীব্রভাবে চিরে চলেছে।

শোক জ্ঞাপনের জন্য লোকেরা আসে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকে—অম্বাপ্রসাদ সহ্য করো। তোমার দুঃখ সাংঘাতিক। তোমার মাথায় বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে। তোমাকে সহ্য করতে হবে। সাহসে বুক বাঁধো। কিছুটা এ রকমই দিনেশকেও তিনি বোঝাতেন। দিনেশের যে ধরনের স্বভাব ছিল এবং যে সব কথা বলতে শুরু করেছিল, তাতে তাঁর ভয় ও ত্রাস হত। আতঙ্কের কীট তার কাঁটাযুক্ত পা ফুটিয়ে ভেতরে হাঁটতে থাকে। হ্যাঁ, দিনেশের কিছু আদর্শ এবং স্বপ্ন ছিল। এবং তা যথার্থ সত্য। কিন্তু, তা এতদূর সত্য ছিল যে পূরণ হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। যদি তা করার চেষ্টা করত, সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, একা হয়ে পড়ত, এবং শত্রুর বিরাট বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলত। দিনেশের অফিসার তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ সে বেগার কাজ করতে অস্বীকার করেছিল। অম্বাপ্রসাদ তাকে বোঝাতেন, ঘরের দরজা যদি বাঁকা হয়ে থাকে, তা হলে বেঁকে তার ভেতরে ঢোকা যেতে পারে এবং ঘরের হিসেব মত থাকাও যায়। সোজা ঢোকার চেষ্টা করলেই গা-গতর ছড়ে যাবে।

কিন্তু, দরজা ও ঘর বাঁকা হওয়া সত্ত্বেও দিনেশ নিজেকে সোজা রাখতে

চাইত। তার মনে একটা ভ্রম ছিল, সে সোজা থাকলে ঘরও সোজা হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে একজন অত্যধিক চতুর প্রবঞ্চক, ধূর্ত এবং কুটিল অফিসার এসে পড়ে অর্থাৎ একটি পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার। দিনেশের পেছনে লাগতে সে তার বেইমানী নগ্ন করে দেয়। অফিসার তাকে কাগজপত্রের জালে জড়িয়ে ফেলে, তারপর চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়।

—গ্যাখো, আমি তোমাকে বলেছিলাম···

—আমি বিভাগীয় উচ্চ অধিকারীর কাছে আপীল করবো।

আপীল করে এবং তা খারিজ হয়ে যায়।

—গ্যাখো, তুমি আমার কথা শুনলে না। আমার বয়স হয়েছে, তোমাকে যা বলেছিলাম তা আমার অভিজ্ঞতা থেকে শেখা।

—আমি আদালতে মামলা নিয়ে যাবো।

এবং দিনেশ আদালতে মামলা ঠুকে দেয়। কিন্তু, মামলা আদালতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ছ'মাস পেরিয়ে যায়, বছর গড়িয়ে যায়, দেড় বছর পেরিয়ে যায় তবুও ঘুমিয়ে থাকে। যদিও বা জেগে ওঠে, তাও কিছুক্ষণের জন্য; দশ-পাঁচ পা হাঁটার পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। উকিল জানায় মামলা কিছুটা সময় নেবে, কিন্তু সেই সময়টা কতখানি দীর্ঘ হবে হিসেব করে কিছু বলা যায় না। তারপর দিনেশ রেস্টুরেণ্ট-এর কাজ শুরু করে দেয়। সে তার এই নতুন কাজকেও পরিচ্ছন্ন ঢঙে করতে চেয়েছিল।

পুলিসের এক হেড-জমাদার তার রেস্টুরেণ্টে মাগ্‌না জলপান করতে চাইত। নিজের নামে কিছু বাকী সে জোর করে চাপিয়ে নেয়, এবং তা শোধ করে না। প্রায় মাসখানেক আগে দিনেশের সঙ্গে তার বচসা হয়। জমাদার তাকে চোখ রাঙায়, সেই সঙ্গে গালাগালও দেয়। দিনেশ অভিযোগ জানাবার জন্য থানায় যায়। কিন্তু সেখানে জমাদারের পক্ষপাতিত্ব হয়, এবং তাকে বকুনি দিয়ে সরিয়ে দেয়। সে তখন পুলিস কমিশনারকে কমপ্লেন লেটার পাঠিয়ে দেয়।

পরশু পুলিসের সেই হেড-জমাদার আবার এসে তাকে চোখ রাঙায়, গালাগাল দিয়ে যায়। পরশু থেকে সে আরও উদ্বিগ্ন, কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে থাকে।

আজ উনুন ধরাতে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন লাগে। লোকেরা বলছে অসতর্ক থাকায় অমন ঘটেছে। কিন্তু অম্বাপ্রসাদের সন্দেহ, ছেলে জেনেশুনেই কাপড়ে আগুন ধরিয়েছে।

কাল অব্দিও যে ছিল, না আজ সকালে উঠে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সে আর নেই। পিতা তার পুত্র, স্ত্রী তাঁর স্বামী এবং খুকী তার বাবাকে হারিয়ে ফেলে। তারা সকলেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটবে কি করে? তারা কি ঐ জ্বলন্ত আগুনের মত ধিকিধিকি করে জ্বলবে। মগজে কিছুই ভালো করে বসছিল না।

অম্বাপ্রসাদ কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর মাথার চুল বিশৃঙ্খল ছড়িয়ে পড়ে। ললাটে মুখে কেবল জটিল রেখার আবির্ভাব। তা যেন চটে ওঠা আয়নার মত।

শোকসন্তপ্ত অম্বাপ্রসাদকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য লোকেরা আসা যাওয়া করছিল, তাঁকে বোঝাচ্ছিল—সহ্য করো অম্বাপ্রসাদ, সহ্য করো। তোমার দুঃখ ও যন্ত্রণা বিশাল। তবুও তোমাকে সহ্য করতেই হবে।

তারপর, সেখানে একজন ব্যক্তি এসে হাজির, সে স্বয়ং পুত্রকন্যার জনক এবং বয়সও হয়েছিল। অন্যান্যদের কাছ থেকে সে কেবল এই অর্থেই আলাদা যে গত সাত-আট বছর প্রচুর টাকা-পয়সা জড়ো করেছে। এখন তার ধান-চালের বৃহৎ কারবার। সে এসেই বলে—মাস্টারমশাই, আমি এইমাত্র মিল থেকে এসেছি, এসেই খবর পাই। বাস্তবিক এটা খুবই খারাপ হয়েছে। খুবই।

সেখানে উপবিষ্ট অন্যান্যরাও বলে—হ্যাঁ, খুবই খারাপ হয়েছে। জোয়ান ছেলে। বাপের কাছে ছেলের চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? ছেলে হলো শিরদাঁড়া। শিরদাঁড়াই যদি ভেঙে যায়, তাহলে সব অর্থহীন। তারপর, তারা শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের ছেলের সম্পর্কে নানান কথা আলোচনা করতে থাকে, সত্যি কত ভালো ছেলে ছিল, বয়স্কদের সম্মান করত। বাচ্চাছেলেরা তাকে ঘিরে থাকত।

সেই লালার চেহারায় যেন কেউ কাটাছেঁড়া করতে থাকে। গভীর অবসাদের ছায়ার ডেলা জায়গায়-জায়গায় জুড়ে বসে। প্রথমে চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে, তারপর তা থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। উপবিষ্ট লোকজন কিছুটা বিস্মিত কিছুটা শ্রদ্ধা সহকারে লালাকে দেখতে থাকে। দুঃখ তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, তাই সে দ্রুত দ্রবিত হয়ে পড়েছে।

—যোগীন্দ্রের কথা আমার মনে পড়ছে। লালা ঘড়ঘড় শব্দে বলে ওঠে।

—আহা, যোগীন্দ্র! যোগীন্দ্র মারা গেছে বছর দুই হল। হ্যাঁ, যোগীন্দ্রও জোয়ান ছেলে ছিল। যোগীন্দ্রের বয়সও কাঁচা ছিল।

যোগীন্দ্র সেই লালার ছেলে। তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুটা রহস্য জড়িয়ে ছিল।

কানাঘুষোয় শোনা যেত, সে নাকি স্মাগলিং-এর ব্যবসা করত। রাত্রে খুব স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। এও শোনা যায়, সে তখন নেশায় মত্ত ছিল। একটা গাছের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগে, ফলে সে মারা যায়।

লোকেরা এখন যোগীন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে।

—আমার চোখে যোগীন্দ্রের সেই ছবি। মনে হচ্ছে সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে হৃদয়ের টুক্‌রো, একে আলাদা করে ভুলে যাবার চেষ্টা করলেও ভোলা যায় না। লালার চোখ দিয়ে অশ্রু দ্রুত গড়াতে থাকে।

—লালা হরজিৎ সিংহ, ধৈর্য ধরো। যা হয়ে গেছে, তা ভুলে যাও। বিগত দুঃখকে তাজা করা উচিত নয়। দুঃখ ভোলার জন্যই হয়ে থাকে। ভুলে যাও। ধৈর্য ধরো। একজন উঠে লালার খুবই কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, মনে হয় সে বুঝি তাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করবে।

শিক্ষক অম্বাপ্রসাদের ঘাড় ঝুঁকে ছিল। তিনি ধীরে ধীরে তোলেন। ঘাড় তুলতে তাঁকে চেষ্টা করতে হয়। দেখেন, লালার কাছেপিঠে আট দশজন লোক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে সামলাচ্ছে। সহসা চোখের সামনে কিছু একটা কেঁপে ওঠে, সম্মিলিত চেহারা নিমেষে ধোঁয়াটে হয়ে পড়ে, তারপর হারিয়ে যায়। মনে হয়, চারদিকে অন্ধকার,···নিবিড় অন্ধকার এবং তিনি ঐ অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত, তাঁর এখনও কিছু ধরার বাকী ছিল। কি ছিল, তা তিনি বলতে পারবেন না। কিন্তু, কিছু একটা ছিল, যা অদৃষ্ট; এবং এখন তাও খসে পড়েছে।

একটি শিশুর মত তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বন্ধু-মিলন ॥ অমরকান্ত

দূরে, ব্রিজের ওপর ট্রেন যাবার ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেলে, উমাশঙ্করবাবু কাগজ পড়া বন্ধ করে চেয়ারে মাথা এলিয়ে দেন, তারপর চোখ বোজেন। কিছুক্ষণ পরে, ঘুম থেকে জেগে ওঠা বেড়ালের মত, ধীরে ধীরে মাথাখানি তোলেন, এবং উদাসীন দৃষ্টিতে ইতস্তত চেয়ে দেখেন। এই সময় পোস্টম্যান একটা চিঠি ফেলে যায় ঘরে। তিনি ভগবানের নাম নিয়ে উঠে দাঁড়ান, তারপর খস্‌খস্‌ শব্দে হেঁটে দরজার কাছে এগিয়ে যান। বেশ কষ্ট করে তিনি ঝুঁকে পোস্টকার্ডখানি তুলে নেন, তারপর চশমার ভেতরে চোখ কুঁচকে পত্র-লেখকের নাম দেখেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসে পড়েন, চিঠিটার ওপর থেকে তলায় দেখতে থাকেন। শিবনাথ! কোন শিবনাথ? অ্যা…! সহসা চমকে উঠে, চিঠিটা দ্রুত পড়তে শুরু করেন :

প্রিয় উমাশঙ্কর,

নমস্কার। আমার এই চিঠি দেখে তুমি খুব অবাক হবে। আমি জেনে খুশী হয়েছি যে প্রভুর দয়ায় তুমি ভালই আছো। পঞ্চাশ বছরের সে-সব কথা কি তোমার মনে আছে? সত্যি উমাশঙ্কর, আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তুমি জানতে চাইবে, কি করে আমি এই চিঠি লিখলাম। কয়েক বছর আগে আমি রিটায়ার করে এখানে পাটনায় ছেলের সঙ্গে বাস করছি। এখানে মিঃ জয়নারায়ণ ভাটিয়া আমার পরিচিতজনের মধ্যে একজন। তাঁর ছেলের বিয়েতে একজন তরুণের সঙ্গে আলাপ ঘটে। কথায়-কথায় জানা যায়, সে তোমার ছেলে। আমি অতঃপর তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করি এবং তোমার ঠিকানা নিই। আমার বয়স এখন উনষাট বছরের চেয়ে কিছু বেশী। তুমি আমার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট ছিলে। মনে পড়ে? য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আমি কিছুকাল

লাহোরে কাজ করি, তারপর বাঙ্গালোরে একটি ফার্মের ম্যানেজার ছিলাম। ভগবান শঙ্করের কৃপায় সব ঠিক আছে। আমার ছেলে সেক্রেটারিয়েটে সুপারিনটেনডেণ্ট। তোমার খবরাখবর জানিও। চিঠি দিও নিশ্চিত।

তোমার পুরনো বন্ধু,

শিবনাথ

উমাশঙ্করবাবুর মুখ হতভম্ভ হয়ে খুলে যায়, হাঁড়ির মুখের মত দেখাতে থাকে। চোখ বিস্ফারিত করে তিনি চিঠি দেখতে থাকেন। আরেকবার পড়েন। তাঁর বুকের ভেতরে অদ্ভুত ধরনের সুড়সুড়ি হতে থাকে, যেন গুমোট ও দুর্গন্ধময় ঘরে টাটকা বাতাসের তাজা প্রবাহ বয়ে যায়। শিবনাথ! তিনি স্মৃতি খুঁজতে থাকেন, কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠে এবং পরক্ষণেই অতিদ্রুত ভেঙে মিশে যায়। তিনি ঐ রেখাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারপর চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেন। চোখ বন্ধ করে, মগজকে যাবতীয় ভাবনা-চিন্তাশূন্য করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে, স্বতই তার সামনে একটি আকৃতি ফুটে ওঠে…লম্বা, একহারা শরীর, ফর্সা রঙ, ছোট গোল নাক, কৌতুকময় চেহারা। তিনি সশব্দে হেসে ফেলেন।

তাঁর স্ত্রী রুক্মিণী ঘরে এমনভাবে ঢুকে পড়েন, যেন কেউ ভেতর থেকে তাঁকে সেখানে জোর করে ঠেলে দিয়েছে—একা একা হাসছ যে! পাগল হয়ে যাওনি তো?

আরে…একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। আমার ছোটবেলাকার এক বন্ধু ছিল—শিবনাথ! সম্ভবত তোমায় বলে থাকব। পঞ্চাশ বছর বাদে আজ তার চিঠি পেয়েছি। সবই ভগবানের কৃপা। এখন পাটনায় থাকে। লালুর সঙ্গে দেখা করেছিল…

'লালুর সঙ্গে দেখা করেছিল?' উমাশঙ্করবাবুর কোলের ওপর রাখা চিঠিটা রুক্মিণী ছোঁ মেরে মেরে তুলে নেন, এবং দ্রুত পড়তে শুরু করেন। তারপর, অভিযোগের স্বরে বলেন—লালুর জ্বর হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কিছু লেখেনি।

তুমি নিজের কথা ছাড়া আর কিছু বোঝ না। উমাশঙ্করবাবু ক্ষুব্ধভরে স্ত্রীকে ফিরে দেখেন।

রুক্মিণী বিড়বিড় করে ভিতরে চলে গেলে উমাশঙ্করবাবু আবার স্মৃতির জগতে ডুবে যান। তাঁর ঠোঁটজোড়া মধুর হাসিতে ছড়িয়ে পড়ে। এক অদ্ভুত অনুভূতি তাঁর হতে থাকে, যেন তিনি এক হরিৎময় মাঠে দ্রুতবেগে উড়ে চলেছেন। সহসা

উত্তেজিত হয়ে বাত-জর্জরিত কোমরে জোর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান, তারপর ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারি করতে থাকেন। শিথিল চামড়া ও গভীর রেখাবহুল মুখখানি আন্তরিক হাস্য ও প্রসন্নতায় তাঁকে বিদূষকের মত মনে হয়। তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করে, চেয়ারে ফিরে এসে আবার বসে পড়েন।

নিজের মাথাখানি চেয়ারে ঠেকিয়ে রেখে, আবার তিনি স্মৃতিকে মিষ্টিপানের মত ধীরে ধীরে চিবোতে থাকেন। শিবনাথ অষ্টমশ্রেণী থেকে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। শীতকালে একবার ওঁর শরীরে খুজলি হয়, উমাশঙ্করবাবু ছাড়া অন্যান্য সহপাঠীরা তাঁর সঙ্গে বসতে অস্বীকার করেন। এই সাধারণ ঘটনা তাঁদের মাঝে প্রগাঢ় আত্মীয়তা ও মৈত্রী স্থাপন করেন, যা অপরের পক্ষে ঈর্ষণীয় প্রমাণিত হয়। শিবনাথ উদার, স্বাভিমানী ও খেলোয়াড় মনোভাবের ব্যক্তি ছিল। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে সকালে গঙ্গায় স্নান করতেন, দূরে-দূরে ম্যাচ দেখতে যেতেন, এমন কি পরীক্ষার সময়ে কম্বাইণ্ড স্টাডি করতেন। শিবনাথ অভিজাত বংশের ছেলে ছিলেন, হাতও উদার ছিল। যে কোন অবসরে সে হাত খুলে পয়সা বার করত, উমাশঙ্কর-বাবুকে সামান্যতমও খরচ করতে দিত না। তাঁরা দুজনে একে-অপরের জন্য প্রাণ দিতে তৈরী থাকতেন। উমাশঙ্করবাবু ঐসব দিনের ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে মনে করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর মগজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এবং তিনি চোখ বন্ধ করে ফেলেন।

তাঁর স্মৃতিসমূহ পুনরায় জাগ্রত হয়ে তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেতে থাকে। ইণ্টার-মিডিয়েট থেকে এম. এ. অবধি তাঁদের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব টিকে থাকে। শিবনাথ ছাত্রাবাসে থাকতেন। তাঁরা দুজনে সাইকেলে চক্কর মারতে বেরিয়ে পড়তেন, খাটিয়ায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গপ্পো করতেন। তাঁদের রোমাঞ্চ ও উৎসাহের অভাব ছিল না এবং গোটা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সর্বদা মুখিয়ে থাকত। কখনও, মাঝে-মাঝে বেশ গরম তর্কালোচনা হত। শিবনাথের বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর, ধর্ম এবং ভূতপ্রেত মানুষের ভয়গ্রস্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। একদা তার মনে বিচিত্র ধরনের ধারণা জন্মে। সে ছোটখাটো একটা লাঠি নিয়ে রাত্রে ভূতপ্রেতের সন্ধানে শ্মশানে হাজির হত। সেখানে গিয়ে শিবনাথ প্রথমেই সজোরে অট্টহাস্য করে উঠত, তারপর চেঁচিয়ে বলত—কোনো ভূতপ্রেত এখানে আছে নাকি? আমার সঙ্গে লড়াই করার কারুর সাহস আছে? নদীর অন্য পাড়ে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। সেই সময় সে বিয়ে করবে না বলে স্থির করেছিল না

জানি কত ঘটনা কত কথা। এম. এ. পাস করার পর শিবনাথ তার গ্রামে ফিরে এসেছিল। বছর খানেক তাঁদের মাঝে চিঠিপত্রের ব্যবহার ছিল। তারপর শিবনাথের কোনও খোঁজখবর জানা যায়নি।

উমাশঙ্করবাবু নিজের অন্তস্তলে এমন এক সজীবতা অনুভব করেন, যা তিনি কল্পনাও করেননি। তাঁর মনে হয়, তিনি দ্রুত হেঁটে চলেছেন, সজোরে অট্টহাস্য করছেন এবং মুঠো তুলে তর্ক করছেন। তিনি উঠে দাঁড়ান, টেবিলের ওপর থেকে খাতা ও কলম তুলে আনেন। এক দীর্ঘ চিঠি লিখবেন বলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু চিঠি কেমন হওয়া উচিত? পঞ্চাশ বছর পরে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চিঠি লিখতে যাচ্ছেন, তার বিধি ও বিস্তার ভাল করে বিচার করে নেয়া দরকার। প্রথমত চিঠি খুবই আকর্ষণীয় হওয়া দরকার, তাতে কয়েকটা মজার ঘটনার উল্লেখ, সেই সঙ্গে কিছু কৌতুক ঠাট্টার সরস কথাও থাকবে। তিনি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন, তারপর উৎকর্ষময়, শিল্পময় এক দীর্ঘ পত্রের মুসাবিদা সম্পর্কে ভাবতে থাকেন।

তিনচার দিন ধরে তিনি কেবল ঐ চিঠির পরিকল্পনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁকে দেখে মনে হয় যেন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর ছেলের বিয়ে কিংবা পৌত্র-পৌত্রীর জন্ম ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যক্রমের কল্পনায় ব্যস্ত আছেন। তিনি কয়েকবার চিঠি লেখেন, কয়েকবার কাটেন। যতটা দীর্ঘ তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, ততটা দীর্ঘ হয় না, এমন কি ততটা আকর্ষণীয় বা সরস করতে পারে না। শেষাবধি, যা মুসাবিদা করেন, তা এক নিতান্ত গোছের চিঠিতে দাঁড়ায়—শিবনাথ যেমনটি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। বস্তুত, জীবনের এই অপরাহ্নবেলায় এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সূচনা পেয়ে এবং তাকে চিঠি লিখে তিনি খুবই প্রসন্ন ছিলেন—যেন, জীবনের এক নূতন, দীর্ঘকালীন আধার লাভ করেছেন।

তিনি বস্তুত কয়েকদিন এই ঘটনার আমেজে বিহ্বল হয়ে থাকেন। আরো কয়েকদিন ধরে শিবনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা করে। তারপর সব ভুলে যান। কিন্তু মাস তিনেক বাদে হঠাৎ শিবনাথের একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পান—

প্রিয় উমাশঙ্কর,

তোমার চিঠি পেয়েছিলাম। পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। সবকিছুই বাবা বিশ্বনাথের কৃপা। বিশেষ ঘটনা এই যে আমি কয়েকদিন যাবৎ বেনারসে আছি।

এখান থেকে দিল্লী যাব। সেখানে আমার এক ভাইপো আছে। বহুদিন ধরে বলছে। আমি ২০শে এপ্রিল এলাহাবাদের উপর দিয়ে যাব। আমার ট্রেন সাড়ে তিনটে নাগাদ সেখানে পৌছুবে। তুমি স্টেশনে নিশ্চয় দেখা করো…

তোমার শিবনাথ

উমাশঙ্করবাবু বিহ্বল চোখে ঐ চিঠি দেখতে থাকেন। সত্যি কি পঞ্চাশ বছর বাদে শিবনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব? তাঁর মনে হয়, একজন যুবক তাঁর মুখোমুখি বসে উৎসাহভরে অনর্গল কথা বলে চলেছে। পরক্ষণেই দ্রুত তাঁর দৃষ্টির সামনে এই মিলনের এক সুমধুর দৃশ্য ফুটে ওঠে…সে স্টেশনে যায়, একজন গোলগাল নাকওলা চেহারার লোক তার সঙ্গে আলিঙ্গন করে। তারা দুজনে সশব্দে হেসে ওঠে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে এবং অনর্গল কথা বলে…

—ওগো, শুনছো? তিনি উৎসাহে ডাকেন।

—ব্যাপার কি? রুক্মিণী ঘরে এসে জিজ্ঞেস করে।

—শিবনাথ আসছে।

—কে শিবনাথ?

—আরে শিবনাথ! আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। মাস কয়েক আগে তার চিঠি এসেছিল মনে নেই? তার ট্রেন এলাহাবাদের ওপর দিয়ে যাবে।

—স্টেশনে যাবে নাকি?

—কি বলছো তুমি! তিনি রেগে ওঠেন।

—আচ্ছা যেও। রুক্মিণী চুপ করে যায়।

বিশে এপ্রিল উমাশঙ্করবাবু একঘণ্টা পূর্বেই স্টেশনে গিয়ে হাজির হন। বাতাস গরম হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে শরীর ঝলসে দিতে থাকে। তিনি প্লাটফর্মের টিকিট কেটে ভেতরে যান। সাদা প্যাণ্ট সাদা কোট গায়ে, গলায় লালটাই বাঁধা—তাঁর এই চোস্ত পোশাক দেখে জিন-রেকাব সজ্জিত কোন বুড়ো ঘোড়ার কথা মনে পড়ে যায়। কোমরে তাঁর আজ কিছুটা যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু উৎসাহে সেসব বরদাস্ত করে চলেছেন। ভেতরে-ভেতরে এক অদ্ভুত ধরনের কৌতুহলময় উত্তেজনা অনুভব করছিলেন। প্রথমে তিনি ট্রেনের টাইম-টেবল বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার পড়েন, তারপর বুকস্টলে এসে কয়েকটা পত্র-পত্রিকা উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে দেখেন। শেষে ক্লান্ত হয়ে এক বেঞ্চে বসে পড়েন এবং পা-জোড়া নাড়তে থাকেন।

ট্রেন আসার পর, উমাশঙ্করবাবু উঠে দাঁড়ান, তারপর পেছনে-লাগা পাখির মত প্ল্যাটফর্মের এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় তিনি উঁকি মেরে দেখতে থাকেন, এমনকি প্ল্যাটফর্মে চলমান লোকের দিকে গম্ভীর-ভাবে লক্ষ্য করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিবনাথকে তিনি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলবেন। কয়েকজন লোককে তাঁর সন্দেহ হয়, এবং তাদের জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু উত্তর অন্য ধরনের পান।

এইভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন তিনি ফিরে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেন। ঠিক সেইসময় একজন বৃদ্ধগোছের লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়, কপালের ওপর বাঁ-হাতের তালু পেতে, ঘাড় সারসের মত উঁচিয়ে, তাঁকে কোন এক চোর-ছ্যাঁচড়ের মত লক্ষ্য করতে থাকে! তাঁর পরনে সাদা ধুতি, গায়ে ভাঁজ পড়া সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে থাকে যে তাঁর লম্বা ধড় কোন এক বিমানভেদী কামানের মত মনে হতে থাকে। চষা মাঠের মত কয়েকটা গভীর রেখা, দু তিনটে গর্ত, তাঁর মুখখানাকে অদ্ভুত হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল। কপালে লাল টিপ আঁকা। মাঝে মাঝে কিছু একটা চিবনোর মত মুখ নাড়ছিল, যার ফলে তার সাদা গোঁফ, নাক ও ঠোঁটের মাঝখানে চাপা পড়ছিল।

—তুমি উমাশঙ্কর নাকি? সেই বৃদ্ধই প্রশ্ন করে।

—তুমিই শিবনাথ?

—বাঃ বেশ দেখা হল। এদিকে আমি পাঁচ মিনিট ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দু-তিনবার তোমাকে দেখেও ছিলাম···।

—আমিও যে তোমাকে দু-তিনবার দেখেছিলাম···।

—আচ্ছা, ভেতরে এসে বসো···।

শিবনাথ উমাশঙ্করবাবুর বাহু ধরে টানে, তারপর পেছন ফিরে এগিয়ে হাঁটা দেয়। উমাশঙ্করবাবু স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁর যেন এই ঘটনায় এতটুকু বিশ্বাস হচ্ছিল না, যেন তিনি কোন উঁচু স্থান থেকে ভূমিতে এসে পড়েছেন। অট্ট-হাস্যকরা একটা হাস্যমুখর ও কৌতুকময় ব্যক্তির কল্পনা তিনি করেছিলেন এবং এই ধারণা করেই তিনি নিজের ভেতর অপূর্ব এক সজীবতা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু,

এই মুহূর্তে তাঁর সামনে যে ব্যক্তি উপস্থিত, তার শরীর ও চেহারা এত ঢিলে, কোঁচকানো ও বিকৃত যে কোনোরকমে তাকে চেনা যাচ্ছিল না।

তিনি কামরার ভেতরে ঢোকেন। একটা গোটা বার্থে শিবনাথের হোল্ডল বিছানো রয়েছে, যার ওপর চওড়াপাড়ের সাদা শাড়ি জড়ানো একজন রোগাটে, ছোট এবং খুবই হাল্কা ধরনের বৃদ্ধা বসে আছে। একটা ছোট পুঁটলী খোলার চেষ্টা করছিল সে।

—ওগো শুনছ, এই যে উমাশঙ্কর এসেছে···। শিবনাথ বলে।

উমাশঙ্করবাবু দু হাত জুড়ে নমস্কার করেন। শিবনাথের স্ত্রী টুকুর-টুকুর চোখে উমাশঙ্করবাবুকে দেখে, তারপর মাথায় শাড়ির আঁচল একটু সামনের দিকে টেনে দেয়।

—ভালো করে বসো উমাশঙ্কর। ট্রেন আধঘণ্টা পরে ছাড়বে। শিবনাথ বলে।

দুই বন্ধু জানলার ধারে বার্থে পরস্পরের দিকে মুখ করে বসে পড়েন। বসেই দুজনে দু-চার বার চোরা চাউনিতে এক-অপরকে দেখেন।

—প্রভুর কৃপায় তোমার সঙ্গে দেখা হল। সব ঠিক আছে ত? আচ্ছা, এবার বল তুমি কোন বছরে রিটায়ার হলে?

তারপর তাঁদের দুজনের মাঝে দ্রুত ও ছাড়াছাড়াভাবে এমন অপূর্ব কথাবার্তা ঘটতে থাকে, যাতে কেবল তুলনামূলক বিবরণের তত্ত্ব বেশী ছিল···রিটায়ার কবে হলে? সেসময় মাইনে কত ছিল? ছেলেপেলে কটা? মেয়েদের কোথায়-কোথায় বিয়ে দিয়েছ? গাঁয়ে কত জমি আছে? বৌরা কেমন? নাতি-নাতনী ক'জন? তারপর, সে নিজের ছেলের প্রশংসা করে। মাঝে মাঝে তাদের কথা ছিঁড়ে যায় যখন শিবনাথ পেছনে মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দ্রুত ভুনভুন্ করে এবং নাকি স্বরে কথা বলতে থাকে। কেবল 'কানপুর' শব্দ সেই কথায় ধরা পড়ছিল।

সহসা শিবনাথ 'এক্ষুণি আসছি' বলে উঠে দাঁড়ায়, এবং বাথরুমের দিকে চলে যায়। তারপর, দরজার কাছে গিয়ে, মাথা বেঁকিয়ে উঁচু করে দু দিক চেয়ে দেখে শেষে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ে, বলে—উমাশঙ্কর, তোমার সঙ্গে কখনও সেই ঘোড়াওলার দেখা হয়েছিল? মনে পড়ে?

উমাশঙ্করবাবু হেসে ওঠেন। হ্যাঁ, শিবচরণ নামে সেই সহপাঠীর কথা তাঁর এখনও মনে আছে, স্কুলের মাঠে একদা অশান্ত টাট্টুর-ওপর থেকে মাথা নিচে অবস্থায় পড়ে গেছিল, যার ফলে তার নাম 'ঘোড়াওলা' রাখা হয়েছিল।

তারপর শিবনাথ গম্ভীর হয়ে কিছুটা আফসোসের গলায় বলে, জানো, সে কবে মারা গেছে! গাঁয়ে চাষবাস করত। কে একজন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা কেটে ফেলেছিল…।

—হে ভগবান! বেশ জলি ছেলে ছিল। য়ুনিভার্সিটির আশিক আলিকে মনে আছে? কি ব্রিলিয়ান্ট ছিল লেখাপড়ায়। একবার আলীগড়ে ওকে আমি দেখেছিলাম। ন্যাংটো হয়ে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সবার কাছ থেকে বিড়ি চাইত…।

—আমিও শুনেছিলাম ও পাগল হয়ে গেছিল। জানি না, কে যেন বলেছিল…

—আচ্ছা, সেই ছেলেটার কথা মনে আছে, যাকে আমরা মশা বলতাম? বেঁটে হয়েও দারুণ ফুটবল খেলত!

—সেও মারা গেছে।

হঠাৎ শিবনাথ জানালার দিকে চেয়ে দেখে। বাইরে এক পেয়ালা চা এনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। 'এনেছ' বলে শিবনাথ তার হাত থেকে কাপ তুলে নেয়, উমাশঙ্করবাবুকে বলে—উমাশঙ্কর, আমি একটু চা খেয়ে নিচ্ছি।

তারপর শিবনাথ পেয়ালা থেকে পিরীচে চা ঢেলে খেতে থাকে। মুখ থেকে সুরুৎ সুরুৎ বা সরাৎ-সরাৎ মাঝে মাঝে চট্‌চট্ শব্দ বেরোতে থাকে। উমাশঙ্কর-বাবু তির্যক দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে দু-তিনবার দেখে তারপর সামনে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে থাকেন।

চা শেষ হলে শিবনাথ হাত দিয়েই মুখটাকে দু-তিনবার মোছে। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকায়, স্ত্রী তখন সামনে একটা প্লেটের ওপর লুচি, তরকারী ও নোনতা খাবারের দিকে ইশারা করতে থাকে।

—উমাশঙ্কর, আমি একটু খেয়ে নিচ্ছি…দু মিনিট লাগবে।

শিবনাথ উঠে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসে। কিছুক্ষণ ধরে হাপুস-হুপুস বিচিত্র ধরনের শব্দ শোনা যেতে থাকে। উমাশঙ্করবাবুর চোখেমুখে, কেন জানি, একধরনের শক্ত অপরাধের ভাব ফুটে ওঠে। তবুও সে সৌজন্যতাবশত হাল্কা ধরনের হাসি হাসতে থাকে। সামনে জানালার বাইরে আকাশের একটি ছোট অংশ দেখা যায়। গরম বাতাস ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। জানে না, কতক্ষণ ধরে সে এভাবে ঘাড় শক্ত করে সামনে দেখতে থাকে! শিবনাথ কুলকুচো করে যখন তাঁর কাছে এসে বসে পড়ে তখন তিনি দৃষ্টি ফেরান।

—তো, উমাশঙ্কর··· । কিন্তু, শিবনাথের কথা মুখের ভেতরেই রয়ে যায়। কিছু একটা মনে পড়তে, জানালার বাইরে মাথা বের করে দেখে, তারপর চমকে উঠে বলে—একি! গ্রীন সিগন্যাল হয়ে গেছে যে! উমাশঙ্কর, নেবে পড়, শীগগির নেবে পড়। চিঠি দিও··· ।

উমাশঙ্করবাবু নমস্কার করে নিচে নেবে পড়েন। ট্রেন চলতে শুরু করে, বেশ দ্রুতবেগে। তিনি ততক্ষণ অবধি চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন, যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তারপর, ধীরে ধীরে ফেরত রওনা হন। এক ধরনের বিচিত্র ক্লান্তি, শ্রান্তি ও অনুশোচনা অনুভব করেন। তাঁর কোমরের যন্ত্রণা বেড়ে গিয়েছিল। এক ব্যর্থতার ভাবনা তাঁকে ব্যাকুল করতে থাকে। তাঁর মনে হয়, এই সাক্ষাৎকারে কেবল সময় ও পয়সার ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হল না। তিনি সকাল থেকে অস্থির ছিলেন, এক টাকা খরচ করে রিক্‌শায় এখানে এসেছেন, প্ল্যাটফর্মের টিকিট কিনেছেন, এক দেড়ঘণ্টা এখানে লু'এর গরম হলকা সহ্য করেছেন, আবার এখন একটাকা-পাঁচসিকে খরচ করে ফিরে যাবেন। এবং সবকিছু তিনি এমন এক বন্ধুর জন্য করেছেন, যে পঞ্চাশ বছর পর দেখা হওয়ার পর এককাপ চা'য়ের জন্য জিজ্ঞেস করে নি। সত্যি তাঁর তিনটাকা একেবারে নষ্ট হল। ইডিয়েটটা সাধারণ ভদ্রতাবোধও ভুলে গেয়েছে। এত অধঃপতন হল কি করে? এত পাল্‌টে গেল কি করে? সে নিজে কি পাল্টেছে? উঁহু! বন্ধুত্বের এই সোনালী বিভ্রম খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছে এবং তিনি মনে-মনে স্থির করেন, আর কখনও শিবনাথকে চিঠি দেবেন না।

তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করে ইতস্তত দেখেন, তারপর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে হাঁটতে শুরু করেন। গেটে প্ল্যাটফর্মের টিকিট জমা দেন, বাইরে বেরিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত ও হৈ-হল্লার মাঝ দিয়ে অপেক্ষমাণ রিক্‌শার দিকে এগিয়ে যান।

যাত্রা ॥ জ্ঞানরঞ্জন

দিনটা অন্যান্য আটপৌরে দিনগুলোর মতোই। দুপুরের খাবার খেতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছি। সর্বসাধারণী পথে নয়—মোরম্-এর লাল রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটা প্রকৃতি-সম্পদসমৃদ্ধ। ওদিকটায় বস্তিটস্তি নেই।

ওদিক থেকে মেস-এর কোনো অফিসার ফেরে না। যদি ফেরে তাহলে বুঝতে হবে—আইনভঙ্গের মতো একটা অপরাধ করে বসলো সে। আমার ধারণা : এখন কোথাও কেউ ফালতু ভাবুক নেই।

আমি মাঝে-মধ্যে ওদিক দিয়ে ফিরি। যেমন আজকেই। কিন্তু তা শুধু তাড়াহুড়োর দরুন কিংবা ভুলে নয়—সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত।

আকাশ ভর্তি মেঘ। বেশ কয়েক দিনের পুরনো। বৃষ্টি-টৃষ্টি নেই। মেস-এ যে-যেখানে আছে, সমানে চেঁচাচ্ছে। কয়েক জন স্নান-সাঁতারের জাঙিয়া পরে এসেছে। ফাজলামি শুরু করেছে। এ উত্তেজনা 'উইক-এণ্ড'-এর। আমি আমার স্কুটার সামলাবার জন্যে বেয়ারার দিকে বেপরোয়াভাবে ঠেলে দিলাম। সাধারণত আমি এমনটা করি না। কিন্তু শনিবারের কথা মনে পড়তেই আমার মধ্যেও খুশির একটা হালকা বুনোমি জ্বলে উঠলো। ব্যস, আমার মধ্যেও বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করবার জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

আমি মহল-কাঁপিয়ে-দেওয়া শব্দে চিন্নুকে মনে করলাম। অবশ্য, এখন ওর কাছে আমার কোনো দরকার নেই। আসলে এমনিভাবে আমি কিছু লোককে জানান দিচ্ছি যে আমি সশরীরে এসে গেছি।

একটু পরে বেয়ারা এসে টেলিগ্রাম দিল। আমার মধ্যে তেমন কোনো ব্যস্ততা মাথা চাড়া দেয়নি। সামান্য মনঃক্ষুন্ন এই কারণে হয়েছি যে আজও কৌমুদীর চিঠি এলো না!

আচ্ছা টেলিগ্রামটা কার হতে পারে? কিসের জন্যে? আমি আমার অনুমান বাজিয়ে দেখলাম। আজ আমার জন্মদিন নয়—মিতুলেরও না। আর, কৌমুদী? ওতো মাত্র তিন মাস হলো জন্মেছে। আবার ন মাস পরে জন্মাবে। এক মুহূর্তের জন্য আমি আমার স্ত্রীর মিষ্টি চেহারাখানার ওপর থমকালাম।

আমি টেলিগ্রামের খাম ছিঁড়ে ইউনিফর্মের বোতাম খুলতে লাগলাম। চিন্নু এখনো এলো না! আমি ওকে গালাগাল দিলাম। গালি-গালাজগুলো গীতিবদ্ধ। আমরা যদি বেয়ারাদের সামনে লজ্জাশরমের বালাই টেনে আনি; তাহলেই সেরেছে!

গালি-গালাজগুলোকে গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকলাম। চোখে-মুখে জল ছুঁড়লাম এবং নাকে মুখের সঙ্গে লেপ্টে পড়ে থাকা গোটাকয়েক ফোঁটা ছাড়া জল প্রায় সবটুকুই পড়ে গেল। পড়ে যেতেই টেলিগ্রামটা পড়লাম। ওটা পড়তে বড়জোর সেকেণ্ড তিনেক সময় লাগতে পারে। পরের বার এবং তারও পরের বার পড়তে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। আমি কল্পনাই করতে পারিনি যে ওটা একটা মৃত্যুবহ টেলিগ্রাম হতে পারে।

আয়নায় আর নিজেকে দেখতে পেলাম না আমি। হয়তো এমনটা সবাই করতে পারবে না। পলক পড়তে-না-পড়তে আমার চোখ-মুখের রং বদলে গিয়ে নিতান্ত করুণ হয়ে পড়লো। মাথায় খেললোই না যে এখন আমি কী করি? এহেন ঘটনা এর আগে আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। আমার জন্মের পর থেকে একে একে ঊনত্রিশটা বছর কেটে গেছে। আমাদের বংশে সবই লম্বা পরমায়ু পেয়েছে একথা আমি অনেকবার শুনেছি: আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন একশো বছরও বেঁচেছেন। যে কোনো পরিবারের ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমার মনে আছে বিবাহ সংক্রান্ত চিঠি-পত্রে এ তথ্যটুকু বিশেষভাবে পরিবেশিত হতো।

টেলিগ্রাম পড়ে আমি বিশ্রীভাবে কেঁপে উঠলাম। তার প্রতিক্রিয়া তীরের মতো এগিয়ে চললো। কারো সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হবার আগেই চুপচাপ, আমি আমার মেস-এর একটা নির্জন কুঠুরিতে ঢুকে পড়লাম। শুয়ে পড়াটাই ওসময় আমার কাছে সহজ এবং সান্ত্বনাস্বরূপ মনে হলো।

আমি সটান শুয়ে পড়লাম। মাত্র মিনিট দশেক পর্যন্ত অতি অবশ্যই, কুঠুরিময় পায়চারি করতে করতে কারুণিকভাবে রাগতে থাকলাম। বেশ কয়েক বছর পরে পড়ন্ত দুপুরে শুলাম। নিষ্কর্মা দিনে শুতাম।

কোথাও যাবার ইচ্ছে জাগলো না। নির্জন ঘরটার মধ্যে ফুলে ওঠার পর তো মোটেই নয়। আশ্চর্য, সেই অপয়া হোটেলটাতে পর্যন্ত যেতে মন চাইলো না, যেখানে বিরহ এবং হতাশাক্রান্ত দিনগুলোতে হাজিরা দেওয়া আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হতো এবং যেখানে বিশুদ্ধ গ্রাম্য সুরাও সুলভ ছিল। হয়তো আমার মস্তিষ্ক টের পেয়েছিল যে ও মুহূর্তে কোনো অভ্যস্ত-অপয়া জায়গা আমার আর কিছুই করতে পারবে না। অতএব নির্জলা ঘুম এলো।

এতে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে আমি দুঃখ এবং পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতির প্রভাবটুকু যথাসম্ভব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে লেগে পড়েছি। এতে এও বোঝা যায় যে আমি নিজের সম্বন্ধে আগের চাইতে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছি। জীবনে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে থাকে, যাতে বুঝতে পারা যায়—জীবনের জট কতদূর খুলেছে অথবা জীবন কতটা জানা হয়েছে!

ঘুম থেকে ওঠার পর আশেপাশের জায়গাগুলো বেশ নির্জন এবং নিবিড় মনে হলো। মৃত্যুর স্মৃতি, কুঠুরি, কুঠুরির জিনিসপত্র—যেন সব কিছুই আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। স্বয়ং নিজের সম্পর্কেই একটা গুমোট রাগ সৃষ্টি হয়েছে। অপয়া ভাবটা ডুব-সাঁতার কেটে ভেতরে সেঁটে রয়েছে। ভাবছি: হয়তো বজ্রহারামি এবং শক্তসমর্থ লোকেরাও এসব অবস্থায় ব্যথা অনুভব করে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে—না আমার বজ্রহারামিদের কথা জানা আছে, না জানা আছে ভয়ানক দুঃখ ব্যথার কথা।

আমি হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠলাম। চোখে আঠা-আঠা ভাব। গা-গতর হালকা ঠাণ্ডা। তক্তপোশের পাশে বসে বেশ কয়েক মুঠো সময়ের বাজে খরচ করা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় এলো না। কোন্ কাজের শিংয়ে যে দড়ি বাঁধি—মগজে ঢুকলো না। ড্রিংক করি? এখানে কেউ দেখবেও না। গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করি? কিংবা চটুল গান গাই?

না, কিচ্ছু হলো না এবং আমি স্থাণুর মতো চুপটি করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে কড়া ধরনের নেশা করবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু হাতের কাছে ওসব কিছু না থাকার দরুন ইচ্ছেটার অকাল মৃত্যু ঘটলো। তারপর পঁচিশ পঞ্চাশের শতকিয়া পড়া পর্যন্ত সময়টুকু বেশ শান্তভাবেই কেটেছে। তারপর আবার সেদিন বিকেলের সেই গাড়িখানার স্মৃতি জেগে উঠলো, যাতে চড়ে আমি অনেক বার

ঘোরাঘুরি করেছি এবং যেখানা সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলবার আগে এবং সূর্যাস্তের মধ্যে পুলটা পেরিয়ে যায়। পুলটার নিচে একটা মহতী নদী বয়ে চলেছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে যখনি আমি উদাস কিংবা দুঃখী হয়েছি—তখন রেলগাড়ি, বিকেল, প্রদীপ, পুল, নদী এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অবশ্যই ঘটেছে।

আমি জোরাজুরি করে উঠে নির্জন কুঠুরি থেকে বাইরে বেরোলাম। কুঠুরিটার কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো।

আকাশভর্তি হলদে রঙের ঝড়। তার নিচে। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও আশেপাশে লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। একটা ভ্রম মাথা চাড়া দিলো—কাদের গলা দিয়ে যেন 'বাঁচাও, বাঁচাও!'-এর টিপস্ত শব্দ ভেসে আসছে। একটু লক্ষ্য করে শুনতেই শব্দরা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সম্ভবত এ শব্দ নৈঃশব্দ্যেরই প্রতিধ্বনি। কিন্তু আশ্চর্য, এতক্ষণের মধ্যে কেউ আমার খোঁজ করতে এলো না। ভাবলাম : বাইরে যাই। এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে দেখি—চরম দুর্ঘটনাটি ঘটে বসেনি তো আবার? এ ভূখণ্ডটুকু কোনো ভৌগোলিক সংঘাতে আলাদা হয়ে যায়নি তো?

তখনো পর্যন্ত আমি নিজেকে বিপন্মুক্ত মনে করতে পারিনি। মৃত্যুর স্মৃতিটা ঘাপটি মেরে বসে আছে। দুয়েক মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম : আমি আমার শরীরের পরীক্ষা নেবো। আমাকে কেউ দেখছে না। এখানকার সব কটি বাড়ি দোতলা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার সামনে নিবিড় ল্যাণ্টেনিয়া। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বোঝা গেল—আমার ইন্দ্রিয়গুলো যথাস্থানে আছে এবং যথারীতি কাজ করছে।

সত্তা সম্পর্কে পাকাপাকিভাবে নিশ্চিন্ত হতেই আমার মন আবার প্রধান স্থিতির চারপাশে পাকসাট খেতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম—ওঁর মৃত্যুসংবাদ পাবার পর দুঃখ, নিস্পৃহা এবং নিঃসঙ্গতা যতই অনুভূত হোক না কেন, আমি কিন্তু এক লহমার জন্যেও কাঁদিনি বা ফোঁপাইনি। একটা হাল্‌কা ধরনের চিন্তা মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার মনটা আস্তে আস্তে আবার পাথর হয়ে যাচ্ছে না তো? মনের মতো কোমল জিনিসটার পাথর হয়ে যাওয়াটা কিন্তু দারুণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে!…তারপর জীবনের বেশ কয়েকটা ঘটনা মনে পড়লো। ওগুলো প্রায়ই মনে পড়ে। আমার জন্যে ওগুলো যেন উদাহরণের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আমার বেশ ভালোভাবে মনে আছে—কয়েক বছর আগেও অমনটা হতো

না। নিজেকে একটু বাজিয়ে নিতেই কান্না পেতো কিংবা মনস্তুষ্টি ঘটতো। অমন অবস্থা দু-চারবার এমনিই এসেছে। ডুবন্ত সূর্যটাকে একা-একা, চুপচাপ, দেখলে···শেষপর্যন্ত দেখতে থাকলে মনটাও ডুবে থাকতো এবং মন-মেজাজ ধসে পড়তো। ছেলেবেলা থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর টিকে থাকাটাকে হাঁদা গণেশের মতো সত্য ভেবে আসছি শুধু।···বেশ কিছুক্ষণ পরে বোধগম্য হলো—প্রকৃতিবিমুখ লোকেরা এত সুখী কেন?

দুঃখ এবং সংস্মৃতির মধ্যে অতি অবশ্যই কোনো-না-কোনো যোগসূত্র রয়েছে। সেই কারণেই, হয়তো, জীবনের দুয়েকটা ঘটনা আপনা-আপনিই মনে পড়ে গেল। মনে হলো, যেন, এ সময় আমি কাঁদবার জন্যেই উঠে পড়ে লেগেছি এবং নিজের কাছে আমি নিজে একজন পরীক্ষকের পরিচয় নিয়ে হাজির হয়েছি।

ইস্, সেই দিনটা—যেদিন আমি শেষবারের মতো আমার মনঃকষ্ট থেকে আলাদা হয়েছিলাম!

সেদিন আমি বেশ কয়েক কাপ কড়া কফি খেয়েছিলাম। আরেকটু হলে কেঁদেই ফেলেছিলাম আর কী। হ্যাঁ, ওটাকে কান্নাই ধরে নিন। আজ, অবশ্য সন্দেহ উঁকি মারছে—সে কান্না কোনো শারীরিক অসুবিধের দরুন আসেনি তো আবার? কেন না, পরে আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিলো এবং ডাক্তারের কাছেও ছুটতে হয়েছিলো। সে সময় একথা ভাবা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরে নিজের ওপর মুঠো মুঠো বিতৃষ্ণা ছিটিয়ে মন্তব্য করেছিলাম—"জীবনে প্রেমী হবো না—কভু!"

এরই সঙ্গে দ্বিতীয় ঘটনাটাও মনে পড়লো। হাওয়া বইতেই, আস্তে আস্তে ঝড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো। তবু তা মাটি থেকে দু-আড়াইশো ফুট ওপরে দেখা যাচ্ছিলো। এই দ্বিতীয় ঘটনার স্মৃতিটুকু আমার কাছে প্রবল মনে হচ্ছিলো। ভাবছিলাম—ইস্, সেও একটা দিন ছিলো···।

সেদিন মার এক্স্রে-প্লেট আনবার জন্যে জেকব্স ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস ডাক্তারের চেম্বারেই কেঁদে ফেলিনি!···মন-মেজাজ বিগড়ালো। সাইকেলের ব্যালেন্স অবাধ্য। কিছুক্ষণের জন্যে শরীরে কম্প দেখা দিলো এবং দাঁতগুলো কড়মড়িয়ে উঠলো।···ঘোষ মার্কেট-এর পেছনকার পেচ্ছাপখানায় ঢুকে কেঁদে, চোখ-মুখ মুছে বাইরে বেরোলাম।

…রাস্তায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বললে—'পান খাবি?'

বললাম—'মা'র টি-বি হয়েছে!'

জানি না ও কী ভাবলো, কিন্তু, যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালো! তারপর আবার পাড়ার একজন চেনা-জানা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলেন—'ওদিকেই যাচ্ছ তো?'

আমার বেশ মনে আছে—ওকেও একই কথা বলেছিলাম—'মা'র টি-বি হয়েছে!'

পরে বুঝেছিলাম—তখনকার সে দুঃখ আমাকে কী ভাবুক অর্থাৎ নির্বোধ বানিয়ে ছেড়েছিলো! সে সময় তো আমি ভাবের এমন গভীরতায় ডুবেছিলাম যে সত্যি সত্যি যদি মা মরেই যায় তাহলে আমি আকাশ কাঁপিয়ে কাঁদবো। মাথা ফাটিয়ে ফেলবো—এমন কী, শেষপর্যন্ত পাগল-টাগল না হয়ে যাই।…আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানোও লাগতে পারে। সবাই তখন আমার মমতা এবং আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কতো কথা বলবে!

তখনকার দিনে আমার মধ্যে মনের পরীক্ষা নেবার ভীষণ ইচ্ছে জাগতো।

যাক, সে স্মৃতি আমাকে পুরোপুরিভাবে ভাববিহ্বল করতে পারছে না। যথেষ্ট পুরনো হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেকবার রিপিট করাও হয়ে গেছে। এখন ওসবের প্রতিক্রিয়া ঠিক ততটুকুই হয়, যেমন, লোহার পাইপ বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময় জল তার একটু জোলো স্মৃতি রেখে যায়।

সে স্মৃতি-প্রসঙ্গ দুটো ছাড়া অন্য কোনো কথাই মনে পড়লো না—সময় কাটানোর জন্যে যার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দেখছি দুঃখের দিন খুব কমই এসেছে জীবনে অথবা না আসার মতোই। চারদিকে এখনো যথেষ্ট লোক আছে, যারা এই দুঃখের সাহায্যেই ভাগ্যশালী হয়ে পড়েছে।…সে সুখের অতীত কোন্ পুজোয় লাগবে যা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য?…একেই দুর্ভাগ্য বলে।

ভীষণ অদ্ভুত এবং শক্তিশালী সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হচ্ছে আমাকে। আমি এভাবে লতিয়ে উঠিনি। কেন জানি এ কথাটা আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, যে, আমার জন্মাবার আগে আমাদের পরিবারে যে কোনো কারুর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের পরিবারের প্রত্যেকেরই দীর্ঘায়ু, গৌরবর্ণ এবং সুপুষ্ট শরীর। পথে-ঘাটে শবযাত্রা দেখে কেউ কিচ্ছু ভাবে না। সবাই বেপরোয়া—আমুদে। বাড়ির আমরা সব কটি ছেলে লাল ল্যাঙোট পরে হাডুডু খেলেছি।

'উনি' সব সময় রেফারিগিরি করেছেন এবং সিটি বাজিয়েছেন। খেলা শেষ হতেই ওঁর আদেশে সবার জন্যে, শক্তিকারক গরম গরম হালুয়া তৈরী হতো।

না, আমার মনে সে গরম হালুয়ার স্মৃতি জাগেনি। জেগেছিলো সিটি-বাজাতে-থাকা রেফারিটির কথা। থেকে থেকে আমার ভেতরে কী যেন একটা জিনিস চাপ সৃষ্টি করলো। আমি তার সর্বনাশ করে দিতে চাইলাম। আমার মনে উন্মাদনা মাথা চাড়া দিলো—আমি ওটাকে সাবাড় করে দেবো! আমি যদি এটাও না করতে পারি, তাহলে করবোটা কী? 'উনি' আমার মধ্যে একটা পবিত্র কলধ্বনির মতো হয়ে রয়েছেন। কিন্তু, আমাকে পিসে ফেলে 'উনি' যে শিখণ্ডী গড়বেন—তা মোটেই সম্ভবপর নয়। তা করবেনও না!

এতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই যে ওঁর শরীরটা ভীষণ আকর্ষক এবং প্রাণোচ্ছল ছিলো। উনি শৌখিনি করতেন—বাগানবাড়িতে খানা-পিনা করতেন। দেখতে ভীষণ সুন্দর ছিলেন উনি। বার্ধক্যের দিকে এগোতে পেয়েও বহুলোক এত সুন্দর হতে পারেন—কিন্তু—তাঁরা সংখ্যায় কম। উনি হয়তো সুখেই মরেছেন। আমাদের বাড়ির অন্যান্যরা কিন্তু 'হায়-হায়' মরা মরবে। কেউ বারুদের ধোঁয়ায় দম আটকে মরবে (হয়তো আমিই), কেউ না খেয়ে মরবে, কেউ মোটরগাড়ির তলায় আদা-ছেঁচুনি হয়ে মরবে এবং কেউ দুঃখে শুকিয়ে আমসি হতে-হতে।

ধীরে ধীরে আমার মস্তিষ্ক চৌকস হতে শুরু করলো। মনের মধ্যে একটা ধারণা শেকড়-বাকড় বসাতে লাগলো—যদিও কিছু লোকের জন্যে ওঁর মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে এ ঘটনার কোনো সম্পর্কই রইলো না আর। সম্পূর্ণ ঘটনাটা, এখন, হাত ফসকে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাওয়া একটা পাখির মতো। আসলে এমন সব লোকও আছে, যারা দুর্ঘটনা থেকে বেশ কিছু আখের গুছিয়ে নেয়।··· অনেকক্ষণ ধরে একটানা মাথা ঘামাবার পরেও আমার মাথায় খেললো না যে পরলোকগত আত্মার প্রতি এখন কী করি? উনি নিতান্ত সুস্থ জীবনের প্রতীক ছিলেন। সে শ্রদ্ধাতর্পণটুকু ছাড়াও কিছু কিছু ঘরোয়া স্মৃতি ছিলো যা ঘনিষ্ঠ এবং পুরানো হবার দরুন মনটাকে পুলকিত করছিলো।···ভাবতে ভাবতে আমি বিশ্রীভাবে নেতিয়ে পড়লাম। ক্লান্ত হওয়াটা, আমি লক্ষ্য করেছি, সব সময় আমাকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে।

চোখে মুখের জড়িয়ে আসা ভাবটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। চা-সিগারেট কিছু জোটেনি। মুখখানাও পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পারিনি। মাঝে

মাঝে ওঁর স্মৃতি সমানে ডানা ঝাপটিয়ে চলেছে। শরীরগত পূর্ণ সচেতনতা কখন ফিরবে, কে জানে? যা-ই হই না কেন, আসলে আমিও তো একটা মানুষ—নিজেকে বোঝালাম। আমার মধ্যেও ভালোবাসার আকুতি জাগে। দুঃখ আমাকেও কাঁদায়।…এতে হতাশ হবার কী আছে?

কুঠুরিতে ফিরে এসে দেখলাম—স্কুটারগুলো নেই। বন্ধুরা হয়তো আমাকে খুঁজে-খুঁজে চলে গেছে। কয়েক মুঠো কথা ভাবতে ভাবতে লাইট জ্বালালাম—ছুটির ব্যবস্থা করা দরকার।

কুঠুরিতে একা দাঁড়িয়ে। চেস্টড্রয়ার-এর ওপর রাখা টেলিগ্রামটির ওপর নজর পড়লো। তার আগে অসংখ্য বার কুঠুরিখানার মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে একা দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সেদিনকার মতো মনের অবস্থা কখনো অনুভব করিনি। মনে হলো—কুঠুরিখানা আমার নয়—অন্যের। এবং খেঁকিয়ে উঠতে চাইছে!

ছুটির জন্যে টেলিফোন করবার আগে মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জাগলো। কিন্তু, দৃঢ় নিশ্চয় করলাম ফোনে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করবো না। নিজেকে অন্যান্য বিপদাপদের (যা নাকি সভ্যতার পথ বেয়ে আসে) উপযুক্ত পেলাম না। অফিসারকে জানালাম—হঠাৎ আমার বোনের বিয়ে হতে চলেছে। সুতরাং আমাকে যেতেই হবে। ছুটির কাগজপত্র আমি আমার ঘরে রেখে যাচ্ছি। অফিসার দয়া দেখালো এবং তুচ্ছ কারণেও ছুটি মঞ্জুর করলো। হয়তো অতিমাত্রায় মাল গিলে ফেলেছে। টেলিফোনে অর্কেস্ট্রার আওয়াজ এবং হৈচৈ ভেসে আসছে। ক্লাব তখনো হয়তো চরম অবস্থায়। আমি চিল্লুকেও বললাম না। মৃত্যু-সংবাদ জানানোটা আমার কাছে লজ্জাস্পদ ঠেকলো। এসব মুহূর্তে মানুষের চোখ-মুখ ঝট করে করুণ হয়ে যায়। আমার মনে হলো—মৃত্যু, অসুখ এবং দুঃখ জানানো আর 'সহানুভূতি দাও, সহানুভূতি দাও।' বলে চিৎকার করার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। তাছাড়া আমার মনে সন্দেহও দেখা দিলো যে চিল্লুর কাছে মৃত্যু-সংবাদ জানাতে গিয়ে আমি আবার নিজেই ভাবুক না হয়ে পড়ি!

আগে একবার ভাবলেও আমি কিন্তু ক্লাবে যাইনি। মৌতাত-মুহূর্তে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। যদিও ওখানকার সবাই সহানুভূতি এবং সমবেদনা দেখাতে পটু এবং এ ব্যাপারে কেউ এতটুকু আনাড়ী নয়—তবু নিম-সত্য হলো: আনন্দঘন মুহূর্তে কেউ মর্মান্তিক সংবাদ শুনতে রাজী নয়। একটু মুক্ত হতেই ওরা বলাবলি

করবে অথবা ভাববে : 'ওয়াল্ড´ নেভার ডাইজ !' তারপর হোহো শব্দ করে গেলাস উঠিয়ে বলবে—'চিয়ার্স !'

টিকিটের জন্যে এক কাঁড়ি টাকা দেবার সময় নয়, কম্পার্টমেন্ট-এ বসবার পর আমার মনে হলো—ইস, কী লম্বা যাত্রা !

চিন্তা হলো—পৌছুতে পৌছুতে আবার এত ক্লান্ত হয়ে না পড়ি, যাতে শোকের স্বাভাবিক চিহ্নগুলোই মুছে যায়। আমি জানি, এই চিহ্নগুলোই হচ্ছে আসল কষ্টিপাথর। এবং গায়ে-পড়া দুঃখটুকু জীইয়ে রাখবার আমার কাছে একটি মাত্র পথই আছে—আমি আমার মনের ওপর মালপত্র, লোকজন এবং পরিবেশের প্রভাব পড়তে দেবো না !

আমি নিজের এবং মালপত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ফেললাম। আলসেমি জড়ানো চোখে প্রতিটি দৃশ্যবস্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম। এসব সময় চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকার একটা বড় লাভ হচ্ছে—অনায়াসে আমরা সংবাদ-ভাণ্ডার হয়ে যেতে পারি, যার দৌলতে কেউ আমাদের ঠেলে চিৎ করে ফেলতে পারে না। আমি বেশ ভালোভাবে জানি—শোক প্রসঙ্গ শেষ হতেই বাড়ি এবং শহরের লোকেরা আমার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদিককার মরশুম, ট্রেনের ঠেলাঠেলি জিনিসপত্রের দরদাম এবং ফসলপাতির কথা অতি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে।

সব কিছু গোছগাছ করে নিতেই আমার মনে আবার ওঁর কথা ভাসলো। তখন যাত্রী অথবা গাড়ি কোনোটাই বিরক্তিকর ঠেকলো না। কিছুক্ষণ আগেও ট্রেনের মধ্যে নিজেকে সুরক্ষিত করে নেবার একটু-আধটু উৎসাহ ছিলো। এখন হাল্‌কা নিরাসক্তি দেখা দিয়েছে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার প্রভাব পড়ে থাকবে—কিন্তু, আমার পক্ষে তা পরীক্ষা করে দেখা সম্ভবপর নয়। তাহলে কী সত্যি সত্যি তিনি নেই ?···একটা ফালতু কথা ভাবতে শুরু করলাম। আমরা সবাই কখনো-সখনো এইভাবেই ভাবি।

উনি বাস্তবিকই নেই। ভাইয়ের পাঠানো টেলিগ্রাম মিথ্যে হবার নয়। আমার ভাই অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং বিশুদ্ধ গান্ধীবাদী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ নিয়ে মাথার মধ্যে একটা নপুংসকভাব ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। গান্ধী-বাদী মানুষটার বিশ্লেষণ আমি রাজনৈতিকভাবে করতে পারলাম না।

এ জাতীয় ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই ওঁর উদ্দেশে বিড়বিড় করলাম—উনি আমার দৃষ্টিতে একজন মহৎ লোক। সে ভাবনাটুকুর পেছনে

আবেগ, মমত্ব এবং স্নেহ জড়িয়ে আছে—শুধু মাত্র নিরপেক্ষ মতামতই নয়। সংবাদপত্র মারফত গুণগান গেয়ে জানিয়ে দেওয়া লোকদের ছাড়া আমি আমার জীবনে, যত লোক দেখেছি তাদের মধ্যে উনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হ্যাঁ, বাস্তবিকই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজেকে বারবার বোঝালাম।

শহর এখনো অনেক দূর। তবু সে দূরত্ব কিছুটা কমেছে। দূরত্ব যতই কম হোক না কেন, ওখানে পৌঁছোবার পর, কিন্তু, সে মুখ—সে ডাক শুনতে পাবো না। পৃথিবী থেকে কেটে পড়বার আগে আমার মতে ভীষণ হৈচৈ হওয়া উচিত। চেঁচামেচি, ছুটোছুটি এবং ভিড় থাকতেই ভিড় বাড়িয়ে যাওয়া দরকার। আর যাওয়াটা যদি নিশ্চিত হয়ে গিয়েই থাকে তাহলে টুপ করে সরে পড়া উচিত। উনি কিন্তু চুপচাপ চলে গেলেন। আমি বুকের মধ্যে এক রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া টানলাম।

ভালোবেসে ওঁকে সবাই 'দামোদা' বলে ডাকতো।

আমাদের বাড়ি থেকে কুড়ি পা দূরে কেমিস্ট-এর দোকান। ভাবলাম—ওখান থেকেই হয়তো ওষুধ আনা হয়েছে। তার এ পাশে ধোপাখানা, যেখানে শুধু কাপড়-জামা প্রেস করা হয়। আর, তারও এদিকে পান-সিগারেটের এবং সোডার দোকান। এর আগের বার যখন গিয়েছিলাম—সামনের দিককার রাস্তাটা মেরামতের জন্যে খোঁড়া হচ্ছিলো।···এসব কথা ভাবতেই একটা খুদে রোমাঞ্চ-লহরী সৃষ্টি হলো যে শীগগিরই সেই নতুন বানানো রাস্তায় চলাফেরা করবার জন্যে পৌঁছাচ্ছি!

আমাদের বাড়ির সামনে একটি আমুদে পার্শী বুড়ি থাকে। তার কথা ভোলা যায় না। আমি জানি—সে এখন কী করছে। হাতঘড়ি দেখতে দেখতে ভাবলাম। এসব কথা ভাবা প্রিয় খেলার মতো ইন্টারেস্টিং যে কোন্ লোকটা তার ঘরের এখন কোন্ জায়গায় আছে এবং কী করছে? ভদ্রমহিলাটির বাংলোবাড়িতে 'কুকুর হইতে সাবধান'-এর সাত-আটখানা তক্তি আছে। সন্দেহ নেই যে তার বাড়িতে কুকুরও আছে। তক্তিগুলোও ছোটোখাটো সাইনবোর্ডের আকারের চেয়ে কম নয়। এ নিয়ে আমরা বহুবার রসিকতাও করেছি। ভদ্রমহিলাটির ছেলেরা রবিবারে গির্জাঘরের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। ভেতরে বড় একটা ঢোকে না। ওদের সবাই চেনে। যাই হোক না কেন, মহিলাটির ছেলেগুলো বেশ প্রাণবন্ত এবং সুন্দর। ওরা এত ফাজিল এবং বেপরোয়া যে কখনো-কখনো ওদের 'অবৈধ' ভাবতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু, এসব হলো বিনা কারণে এক-এক করে আসতে-থাকা অর্থহীন স্মৃতি মাত্র। এ জাতীয় স্মৃতি সুড়সুড় করে আসে। তারপর মুঠো মুঠো স্বার্থ এবং সরস জিনিস চুপচাপ সামনে ঠেলে দিয়ে চলে যায়।

একটা মুহূর্তও লাগলো না এ নিরুদ্দেশ ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেতে। সরাসরি ভাবতে লাগলাম—গার্ডেন-এ হয়তো এবারও খুব মরশুমী ফুল ফুটেছে। আমাদের বাড়িতে তিন রকমের লিলি এবং কাফি আছে। দিশী গোলাপও কম নেই।··· কী জানি, শবদেহের কাছে ফুল রাখা হয়েছে কি না?

ওঃ আমিও যে কী সব আশা করে চলেছি! হয়তো আকাশ কুসুমের। সবাই যদি বেহুঁশ হয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে কড়া গন্ধের ধূপকাঠি জ্বলেছে!

আমি আপনজনদের ওপর খানিকটা চটলাম। 'খিটখিটেমির সংক্ষিপ্ত প্রবাহ-টুকু অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে গেল। ভাবলাম—এতক্ষণে আবার শব কিংবা শবযাত্রা দুটোই শেষ না হয়ে গিয়ে থাকে!

আমি মিছিমিছিই হা-পিত্যেশ করছি। গাড়ি বেশ দ্রুত গতিতেই চলছে। মনে হচ্ছে—আমাকে একজন বিশিষ্ট যাত্রী মনে করেই বুঝি গাড়িখানাকে এত জোরে চালানো হচ্ছে। ইঞ্জিন-চালক হয়তো বেশ তামাশা করছে। কয়েক মিনিট ধরে একটানা সিটি বাজিয়েই চলেছে। ঠিক করলাম—এবার যে স্টেশনই আসুক না কেন, নিচে নামবোই।

নিচে নামলাম। পা ঝাড়া দিয়ে রক্ত-সঞ্চার ঠিক করবার চেষ্টা করলাম। আমার ঠিক সামনে একজন বুড়ো লোক পড়লো। একটা আধা বুড়ো ছেলেকে কোলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। তার মুখের চামড়া গ্লিসারিনের মতো তেলতেলে। লোকটাকে আমার বেশ আকর্ষক মনে হলো। কিন্তু, ভিড় এবং গাড়ির সঙ্গে বিনা কারণে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিশ্চিন্ত মনে ঠায় দাঁড়িয়ে কেন?

আমি কিছু বললাম না। লোকটার চারপাশে নিজের দেশী লোকের মতো আগ্রহ নিয়ে ঘুরঘুর করলাম শুধু। তারপর একসময় মনের মধ্যে শহর এবং গ্রাম দুটোই টুপ করে ডুবে গেল।···গাড়ি আবার ছেড়ে দিয়ে না বসে!

আসল ব্যাপার হলো—অত্যন্ত চিন্তিত থাকা সত্বেও কখন যেন আমার বৌয়ের কথা মনে পড়লো। বুড়ো লোকটাকে দেখার পর থেকে আমার মনে মৃত্যু—শুধু মৃত্যু-কল্পনাই জাগতে লাগলো। আগে মনে হয়েছিলো—বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরে যাবে। তারপর এর কোল থেকে বাচ্চাটা মেঝেয় পড়ে গিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। আসলে আমার মনে বুড়োর মৃত্যু অথবা ছেলেটার পড়ে গুঁড়িয়ে

যাবার এতটুকুও ভয় ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম—এসব কথা মাথামুণ্ডুহীন এবং মানবীয় সাজ-শয্যার চেয়ে বেশী কিছু নয়। আমার আসল চিন্তা তো কৌমুদীকে নিয়ে। ওর আবার কিছু না হয়ে পড়ে। ও এবার প্রথম প্রসূতি। আমি জানি ওর মৃত্যুতে ও কেঁদে-কেটে সারা হচ্ছে। ও অতিমাত্রায় ভাবুক। দুঃখ ওকে ভীষণ কষ্ট দেয়। গর্ভপাতও হয়ে যেতে পারে। আমার চিন্তার শেষ নেই। গর্ভস্থ শিশু ছ'মাসের। কৌমুদীর কিছু হওয়া উচিত নয়। টেনে-টুনে ও মাত্র এক বছরের পুরনো বৌ। ওঁর মৃত্যুতে মাপমতো কাঁদা এবং শোক ব্যক্ত করা উচিত। কান্নাকাটিরও একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে। আমাদের ব্যাপার হলো—মারাত্মক দুর্ঘটনার সময় আমরা নিতান্ত গেঁয়ো হয়ে উঠি। সভ্য দেশের নাগরিক এসব সময় রুচিসম্মতভাবে সেলাই করা কালো কাপড় পরে এবং অনুশাসিতভাবে শোকাঞ্জলি দেয়। ওরা মানুষ নয় এবং ওদের মধ্যে শোক-দুঃখের অনুভূতি নেই—একথা বলা যায় না। আমাদের দেশে শোক-দুঃখ ব্যক্ত করবার রীতি-নীতিগুলো বিকশিত হয়নি। স্বাস্থ্যহানি-দুর্দশা-মূর্ছা-উপবাস রাত্রি জাগরণ কিংবা আছাড় খেয়ে পড়া অথবা হাহাকারের মাধ্যমেই শোক সিদ্ধ হয়।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আপনজনেদের বিরুদ্ধে নানা কথা ভাবতে ভাবতে অনেক দূর অব্দি আমি আমার সিটে ঠায় বসে রইলাম। এটা যদি কোনো আনন্দ ভ্রমণ হতো এবং চুপটি করে বসে থাকতাম (যদিও তা কখনো সম্ভব নয়) তাহলে ক্লান্তির আর অবধি থাকতো না। ট্রেনটা থেকে থেকে ঝটকা মারতে লাগলো আর তার মধ্যে বসে থাকায় আমার শরীরটা এত কঠোর হয়ে উঠলো যেন ওটা নরদেহ নয়—একটা শক-অবজারভার। আমার মধ্যে কী যেন চিক-চিক করে উঠলো। আমি স্বকীয় নির্জনতায় হাঁফিয়ে উঠলাম। মনে হলো—আমার রক্ষাকবচটা ভেঙেই যাবে।

কিন্তু, ও নিয়ে কোনো পরোয়া করলাম না। বরং দুঃখের কবচখানাকে একটু নাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। এসব না করলে অতি অবশ্যই বমি করতে হতো আমাকে। আমি ভীষণ কঠোরভাবে ভাবলাম: না, দুঃখ আমাকে আছাড় মারুক, এ হতেই পারে না।

এক টুকরো আশা আমার মুখখানাকে ঠিক ততক্ষণ ছুঁয়ে রইলো, যতক্ষণ না ওখানা একটা বন্ধ ফুলের মতো আস্তে আস্তে ফুটে না গেল। শরীরে ভাঁজ দেখা দিল। আমি বসার আসন বদল করলাম, নম্র হলাম এবং লোকজনদের দিকে চোখ দিলাম। সহযাত্রীর ছেলেটি, সে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ আমাকে

দেখছিলো, পরে বুলবুলের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো। ও অপ্রস্তুতভাবে আমাকে তিরস্কার করে মা'র কাছে চলে গেল। এ ধরনের ব্যবহারে মনে হলো একটু আগেও ও আমাকে পাথুরে মূর্তি অথবা মনুষ্যেতর অন্য কিছু ভেবে একটানা সন্দেহ করে যাচ্ছিলো।...হঠাৎ চেনা-জানা ছেলেদের কথা আমার মনে পড়লো।

সেই ছেলেটির কথা মনে পড়লো, যাকে আমি 'ক্যাবলাকান্ত' বলে ডাকি! তার কথাও—যাকে 'গুরু' বলি। অবশ্য আমি আমার ছেলেকে এ জাতীয় হাস্যাস্পদ নামে ডাকতে দেবো না।

গুণে দেখলাম—ও কবে ভূমিষ্ঠ হবে। এর আগেও অনেকবার গোনা হয়ে গেছে। 'উনি' যদি আরো আটানব্বই দিন বেঁচে যেতেন, তাহলে হয়তো আমার ছেলের মুখ দেখে যেতে পারতেন।

কনুইয়ের কাছে আলতো ধরনের ঠাণ্ডা ছোঁয়া মনে হলো। কাতুকুতু দেবার মতো। ঠিক যেন চাটতে থাকা জিভের সরু ডগা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। হয়তো জানালায় একটা খুদে ফুটো আছে। লোকেদের দিকে এক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে নিলাম—ওদের আবার আপত্তি-টাপত্তি নেই তো? জানালার ঢাকনাটা ওপরের দিকে ঠেলে দিলাম। মনে হলো, যেন আমি পৃথিবীর ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলোকে অবহেলা করে একই পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারি না। বাইরের দিকে চোখ পড়তেই ভাবলাম—আমার অনেক আগেই জানালাটা খোলা উচিত ছিলো।

আকাশের ফুটপাথে ফুটপাথে মেঘ। গা ছোঁয়াছুঁয়ি করে। মেঘের ওপর মেঘ—যেমন পাহাড়ের ওপর পাহাড়। অবশিষ্ট আকাশটুকু নীল-নগ্ন।

আমি সিগারেট ধরালাম। অত বড় লম্বা যাত্রায় ওই প্রথম সিগারেট। সিগারেটের জোয়ার ভেতর থেকে বইতে শুরু করেছিলো। সিগারেট খেতে খেতে হিসেব কষে দেখলাম—দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছি একুশ ঘণ্টা আগে। আর ওটি ঘটেছে আটাশ ঘণ্টা আগে। আটাশটা ঘণ্টার মধ্যে থমথমে এবং গুমোট ভাবটা অনেকটা কেটে গিয়ে থাকবে। কিন্তু, মনের উপর কোনো বিশ্বাস নেই আমার। জানি না, কখন আবার দুঃখ টগবগিয়ে উঠবে, শোক ছোবল মারবে? আমি আমার দিক থেকে খুব একটা সতর্ক থাকি না। ঈশ্বরের করুণায় আশেপাশের জীবনগুলো থেকে কিছু-না-কিছু একটা বেরিয়েই আসে। এই 'কিছু'টা এত সাধারণ অথচ দুর্দান্ত যে গলা টিপে ধরা দুঃখটাকে লাথি মারতে মারতে চুপচাপ বার করে দেয়। এ সব বিপদাপদে অন্যান্য জিনিসই আমাকে সাহায্য করে।

এমনও হয় যে কখনো-কখনো দুঃখ-শোকরহিত জীবনের অনুভূতি আমাকে ভীষণ লজ্জা দেয়। আমার মধ্যে স্থায়ী দুঃখের গুণ ফুটে উঠুক—এটাই আমি চাই। জনপ্রিয় মনুষ্যত্বই আমার কাম্য। সেই জন্যেই অনেক বার ভেবেছি—ওঁর অনুপস্থিতিতে ঘরখানা করুণভাবে নির্জন হয়ে পড়ে থাকবে। ওঁর চলে যাবার কষ্ট সবাই বিশ্রীভাবে ভোগ করছে। কিন্তু, বুঝতে পারছি না—এসব কল্পনা এবং শ্রদ্ধা এত দুর্বল কেন, যা দু-চার মিনিট ঝড়ের মতো সশক্ত থাকে তারপর আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশ্য আমার মন থেকে তা সদাসর্বক্ষণের জন্যে কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি—যেমন, একটু আগেই আমি সংপৃক্ত এবং মগ্ন ছিলাম।

চোখ খুললাম—দৃষ্টি দুর্বল। তখন আমি, ভেতরে ভেতরে ছোটোখাটো একটা শিহরণের মধ্যে থেকে পার হচ্ছিলাম। তারপর মুখখানাকে যথাসাধ্য করুণ বানিয়ে একটা প্রসিদ্ধ লোকগীতি গুনগুনাতে লাগলাম।

এখন সেসব ভাবাবেগ এমনিভাবে মিলিয়ে গেছে, যেন, কখনো সৃষ্টিই হয়নি। তখন আমি উদ্দাম ঝড়ের দোলার মধ্যে ছিলাম এবং এখন ট্রেনের পাশে পাশে নরম মাটির মাঠ এবং দিনের সোনালী রোদ্দুর দেখে রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত হচ্ছি। কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়—আমার মধ্যে যেন সুখ-দুঃখের কোনো একটা স্বয়ংচালিত এলেকট্রনিক কণ্ট্রোল সক্রিয় রয়েছে।

এদিককার স্টেশনগুলোতে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি: আমি আছি অথচ তিনি নেই—এ কথাটা ভাবতেই মনটা বিষিয়ে উঠলো। স্টেশনে নেমে কিছু একটা খেয়ে নিতে হবে আমাকে। কালকে দুপুরে এবং বিকেলে খাওয়াই হয়নি। শরীরে বল না থাকলে তো দুঃখও ব্যক্ত করতে পারবো না। হয়তো অনুভবও করতে পারবো না। কী জানি, বাড়িতে পৌঁছে আবার কোন অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ি!

স্টেশনে চা-বিস্কুটের হকাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকেরা বলাবলি করছে—এখানে নাকি চিনির ভালো চা পাওয়া যাচ্ছে। আমার মধ্যে একটু লজ্জাও চিকচিক করে উঠেছে এই ভেবে যে এখানে আমি চা-বিস্কুট খেয়েছি। এসব কাজ চুপচাপ সেরে নিতে হয়। কারো কাছে বলা ঠিক নয়।

ওখান থেকেই আমার শরীরে ঢিলেমি এসে গেলো। আর, একবার যদি ঢিলেমির কবলে পড়াই যায় তাহলে তো মানুষ ধীরে ধীরে সত্যের মুখোমুখি হয়। তাছাড়া ক্ষুধা-সত্য নির্বিবাদ সত্য।

বিস্কুট খেয়ে নেবার পর ভেতরে একটা শারীরিক শক্তি ফুটে বেরুলো। আমার মনে সংশয় দেখা দিলো—এসবগুলো আমার জীবনের বেয়াদপ দিন নয় তো আবার? আমার অতীত জীবন যথেষ্ট সংকুচিত এবং সুসংস্কৃত। তাহলে এ চণ্ডালপনা কেন? একটি মৃতাত্মার সঙ্গে যার একটা দৃঢ় মানসিক সম্পর্ক রয়েছে, তার এ সময় বিস্কুট গেলা অথবা বিস্কুটের ইচ্ছে জাগাটাই চণ্ডালপনা ছাড়া কী? তবু আমার মন কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা কথাই বলছে: যদিও তুমি বিস্কুট খাচ্ছো, তবু, তোমার ভেতর থেকে ভালোবাসা এবং রীতি-প্রথা শেষ হয়ে যায় নি।

ভাবছি: এ যাত্রাপথে কোনো বন্ধু যদি সহযাত্রী হতো তাহলে অতি অবশ্যই জ্ঞান দিতো। বলতো: 'যা হবার হয়ে গেছে। তোমার উপোস করে থাকলে মৃতাত্মাটি ফিরে তো আসবে না! শোক-তাপ বাদ দিয়ে শরীরের দিকে নজর দাও। নাও, খাও…!' তখন হয়তো খেতে মন বসতো না আমার। আস্তে আস্তে খেতে খেতে বলতাম: 'ইচ্ছে করছে না খেতে!' আর, তক্ষুনি শুকনো গলা দিয়ে বিস্কুটের আধ-চিবুনো টুকরো টুপ করে পেটে নেমে যেতো। এখন তো বিস্কুটগুলো টপাটপ গিলে চলেছি—সত্যি, ভীষণ লজ্জা করছে। নইলে খেতে কী, সবাই তো খাচ্ছে।

পরবর্তী স্টেশনে লেবু খেলাম। যার ইচ্ছে বলুক: 'সত্যি, হদ্দ করে ছাড়লে! এ লোকটা দেখছি জীবনের সঙ্গে নিতান্ত অভদ্রভাবে লেপ্টে রয়েছে!' না, আমার মধ্যে এখন বুদ্ধির উত্তাপ দেখা দিয়েছে। একটু আগেই আমি আমার মনের কথা শুনেছি। সুতরাং এসব লোকের কথায় কান দিয়ে দরকার কী? ভাবছি—এসব ধূর্ত এবং লোভীদের ভয়ে কতো দিন আর বেঁচে থাকবার অদম্য ইচ্ছেটাকে গোপন করবো? এটা একটা ভয় ছাড়া নয় যে আমার মধ্যে কখনো-কখনো আমি নীচতার লক্ষণ দেখতে পাই—যদিও অস্তিত্ব রক্ষার মানবীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোকে নীচ ভাবা উচিত নয়!

শহরের অনেক কাছাকাছি এসে গেছি। এত কাছে যে মনে হচ্ছে—এক্ষুনি পৌঁছে যাবো। খুশিও হচ্ছি আবার একটু উদ্বিগ্নও। আশ্চর্য, এরকমটা তো বার্ষিক ছুটিতে বাড়ি আসবার সময়ই হয়। ভাবছি—এ যাত্রায়ও তেমন ভাব জাগলো কেন?…কিন্তু, এসব নিজে নিজেই হয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ কৃত্রিমতা জীবন থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি যদি এমনটা হতেই থাকে তাহলে তো ভয়ানক ক্ষতি হবে আমার। আমি কোনো ধুরন্ধর লোক নই। সুতরাং এটা আমার মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। বাড়িতে নিভে-যাওয়ার

মতো পৌঁছানো এবং নিজেকে নিভু-নিভু দেখানোটাই এখন জরুরী কাজ আমার। আমাকেই তো উনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন। তাহলে, ওদের সঙ্গে যারা আমার সঙ্গে জলভরা চোখে কথা বলবে—কীভাবে কথা বলবো এবং আমার মুখের অবস্থাই বা কেমন হবে ?

অনেকক্ষণ ভাববার পরও, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছি না। আসলে সব কিছুই আমি আলগা করে রেখেছি।

ট্রেনটা হাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে ওর গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে মন চাইছে। এ ইচ্ছেটাও ঠিক আগেরই মতো। চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার আগে থেকেই ট্রেনের পাশের দিকে চেয়ে থাকবার ইচ্ছে!

কম্পার্টমেণ্টের প্যাসেজ দিয়ে একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে পায়খানায় গেল। না, তা ভাববেন না যেন—যে—পায়খানার দিকে যাচ্ছে বলে মেয়েটি সুন্দর নয়। ওর পরনে টিউনিক-এর পোশাক এবং ওর হিপ্স কিন্তু বিশ্রীভাবে দোল খায়নি। ওর সে·মধ্যভাগটা সেদ্ধ ডিমের মতো শক্ত এবং তুলতুলে। ওসব দিকে আমার মন নেই। নইলে পায়খানা থেকে ফিরবার সময় আমি ওর সামনের দিকটা দেখতে চাইতাম।

জানালা গলিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে চাইছি। তার কারণ, এখুনি ময়ূর দেখতে পাওয়া যাবে। ওদের এলাকা এসে গেছে। ওই তো একটা ময়ূর দেখা যাচ্ছে। ওই, আরো অনেকগুলো। ইচ্ছে করছে সহযাত্রীদেরও দেখতে বলি। না, সাহস হচ্ছে না। আমার বেশ মনে পড়ছে—গোড়া থেকেই আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে গাম্ভীর্যময় সম্পর্ক বজায় রেখে আসছি। অতএব, এ সময় কথা বলাটা মুখ বাঁধা বেলুন খুলে দেবার পর ফুস করে চুপসে যাবার মতো দাঁড়াবে।

রেল রাস্তার নিরাপদ দূরত্বে অনেকগুলো ময়ূর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনো অব্দি তেমন একটাও ময়ূর চোখে পড়লো না যা নাকি পুরো পেখম খুলে দাঁড়িয়েছে। ওদের ডানা ঝলমল করছে। ট্রেন এগিয়ে চলেছে। 'কালিকা' বেশ জোরে চলে।...আস্তে আস্তে ময়ূরগুলো পেছনে পড়ে রইলো।

আমি বাইরে তাকানো বন্ধ করেছি। চোখে হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে—অবশ্য সেদিকে আমার খেয়াল নেই। এ নির্জন অবস্থায় আবদ্ধ 'আমি' কখন যেন ওঁর মৃত্যুর কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ওঁর জন্যে আমি বাচ্চাদের মতো কাঁদতে পারবো কি না ?...এ আমার আত্ম-জিজ্ঞাসা।

গলা দিয়ে থুতু গিলে জানালার কাঁচ ফেলে দিয়েছি। নিজেকে বোঝাবার

চেষ্টা করলাম—তুমি যদি তোমার শহরে পৌঁছাবার খুশিতে ডুবে না থাকতে, তাহলে, এক্ষুনি কেঁদে ফেলতে। করুণা তোমার বুকের নিচে ঠিক তেমনি অদৃশ্য থাকে, যেমন পাহাড়ের পেটে জল। এতে প্রশংসার কিছু নেই—তুমি একটি ক্ষুদ্র অথচ অজ্ঞাত মহাপুরুষ! শুধু মাত্র ভাবপ্রবণতার দরুন ছুটি, শহর এবং স্ত্রীর জন্যেই তুমি কয়েকশো মাইল দূর থেকে ছুটে আসছো না···!

লাইনের পর লাইন বদল করে গাড়ি বুকে হাঁটতে হাঁটতে থেমে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে রেলগাড়িরূপী বৈজ্ঞানিক অবদানের বিষয়ে ভাবলাম। রেলগাড়ি কখনো পুরনো কিংবা ফালতু মনে হয় না। আমার কামরার অধিকাংশ যাত্রীই হয়তো সহিষ্ণু—নয় শুয়ে আছে, নয় এখানে নামবে না। আমি কিন্তু জানি—এটাই আমার স্টেশন—গন্তব্য। এখন তো ঝলমলে দিন, অন্ধকারেও আমি আমার স্টেশন চিনতে পারি। আপনি আমার চোখে পট্টি বেঁধে কোনো উঁচু জায়গা থেকে শুধু চাঁদ অথবা আকাশই দেখিয়ে দিন না—আমি হলপ করে বলে দেবো : এটা আমার শহর নয়।

আমি নির্ভয়ে নামলাম এবং নিজেকে সুরক্ষিত অনুভব করলাম। ওঁর মৃত্যুর কথা ভাবতে বসে এর আগে যে নিঃসঙ্গতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো এখন তার নামগন্ধও নেই। হালকা ফূর্তি এবং তোড়জোড় সহ মালপত্র নামিয়ে চলেছি। এখানে আমার কোনো ভয় নেই—এ শহর আমার হাতের মুঠোয় বন্ধ। এখানে যদি আমি কেঁদেও ফেলি—আফসোসের কিছু নেই। এখানে পৌঁছুতেই আমার কাঁদা বা খুশি হবার পার্থক্যটুকু মিলিয়ে গেছে।

বাইরে এসেছি। শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে টাটকা হাওয়া লাগছে। নিমগাছগুলো তিরতির করে কাঁপছে। দেখতে দেখতে আমার মুখখানা ভালোবাসাবাসির অতলে ডুবে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে—বাড়ি গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ওঁর মৃত্যুর স্মৃতিতর্পণ করে আমি ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠবো। এতটুকু কষ্ট হবে না এবং ধীরে ধীরে সবাই মেলামেশার খুশি অনুভব করবে!

স্কুটার রিকশাওলার সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু, ও ব্যস্ত কীভাবে গাড়িখানাকে আরো জোরে হাঁকাতে পারে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তা, দোকানপাট এবং পথ চলতি লোকজন দেখতে লাগলাম। লোকেরা সন্দেহ করতে পারতো—এ লোকটা এ শহরের নয়।

বাড়ি পৌঁছুতে এখনো দশ মিনিট দেরি।

সমুদ্র ও সূর্যের মাঝে ॥ হিমাংশু জোশী

সে স্বপ্ন দেখে—গতকাল রাত্রে হঠাৎ সরকারের পতন ঘটার ফলে, শাসন-ক্ষমতা কয়েকজন নতুন অপরিচিত লোকের হাতে চলে যায়। পুরনো মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের জটিল মামলা সৈনিক আদালতে প্রদান করা হয়েছে। দেশের সমস্ত ভ্রষ্টাচারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে—আকাশবাণী থেকে নতুন বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করেছে…

সে দেখল—তাঁর পায়ে বেড়ি, হাতে ভারি ওজনের হাতকড়া ঝুলছে। কনট প্লেসের ভরা-বাজার থেকে, দিনদুপুরে মিছিলের আকারে তাঁকে লালকেল্লার দিকে পায়ে হাঁটিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। ঘাড়ের কাছে ঝুলে থাকা তাঁর মাথা ক্রমশ মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। ঘামে সে ভিজে গেছে। মুখ থেকে ফেনার বুড়বুড়ি বেরোচ্ছে। মুখের ওপর খাদির একটা সাদা রুমাল সে চারদিক ঘিরে কষে বেঁধে রেখেছে,—যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে। কেবল দুটি ফাঁকা, নিষ্প্রাণ চোখ বাইরের দিকে উঁকি মারা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। রাস্তার এপারে-ওপারে অসংখ্য দৃষ্টি বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায়, বিরূপভাবে তার দিকে বার বার দেখছে। কিন্তু সে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল কুয়াশা আর কুয়াশা, মরুভূমির ঢেউয়ের মত প্রসারিত…

তাঁর একটু শ্বাসকষ্টের মত মনে হয়। বুঝি নিশ্বাস এখনই থেমে পড়বে। হঠাৎ, তার হাত-পা ছটফট করে ওঠে, সে জেগে ওঠে, তখনো তার বুক ভাতির মত ধক্ ধক্ করতে থাকে। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছিল। তার বুড়ো জরজর শরীর শুকনো পাতার মত কাঁপছিল। নিজের সত্তর বছর দীর্ঘ সংঘর্ষময় জীবনে সে এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কখনও দেখেনি—যা তার প্রতিটি রোম অনুরোম কাঁপিয়ে তুলেছিল।

তখনি পাশের টেবিলে ফোনের ঘণ্টি বেজে ওঠে। আঁতকে ধড়ফড় অবস্থায়

সে সচেতন হয়ে ওঠে। মরা-বাঁচা কোনরকমে সমস্ত শক্তি জড়ো করে, রিসিভারের দিকে ছুটে যায়, 'হা-আ-হা-হা-ল' তার মুখ থেকে সম্পূর্ণ শব্দ বেরোয় না। তাঁর শুষ্ক জিভ তালুর সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে জুড়ে থাকে।

প্রত্যুত্তরে সে খট্ করে রিসিভার ফেলে দেয়। এবং সেখানেই মেঝের ওপর কোনরকমে বসে পড়ে। তাঁর পায়ে এখন এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যাতে সে উঠে দাঁড়াতে পারে। শরীরের যাবতীয় শক্তি যেন ভেজা তোয়ালের মত নিংড়ে শেষ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে আবার শক্তি জড়ো করে, খাটের পায়ার সাহায্যে উঠে দাঁড়ায়। তেপায়ার ওপরে রাখা কাঁচের জার থেকে জল উপুড় করে খায়। কিছুটা যেন শক্তি পায়। তারপর সে বিছানায় মড়ার মত এলিয়ে পড়ে।

চোখে এখন ঘুম ছিল না। দৃষ্টি এখন সিলিং-এ আঁটা নিভন্ত ডুখেল রডের ওপর মরা মাছির মত এঁটে থাকে।

এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সে কখনও দেখেনি। কিন্তু আজ? সত্যি কি বিস্ময়কর কিছু একটা হতে চলেছে! দেশের অবস্থা দেখে কিছুই অসম্ভব মনে হয় না। যে কোন সময়ে কিছু একটা ঘটতে পারে।

তাঁর মনে পড়ে—কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে সে ইরাকের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভাবছিল। সম্ভবত তারই প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রম ঘটে থাকবে। রেডিয়োয় আফ্রিকার কোন এক দেশের এ ধরনের পরিবর্তনের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। এরকম অরাজকতা অনিশ্চিত কাল ধরে যদি চলে, ভবিষ্যতে তাহলে কি হবে? একদিন না একদিন সেই বারুদ ফাটবেই। না—া—না—!

সে দ্রুত মাথা নাড়ায়—না, এরকম কখনও হবে না। এখন বয়স আর কতটুকু অবশেষ আছে! যে কটা দিন কাটবে, সেটাই বেশী।

সারারাত এরকম অসহায় শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে থাকে।

সকালের দিকে আবার একটু তন্দ্রাগোছের হয়। খানিকটা আরামও বোধ করে। কিন্তু চাকর এসে বেড-টির জন্য জাগালে, সে তার সাহায্য ছাড়া নড়তে পারে না।

চায়ের পেয়ালা ধরার জন্য যখন সে কাঁপা কাঁপা বুড়ো হাত এগিয়ে দেয়, তার চোখ জোড়া খোলা স্থির থেকে যায়। তার কব্জিতে গভীর ছাঁচের দাগ আঁকা—যেন কয়েক বছর ধরে বাঁধা হাতকড়া সবে খোলা হয়েছে—এই রকম ফুটে ওঠা আরো কয়েকটা নীল নিশান।

চাকর আজকের টাটকা সংবাদপত্র ভাঁজ অবস্থায় রেখে চলে গেছে। কিন্তু সে খুলেও দেখতে পারে না। বিস্ফারিত নেত্রে সামনে ঝোলানো ছবির দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, ছবির আকৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন কেবল কালো ফ্রেমটুকু অবশেষ আছে এবং ক্রমশ ফ্রেমের রঙ ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ হয়ে চলেছে।

চোখ আবার বুজে ফেলে সে।

আজকের পূর্বনির্ধারিত সমস্ত কার্যক্রম বাতিল হয়ে যায়। একের পর এক, গোটা দিন ডাক্তার ও বন্ধুরা যাতায়াত করে।

কয়েকদিন পরিচর্যার পর স্বাস্থ্য কিছুটা উদ্ধার হয়। নিয়মিত দৈনন্দিন কাজ আবার শুরু করে। কিন্তু, এখন এক নতুন মানসিক ব্যাধি তাকে ঘিরে থাকে। প্রতিটি মুহূর্ত, এখন সে তার গতায়ু জীবন সম্পর্কে ভাবে। যখনি সে তার কাছ থেকে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে, তখনি তার প্রতিবিম্ব আরো ভয়াবহ হয়ে সামনে ফুটে ওঠে—

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে 'লবণ সত্যাগ্রহে' জেলে গিয়েছিল। মা মারা গিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু বহুপূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। ছোট ভাই মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করছিল···

'দেশসেবা একটা তপস্যা। যতক্ষণ সকলে পরিধানযোগ্য সম্পূর্ণ কাপড় পাবে না, আমিও সম্পূর্ণ কাপড় পরবো না। যতক্ষণ সকলের বাস করার জন্য গৃহের ব্যবস্থা হবে না, আমিও গৃহে বাস করবো না। আমি সেই ভোজন গ্রহণ করবো, যা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করে।' তার মনে হয়েছিল, এ কথা গান্ধী নয়, সে বলেছিলো। হ্যাঁ সে-ই শুধু।

কিন্তু না, এটা সত্যি নয়, এটা স্বপ্ন। এখানে কখনও সত্যাগ্রহ হয়নি। গান্ধী নামে কোন লোক কখনও এই দেশে জন্মগ্রহণ করেন নি। এরা সকলেই বিক্ষিপ্ত। কথায় কথায় তাঁর নামোল্লেখ করে। রবিনসন ক্রুশোর মত, আমরা কোন দ্বীপে এক অজ্ঞাত নায়কের কল্পনা করে নিয়েছি এবং···

কয়েকদিন পর সে আবার একটা স্বপ্ন দেখে—

সে হাঁটতে হাঁটতে মিণ্টো ব্রীজ পেরিয়ে, এখন লাল কেল্লার ময়দান অব্দি পৌঁছে গেছে। পা জোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাল করে হাঁটা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

এখানে কনট প্লেসের মত তেমন ভিড় নেই। একটাও লোক দেখা যাচ্ছিল না। চারিদিকে রাত্রির মত অন্ধকার। ভয়ঙ্কর শূন্যতা। নিজের হাত কড়ার দড়ি সে নিজেই হাতে ধরে নিঃসঙ্গ একাকী এগিয়ে চলেছে। কোন পুলিশের লোক তার সঙ্গে নেই।

সে দুর্গের প্রবেশদ্বারে পৌছয়। দেখে, যে লোকটা দরজা খুলে দেয়, সে হু-বহু তারই চেহারায়! ঠিক তার মতই শরীর, তাঁর মত রঙ, তার মত বস্ত্র! কোথাও সামান্যতম পার্থক্য নেই! যেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছে।

ভেতরে দেউড়িতে দাঁড়ানো সান্ত্রীকেও তার নিজের প্রতিমূর্তি মনে হয়।

এক সৈনিক আদালতের সামনে হাত বাঁধা অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে আছে। তার জর্জর শরীর কাঁপতে থাকে।

—দেশদ্রোহ থেকে কোন বড় অপরাধ আছে কি?

সে মাথা নাড়ায়—না।

—তুমি অপরাধ করেছ?

—হ্যাঁ।

—দুর্নীতি উপায়ে এত টাকা উপার্জন করে তুমি কি করবে? তুমি কি ঠিক করেছিলে?

সে চুপ থাকে।

—কুড়ি কোটি টাকার ব্যয়ে, পাঁচ বছরের দীর্ঘ পরিশ্রমে তৈরি সপ্তপর্ণা নদীর বাঁধ প্রথম বন্যায় ভেঙে, ভেসে যায়। সিমেন্টের পরিবর্তে তুমি বালি মিশিয়ে চার লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছিলে, তাই নয় কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রাজস্থান ও বিহারের দুর্ভিক্ষে সর্বমোট কতজন লোক অনাহারে মারা গিয়েছিল? অসংখ্য অসুস্থ শিশুর মৃত্যু কেবল এই কারণে ঘটেছিল যে তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ওষুধ ছিল না এবং ওষুধ ক্রয় করার পয়সা ছিল না।

—এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যে প্রান্তীয়তা এবং সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে মাঝে মাঝে যে হিংসাত্মক ধ্বংসমূলক কাণ্ড ঘটেছিল, তাতে অপ্রত্যক্ষভাবে

তোমারই হাত ছিল। তুমি এই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির উৎসাহদানে গত বিশ বছর ধরে শাসনতন্ত্রে জোঁকের মত এঁটে আছো এবং সমস্ত ব্যবস্থা ফাঁকা করে দিয়েছ…

নিজের নিহিত স্বার্থের জন্য তুমি রাষ্ট্রের প্রগতি নিয়ে জুয়া খেলেছ। একটা শ্রেণী, সমাজ বা প্রান্তই শুধু নয়—তুমি নবোন্মেষিত এক শিশুদেশকে দিনে-দুপুরে হত্যা করেছো। দেখো, দেখো! তোমার হাত এখন গরম রক্তে মাখামাখি! দেখছো…

সে তার বাঁধা হাত জোড়ার দিকে চেয়ে দেখে, যা বস্তুত রক্তে মাখা—লাল!

সে আর্তনাদ করে ওঠে।

সেই আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সমস্ত প্রাণী সহসা জেগে ওঠে। লোকেরা দেখে—তার শরীর একেবারে হিম। তৃণ ডগার মত কাঁপছে।

তিনদিন পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। জলের জন্য সে হাতছানি দেয়, দেখে তার পাঞ্জায়, আঙুলে ভেজা লাল বার্নিশের মত কিছু একটা মাখা রয়েছে।

সহস্রবার সে হাত ধোয়, কিন্তু লাল রঙ মোছে না।

তারপর থেকে সে হাত ঢাকার জন্য দস্তানার ব্যবহার শুরু করে। কয়েকমাস হাসপাতালে থেকে সে পুনরায় সুস্থ হয়, বাড়িতে ফিরে আসে। ফিরে এসে একদিন সে শোনে চাকর বলছে—বাড়ির পেছনে একটা সাদা বেড়ী ও হাতকড়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছে। অনতিদূরেই খাদির রুমালের মত কিছু একটা পড়েছিল, যা ছিল ভাঁজ করা।

সে অবাক হয়ে শোনে। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

বাইরে গেটে সঙীনধারী সান্ত্রীর চেহারা হু-ব-হু তার সঙ্গে মিলে যায়, যে লালকেল্লার সৈনিক আদালতের মুখ্য বিচারকের চেয়ারে বেশ দাপটে বসে ছিল এবং তাঁকে একের পর এক ভয়াবহ জেরা করেছিল।

একদিন সে সান্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কখনও লালকেল্লায় গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সরকার। সে জবাব দেয়।

—কবে?

—এই ধরুন বছর পাঁচেক আগে…

—কি কাজে?

—আমার ডিউটি পড়েছিল হুজুর…

—তারপর আর যাওনি ?

—আজ্ঞে না, স-র-কা-র - ।

—আচ্ছা, তুমি কি এদিকে কোন স্বপ্ন দেখেছ, যাতে তোমার উন্নতি হয়েছে ?

বস্তুত সান্ত্রী বুঝতে পারে না, বড় সরকার আজ কি ধরনের কথা বলছে। তবুও কিছু উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। তোতলাতে থাকে, বলে—শুধু আমার মেয়েটাকে দেখেছি হুজুর। বছর ২/৩ আগে মারা গেছে।

—আর কিছু নয় ?

—আজ্ঞে না হুজুর···

সান্ত্রী চলে যায়···

কিন্তু, সে ভাবতে থাকে—তাঁর চোখে এমন স্বপ্ন আসে কেন ? একদিন সহসা কি বাস্তবিক এই শাসনব্যবস্থা পালটে যাবে। বিগত জীবনের যাবতীয় ভুল ফুটে উঠে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে। আজীবন সঞ্চিত সমস্ত প্রতিষ্ঠা এইভাবে ধূলোতে মিশে যাবে! ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও সত্যি এমন কিছু···

তাঁর শরীর দুমড়ে ওঠে···সে কাঁপতে কাঁপতে শূন্য আকাশের দিকে কাষ্ঠ-খণ্ডের মত নির্নিমেষ চেয়ে থাকে।

কয়েকদিন পর সে তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রে সফরে যায়, একদা যেখানে বন্যা হয়েছিল। একটা বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। ফলে সংখ্যাতীত প্রাণী, মনুষ্য, জীবজন্তু, বাড়িঘর, ক্ষেতখামার সব ভেসে গিয়েছিল। নিরাশ্রিত, গৃহহীন লোকদের সমাবেশ ছিল।

সেই সমাবেশে যাবার পথে সে এঁটোপাতা-চাটা একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পায়। ঐ বৃদ্ধার চেহারার সঙ্গে তার স্বর্গীয়া জননীর এত বেশী মিল পায় যে ঠোঁটে আঙুল রেখে, মুহূর্তের জন্য বুক ধড়াস করে কেঁপে উঠে থেমে পড়ে।

কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় উনআশি বছরের এক বুড়ো চাপা পড়ে মারা যায়। সে বিস্ময়ে দেখে, ল্যাংগট পরনে, লাঠি নিয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে কেঁচোর মত ছটফট করছে যে বুড়োটা, হ্যাঁ তার সঙ্গে সন্দেহাতীত ভাবে মিল, সেই সোনার ফ্রেমে বাঁধা, যার ছবি তার ড্রইংরুমে আজও টাঙানো আছে।

তাঁর অনিদ্রা রোগ শুরু হয়েছিল। চোখের পাতা দিনরাত খোলা থাকে···

কিন্তু বহুদিন পরে, সে রাতে তাঁর চোখে ঘুম নামে। সে আবার স্বপ্ন দেখে—

আদালত সেইরকমই জমজমাট, গিজগিজে ভিড়। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ পঙ্গপালের মত ভেঙে পড়েছে। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের ভিড় জমে উঠেছে…

আজ অন্তিম দিন। রায়দান হবে।

সামনে একটা চিল পাক খায়। কালো পর্দা সরে যায়। সে দেখে, মুখ্য বিচারক (যার চেহারার সঙ্গে তার সান্ত্রীর মিল আছে) রায়দান করছে।

—আদালত সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের পরে এই নির্ণয়ে পৌছেছে, যে, তুমি চল্লিশ বছর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে, দেশজনসেবার নামে সোয়াতিন কোটি টাকা সঞ্চয় করেছ। দুর্নীতি প্রসারণ করার ব্যাপারে তোমার দ্বিমুখী নীতি কার্যকারী হয়েছে।

সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থ পূরণ করার জন্য তুমি সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রান্তীয়তাকে এরকম উৎসাহ দিয়েছো, যার ফলে দেশ পুনর্বার বিভক্ত হওয়ার সঙ্কটে এসে দাঁড়িয়েছিল। গৃহযুদ্ধের মত এই ভয়াবহ অরাজক অবস্থায় দেশকে এনে দাঁড় করানোর দায়িত্ব তোমার ওপরেই…

তার হলুদ মুখ খুলে যায়…

মুখ্য বিচারক তাঁর রায়দান একই গতিতে পড়ে যান—আদালত এইসব বিচার করে নির্ণয়ে এসেছে যে তোমাকে যতই সাজা দেয়া হোক না কেন, তা সামান্যই।

—তবুও—

—তোমার মুখে চুনকালি মেখে দেশের প্রতিটি কোণে পাঠানো হোক, যাতে দেশবাসী (যারা বিশ্বাস করে তুমি হত্যা করেছো) তোমাকে দেখে উপহাস করতে পারে। লোকেদের এই ভৎর্সনা ও উপহাসের পরেও তুমি মরনি, বেঁচেই আছ… তখন তোমাকে চাঁদনী চকের ভরা বাজারে, উন্মুক্ত, জনতার উপস্থিতিতে ফাঁসির সাজা দেওয়া হোক…

রায় সম্পূর্ণ শোনার আগেই সে আদালতের মেঝেতে জ্ঞানহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

সকালে লোকেরা দেখে—

সে বিছানায় মৃত পড়ে আছে। তাঁর গলায় রজ্জুর মত তাজা দাগ—ফুলে উঠেছে নীল রেখা। তার গোটা চেহারা একেবারে কালো!—যেন কালি মাখিয়ে রেখেছে।

শহীদ ॥ শ্রীসিদ্ধেশ

আগে থেকেই ঠিক ছিল যে ওরা দু'জনে আসবে। এজন্য সেইভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সোফা-কাম-বেড বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর রাত্রে দিবাকরবাবু তার ওপরেই শোবেন ঠিক করেন। ওনার চাকির মতো শক্ত জমির ওপরই শোবার অভ্যেস ছিল, কিন্তু যেমন-তেমনভাবে ইউ-ফোমের গদির ওপরই নিজের ব্যবস্থা করে নেবেন…ঘরে জায়গা এতই কম ছিল নিচে জমিতে যদি শুতেন তো চলাফেরা মুশকিল হতো। এই ভেবেই তার ওপরে শোওয়ার অভ্যেস করতে থাকেন। ওনার জানাই ছিল যে এ ব্যবস্থা প্রায় একমাস পর্যন্ত চলবে। তারা দুজনে স্বামী-স্ত্রী বৌ-এর সম্পর্কের লোক। স্বামী তথা অমিতবাবু হাই ব্লাডপ্রেসারের রুগী আর তার স্ত্রী, আসন্নপ্রসবা, আজকালের মধ্যেই বাচ্চা হবার কথা। একে স্বামী অসুস্থ তার ওপরে স্ত্রী গর্ভবতী। সারাদিন আর রাত্রি নটা পর্যন্ত আসা-যাওয়া লোকের উৎপাত লেগে থাকত। যার মধ্যে ডাক্তার থেকে পরিবারের লোকজন সামিল ছিল।

দিবাকরবাবু নিজের বার্ধক্যের স্তিমিত চোখ দিয়ে সব দেখতেন আর চুপচাপ তাদের মধ্যে নিজেকে এডজাস্ট করার চেষ্টাও করতেন। যদিও তাঁর দিনচর্চায় কোনো পরিবর্তন আসে নি। আগের মতোই একেবারে সকালে উঠে পাশের খাটাল থেকে তাজা দোয়ানো দুধ নিয়ে আসেন। তারপর সকালের তাজা খবর পড়ে নেন খবরের কাগজ হতে আর দেশের দিনের পর দিন বর্ধিত মূল্যের আর দুরবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যকে বলবার জন্য, যে আজ কোথায় কি হলো, প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। ছেলে আর বৌ তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে; তাই যখন কাউকেই পাওয়া যেতো না অমিতবাবুর সাথেই ভিড়ে যেতেন। অমিতবাবুর বিছানা পর্যন্ত চলে যেতেন আর নিজের কথা বলবার জন্য সুযোগের অছিলায় ভূমিকা বানাতেন। সেদিনও এমনই হয়েছিল। সেদিন খবরের কাগজে

প্রচুর খবর ছিল, বক্‌বক্ করার জন্য অনেক মসলাই তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। দু তিনবার খবরের কাগজটি জমিয়ে পড়ে নেবার পর ধীরে ধীরে চেয়ারটি ছেড়ে জেগে যাওয়া অমিতবাবুর বিছানার কাছে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনই দাঁড়িয়ে রইলেন—চুপচাপ অমিতবাবুকে পাশ ফিরে শুতে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু অমিতবাবু জেগেও চোখ বন্ধ করে পড়েছিলো। অনেকক্ষণ অবধি যখন চোখ খুললেন না তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'এখন শরীর কেমন আছে আপনার?'

'ভালো আছে। আসুন, বসুন।' অমিতবাবু নিজের চোখ খুলেছিলেন আর সরে গিয়ে তাঁকে বসার জায়গা করে দিলেন। দিবাকরবাবু এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লেন।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছিল। অমিতবাবুর শরীরও ভালো লাগছিল। আগের চেয়ে তাঁর চেহারার সতেজতা অনুভূত হচ্ছিল। ডাক্তার তাঁকে বেশী চলাফেরা করতে বারণ করেছে, এজন্যও গত চার পাঁচদিন ধরে অফিস যাচ্ছেন না; সামনের সাত আট দিন ছুটি নেবার কথা ভেবে রেখেছেন। প্রসন্নচিত্তে তিনি দিবাকরবাবুর দিকে তাকালেন। ফের বললেন, 'আজকের খবর কি?'

খবর কি জিজ্ঞেস করছেন; সব জায়গায় হাঙ্গামা লেগে আছে।'

'হাঙ্গামা কি রকম? কোথাও কিছু হয়েছে নাকি?'

'তাতো হবেই, আহমাদাবাদে গুলি চলেছে। লোক তো মরেছেই; কিন্তু পেপারওয়ালারা তো কিছু গোপন করবেই। সত্যকথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে।'

'তা ঠিকই।'

'বিহার অ্যাসেম্বিলতেও হাঙ্গামা হয়েছে। সেখানের স্টুডেণ্ট বিপ্লবের জন্য তৈরি। দেশভরে গোলমাল লেগে আছে। ইঞ্জিনিয়াররা তো হরতাল করছেই। শেষে দেশের কি হবে?'

এতে অমিতবাবু আর কি বলবেন? চুপ হয়ে গেছেন। উঠে বসলেন; পাশে বসা গর্ভবতী পত্নীর দিকে তাকিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু শুনেছেন, কাল ট্যাক্সি স্ট্রাইক? যদি হয় কোনো রিকশাওয়ালাকে ঠিক করে রাখতে হবে। ঠিক নেই…'

'হ্যাঁ শুনেতোছি; কিন্তু কালকেই যে হবে তা জানি না। একবার তো পঞ্চাশ

পারসেণ্ট বাড়িয়ে রেট ঠিক করে দিয়েছে। এখন আবার এরা দ্বিতীয়বার বাড়াতি চাইছে। প্রাইভেট বাসওয়ালারাও হরতাল করার ভয় দেখিয়েছে।'

'হ্যাঁ এবার মুখ্যমন্ত্রী তো আশ্বাস দিয়েছেন যে এ সম্বন্ধে ভাববেন। আজ কালের মধ্যে এই লোকেরা একদিনের জন্য টোকেন স্ট্রাইকও করবে।' অমিতবাবু বললেন। তারপরে এগিয়ে গিয়ে কাগজটা নিজের দিকে টেনে নিলেন; তার ওপর এক জায়গায় নিজের দৃষ্টি আবদ্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ দিবাকরবাবু ওর তরফ থেকে কথা বলার প্রতীক্ষা করতেলাগলেন; কিন্তু অমিতবাবু খবরের কাগজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উঠে বাইরে দালানে চলে এলেন।

এটা স্পষ্ট যে দিবাকরবাবু দেশের এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ। কেবল নেতাদের গাল দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিইবা করার ছিল; জমিয়ে তাদের কার্যকলাপের আলোচনা ছাড়া আর কিইবা করতেন তিনি! তাই যখনই তিনি সুযোগ পেতেন এই সব চর্চা নিয়েই বসতেন। সে ঘরের লোক হোক বা বাইরের কোনো পরিচিত ব্যক্তিই হোক।

সন্ধে হতেই রোজের মত দিবাকরবাবু পার্কের দিকে বেড়াতে বের হলেন। একটা বেঞ্চে জাঁকিয়ে বসলেন। আবহাওয়া গরম হলেও হাওয়া জোরে বইছিল আর পাশেই গাছপালা থেকে যে মর্মরধ্বনি আসছিল তা ওনার ভালো লাগছিল। তিনি জানতেই পারেন নি যে কখন তাঁর পাশে নবযুবকের মতো একটি লোক বসে তাঁকে এক নজরে দেখছে। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর নজর সেদিকে গেল তখন ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত শিউরে উঠল। তবুও সাহস হারালেন না। সকালের কাগজে পড়া এক খবর তাঁর মনে সাঁতরে গেল। হত্যা, খুন এ শহরে আবার শুরু হয়ে গেছে। দিনদুপুরে কিছু যুবক মিলে ছোরা দিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে হত্যা করেছিল। ওহ্! কত রক্ত! কাগজে ফটোও ছাপিয়েছিল। আরে এই পুলিশ নিজের সুরক্ষা যদি নিজেই না করতে পারে তো সাধারণ জনতার কি ভরসা! কিন্তু উনিও তো রিটায়ার হওয়ার আগে পুলিশেই ছিলেন। এক পদস্থ পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন; নিজের চাকুরী জীবনে কত বিপজ্জনক লোককেই ধরে জেলে ঢুকিয়েছিলেন তিনি—।

দেশ স্বাধীন হবার আগের কথা। প্রায় '৪২ সনের কথা হবে—যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য মরবার লোকের অভাব ছিল না। রোজই থানার সামনে কোন না কোন জুলুস বের হতো; আর 'বন্দেমাতরমে'র আওয়াজ যেমন যেমন বাড়ত,

তেমনি তাঁদেরকে নিজেদের থানা সুরক্ষা থাকার জন্য তৈরি থাকতে হতো। পুরো ড্রেসে বন্দুকধারী সিপাহীদের সাথে গেটে প্রস্তুত থাকতেন, যাতে কেউ না ভিতরে এসে তছনছ করে দেয়, আগুন না লাগিয়ে দেয়। একবার এমনি হয়েছিল। বিপ্লবী লোকদের তরফ থেকে পাথর আসায় তাঁকে জখম হতে হয়েছিল। তবুও তিনি সাহস হারান নি আর ইংরেজ শাসনকালের সুরক্ষার ভার সফলতার সাথে বহন করেছিলেন। পরে গুলিও চলে, তাতে বিশজন লোক মারা যায় আর কেউ কেউ জখম হয়ে কম্পাউণ্ডের ভেতর পড়েছিল। কিন্তু জখম হওয়া লোকেদের মুখে সেই রকমই হাসি আর জ্যোতি দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ যখন দেশের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, পরিস্থিতি দিনের পর দিন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। আজও দেশের জন্য মরবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু দৃশ্য ঠিক বিপরীত। আগে দেশের স্বাধীনতার জন্য লোক মরত আর আজ নিজেই স্বাধীন দেশের পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়িয়ে লোকেরা একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত।

দিবাকরবাবু সোজা হয়ে বসলেন। তারপর কেশে নিয়ে মাটিতে থুথু ফেললেন। কিছুক্ষণ পর সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথায় থাকো?'

প্রথমে তো সে কিছু জবাব দিল না। তেমনই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। দিবাকরবাবু এবার স্থির থাকতে পারলেন না; ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে, আমি তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। কোথায় থাকো?'

এবার সেই যুবক ছেলেটি উত্তর দিল, 'এখানেই।'

'এখানেই মানে? নাম কি জায়গার? তোমার নাম কি?' দিবাকরবাবুর মনে হলো তিনি আবার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট হয়ে গেছেন আর এক দাগী আসামীকে জেরা করছেন।

সে উত্তর দিল, 'ভবানীপুরে থাকি। আমার নাম প্রবীণ।'

'কি করো? কিছু কাজটাজ তো নিশ্চয় করো।'

'না, বেকার।'

'কি পড়েছ? মানে কতদূর পড়েছ?'

'হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় এবার পাস করেছি।'

'কলেজে পড় না?'

'না।'

'কেন?'

'এমনি। পড়ে কি হবে?'

'এ কেমন কথা? এটুকু পড়ে চাকরি পাবে?'

'তো কি বেশি পড়লে পাওয়া যাবে?'

'তবে কি করবে?'

'কিছু না।'

'কিছু তো করবেই। বলছ না কেন?'

দিবাকরবাবুর এ কথায় সে হেসে ফেলল। তারপর নিশ্চুপে উঠে দাঁড়াল আর একদিকে চলে গেল। তিনি ওকে রুখতে পারলেন না। ওনার নিজে নিজেই হাসি এল। কি উৎপটাং প্রশ্ন করেছিলেন। কিছুক্ষণ বসে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন সেই সময় ছেলেটি এসে আবার তাঁর পাশে বসে পড়ল। তাঁর এবার আর নিজের থেকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না। এজন্য তিনি জেনেশুনে অপরিচিতের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ছেলেটিই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এখানে কতদিন থেকে?'

এইবার দিবাকরবাবু চমকে ওর দিকে তাকালেন। তাঁর আশা ছিল না ছেলেটি নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। উত্তর তো দিতেই হবে। বললেন, 'এই গত বছর থেকে।'

'অ। তা নতুন, এই জন্য। আপনি কোন্ পার্টিতে বিলং করেন?'

'কেন? কোন পার্টিকে করি, তুমিই বলো। সবাই তো চোর।'

'হ্যাঁ, সবাই তো চোর। শালা অন্যের হিত করে না, নিজের হিত করে যাচ্ছে।'

'তুমি পার্টি-টার্টি মানো?'

'আমি কোন পার্টিতেই নেই, আমি হত্যা করার পার্টিতে। শালাদের মেরে তবে মরব।'

'এতে কি লাভ?'

'লাভ কে করে?'

'তবে কেন করবে? এতে যদি কারো ভাল হয় তো করো।'

'না। বিপ্লব আনতে হবে। এখন হত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।'

'কিন্তু এটা ঠিক রাস্তা নয়।'

'তবে কোন্ রাস্তা ঠিক আপনিই বলুন।'

'আমি কি বলব? আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি। কিন্তু মনে হয়, শহীদরা কি এই

রাস্তাতেই গেছে ?'

দু'জনেই চুপ হয়ে গেল। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিল না। আকাশে আর আশেপাশে গভীর অন্ধকার ছেয়েছিল। দিবাকরবাবু উঠে বাড়িমুখো হতে চাইছিলেন কিন্তু মনে হলো হাওয়ায় কেঁপে কোনো একটা জিনিস চক্‌মক্ করে উঠল।

কিন্তু দিবাকরবাবু খুবই সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। পরে সেই ছেলেটিকে আর দেখা গেল না। ওর হাত থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিতেই সেই ছেলেটি সরে দাঁড়াল। তারপরই অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। তিনি হতপ্রভ হয়ে কটমটিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ফের আস্তে ছোরাটা একেবারে ফেলে দিয়ে জোরপায়ে রাস্তায় এসে পড়লেন। এ-ঘটনা তাঁর জন্য একবারেই নতুন, তবুও তাঁর মনে হলো এইবারও তিনিই বাজীমাৎ করেছেন। কিন্তু এর চর্চা তিনি কারও সঙ্গেই করতে চান না। অমিতবাবুর সঙ্গেও নয়।

সকাল সকাল কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গিয়েছিল। তার জন্যই তিনি বাইরে এসে বসেছিলেন। কাগজখানা খোলা আর পড়ার মাঝে তাঁর মনে হচ্ছিল যে এই অশান্তি আর ঝামেলার খবর হয়তো ছেপেছে। কি জানি কেন হঠাৎ ওঁর কি হলো সমস্ত কাগজটার ওপর তাড়াতাড়ি করে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, কিন্তু সেই রাতের খবর তিনি এর মধ্যে পেলেন না। আর সে খবর ছাপবেই বা কি করে ? যদি সেই ছেলেটি তাঁকে ছোরা মারতো, অথবা তাকে ধরে তিনি কোন ঝামেলার সৃষ্টি করতেন, তো সম্ভব ছিল যে কাগজে তাঁর কথাও কোন ছোট জায়গায় ছাপা থাকত !

আজ তাঁর মন কাগজে বসছিল না। সারা কাগজ দু-এক বার পড়ে নেবার পরও এমন কোন খবরে তাঁর মন লাগে নি যার বিষয়ে অমিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি চুপচাপ বাইরেই অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। কাগজের খোলা পাতাগুলি হাওয়ায় ফর্‌ফর্ করছিল। কিছুক্ষণ পর অমিতবাবুই স্বয়ং এসে অন্য চেয়ারে বসলেন। দিবাকরবাবুকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, আজ কোন বিশেষ খবর নেই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তেমনই সব আছে। বিহারের আরও সব শহরে গোলাগুলি চলছে; তাতে অনেক লোক মরেছে, অনেক ঘায়েল হয়েছে। সেখানে স্টুডেণ্ট বিপ্লব হয়ে গেছে। আজ 'বাংলাদেশে'ও হরতাল। মানে সমস্ত জায়গায় আগুন লেগেছে। কিন্তু এতে কি হয় ?' তিনি এই বলে আবার চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো এইটুকু বলেও তাঁর সন্তোষ হল না, আরও কিছু তিনি যেন বলতে চাইছিলেন।

অমিতবাবুই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানের আবহাওয়া আপনার কেমন লাগছে ?'

'এখানে তো ঝামেলা লেগেই আছে, কিন্তু বিপ্লব হবে না।'

'কেন ?'

'এখানের দৃষ্টি খুবই সংকীর্ণ হতে যাচ্ছে, লোকেরা নিজের স্বার্থ নিয়ে পড়ে আছে। এখানের যুবকশ্রেণী বেশি বেশি রেগে যায় তো নিজের আশেপাশের লোকদের কাউকে ছোরা মেরে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।'

অমিতবাবু এ কথা স্বীকার করে বললেন, 'হ্যাঁ, এ আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'এক সময় ছিল যখন দেশের বিপ্লবের জাগরণ এদের থেকেই শুরু হতো। আজ সেই লোকদেরই মৃত মনে হয়। আপনি কি বলেন—এখানে আজ র‍্যাশানে আমাদের খাবার জন্য যে চাল পাওয়া যায়, সেটা কি মানুষের খাদ্যের যোগ্য ? ভাল চাল কোথায় যায় ? আপনি ফুটপাথে জানেন অনেক চাল ব্ল্যাকে পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো কোথা থেকে আসে ? সরকার কেন ধরে না ?'

'চাল কেন সমস্ত জিনিসই তো এই মেলামেশার ব্যাপার, কি দিবাকরবাবু ?' অমিতবাবু আরও কিছু শোনার আশায় ওনাকে ঠুকলেন।

কিন্তু দিবাকরবাবু এবার চুপ করে গেলেন। মনে হল যেখান থেকে কথা শুরু হবার ছিল অথবা যেটা বার বার তাঁর মনকে কুরে খাচ্ছে সেটা বলা হলো না। বলতেও পারেন না। কারণ এটা তাঁর নিজের ব্যাপার আর সেই ছেলেটি তাঁকে মারতেই বা কেন চাইল ? নিশ্চয় এই হত্যার উপরে কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এই হত্যার পেছনে একটা ক্যাওস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল। বাস।

দিবাকরবাবু কিছু না বলে ওখান থেকে উঠে বাথরুমে গেলেন। তিনি সকাল সকাল স্নান করে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। এমন কোন কথা ছিল যেটা ওঁকে পিষছিল ? বাথরুম থেকে বেরুতে বেশ ফ্রেস লাগছিল। মনে হলো কিছুক্ষণ আগে যে গভীর বিষাদের রেখা তাঁর চেহারায় অঙ্কিত ছিল, তার অনেকটাই ধুয়ে গেছে।

খাবার টেবিলে সেই প্রসঙ্গেই তিনি আবার কথা শুরু করলেন। অমিতবাবুও খেতে বসেছিলেন আর চেখে চেখে খাচ্ছিলেন। এই চাল তাঁর জন্য বিশেষ করে ব্ল্যাকে কিনে বানানো হয়েছে। তাঁর শরীর একেই খারাপ ছিল আর র‍্যাশনের চাল খেয়ে তো ভাল মানুষেই অসুখে পড়ে, তো এর কি অবস্থা হবে!

'এ কদিন যে দু'একটি হত্যার কথা বরাবর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তার পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে, আপনি বলতে পারেন ?'

অমিতবাবু চমকে উঠলেন। আবার অনেক বিশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'কিছু না, শুধু এই যে রাজনৈতিক আবহাওয়া, মানে মুভমেণ্টকে জিইয়ে রাখা। এর পেছনে প্রচুর বেকার যুবককে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। যুবকরাও জানে বেকার থেকে কি হবে ? চাকরি পাওয়া তো দুষ্কর, তাদের সমস্ত স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব কাউকে মেরে ফেলার মধ্যে আর কি তফাত ঘটছে। যেমন বাহির তেমনি জেল। তবুও এদের বাঁচাবার জন্য পেছনে পার্টি লেগে আছে। অতএব কতবার এরা হত্যা করে বেঁচেও যায়, আর তার জায়গায় অন্যকে ধরে জেলে ঠেলে দেওয়া হয়।'

'সেটা আমিও ভেবে দেখেছি। আমি মরতে ভয় পাই না। ভগবান যা চাইবেন, তাই হবে। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া এমনি মৃত্যু কাপুরুষতা মনে হয়। এর বদলে পতাকা উঠিয়ে নাও, জুলুসে শামিল হয়ে যাও, তখন মরতে মজাও আসে।'

'আজ পেপারে দেখলাম কি কয়েকটি পার্টি মিলে এক লম্বা জুলুস বের করেছে বিকেলে। আপনি পড়েন নি ?

'না তো! এ বিষয়ে তো নজরও যায়নি। তবে তো কোনো না কোনো হাঙ্গামা হবেই। লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস, তারপরে গুলি ! আর স্বেচ্ছায় যদি কেউ জেলে চলে যায় তো ভালই।'

'আজ স্বেচ্ছায় কে যায় ? এটা সত্যাগ্রহ আর অনশনের সময় নয়। আপনি জানেন না, স্বেচ্ছায় জেলে যাওয়া লোকেদের—জুলুস ভেঙে যাবার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা পলিটিক্যাল ফন্দি।'

অমিতবাবু এ বিষয়ে কিছু বললেন না। তিনি চুপচাপ খেতে লাগলেন। মনে হলো কথাবার্তা ওখানেই শেষ হলো। দিবাকরবাবুও খেতে খেতে কিছু ভাবতে লাগলেন।

সন্ধে হয়ে এসেছিল। দিবাকরবাবু প্রতিদিনের মত পার্কের দিকে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল যদি সেই ছেলেটিকে দেখতে পান তো তার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলেন আর জিজ্ঞেস করেন যে কাল ও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল কেন ? এই বাধক্যেও তাঁর সামনাসামনি হতে ওর সাহসে কুলায় নি। তিনি রাস্তা পার করার আগে থমকে দাঁড়ালেন। সামনে থেকে এক লম্বা জুলুস এগিয়ে

আসছিল। তিনি সেই জুলুসটিকে সামনে থেকে দেখতে চাইছিলেন। কেমন লোকেরা হয়, যারা জুলুসে ভাগ নেয়? জুলুস শুনেছেন বা পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু নিজের চোখে আজকালের জুলুস দেখেন নি। আজকেও কি মানুষ তেমনিভাবে বলিদান হবার জন্য জুলুসে নামে যেমনভাবে '৪২ সনে নামতো?

এর মধ্যে লম্বা লাইনটি অনেক কাছে এগিয়ে এসেছিল। তিনি একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জুলুস তাঁর সামনে দিয়ে পাস করছিল। এতে সব শ্রেণীর লোকই ছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুইই। গ্রামের লোকেরাও এসে জুটেছিল। এত বড় জুলুস যে আলাদা আলাদা ক্যাম্পে বিভক্ত ছিল ও প্রত্যেক ক্যাম্পের স্লোগানও আলাদা ছিল। কিন্তু এরা 'বন্দেমাতরম' বলছিল না। আরও অন্য কিছু বলছিল—যেটা তাঁর ঠিক বোধগম্য হয়নি। আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর জুলুস শেষ হয়ে এসেছিল; কিছু লোকই আর বাকী ছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হল যে এই লোকেদের সাথে জুলুসে নেমে যান আর এরা যতদূর যায় ততদূর এদের সাথে গিয়ে দেখেন সেখানে এরা কি করে। শেষে তিনি একটু এগিয়ে লাইনে যেতেই একজন এগিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিলো। তিনি পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। তারপরে একজন পেছন থেকে এসে তাঁর জামার কলার ধরে বললো, 'এই লোকটা আমাদের লাইনে ঢুকে জুলুস ভাঙতে চাইছিল। এই বয়সেও তোমার আক্কেল হয়নি।'

জুলুস থেকে আরও দু-তিন জন লোক এগিয়ে এল আর দেখেই চিল্লাতে লাগলো, 'মারো শালাকে, মারো। তবে হুঁশ হবে।'

কিছু লোক দৌড়ে এসে তাঁকে বাঁচালো, নয়তো বিশ্রীভাবে ধোলাই খেতেন। দিবাকরবাবু এর মাঝে কিছু বলতে পারেন নি। পরে তিনি হতপ্রভবৎ এগিয়ে যাওয়া জুলুস দেখতে লাগলেন। যখন লাইনটা অনেকদূর চলে গেল, তখন হুঁশ হ'ল। কিন্তু এই ঘটনা থেকে তাঁর মন এতই বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে পার্কে যাবার ইচ্ছে তাঁর মরে গিয়েছিল। তিনি চুপচাপ ধীরে ধীরে আবার ঘরে ফিরে এলেন।

———

ফণীশ্বরনাথ রেণু ॥ জন্ম ১৯২৭, বিহারের পূর্ণিয়ায়। 'আঞ্চলিক' লেখার অগ্রগণ্য পথিকৃৎ হিসেবে ইনি পরিচিত ও সম্মানিত। বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গেও এই সমাজবাদী লেখক যুক্ত ছিলেন। এঁর লেখা 'তিসরী কসম' সার্থকভাবে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। অপরাপর চারটি উপন্যাসের মধ্যে 'ময়লা আঁচল' আর 'পরতী পরিকথা' সম্প্রতিকালের সৃজনমূলক রচনা হিসেবে খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির জন্য ইনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর ছোটগল্পের কয়েকটি সংকলন আছে।

গিরীশ আস্থানা ॥ ১৯২২ সালে গঙ্গাপুরে গিরীশ আস্থানার জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। ভালো চাকরি নিয়ে কলকাতাতেও কিছুকাল কাটিয়েছেন। এখন দিল্লীতে থাকেন। চার ও পাঁচের দশকে 'হংস', 'প্রতীক,' 'নিকাষ' ইত্যাদি প্রগতিশীল রচনাগুলি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সৃষ্টিমূলক লিখলেও কোনরকম আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই। একটি ছোট গল্পের সংকলন ছাড়াও দু'টি উপন্যাস লিখেছেন, যার মধ্যে "ধূপ ছাঁহী রঙ" সম্প্রতিকালের এক উল্লেখযোগ্য রচনা বলে সমাদৃত।

ভীষ্ম সাহানী ॥ লেখকের জন্মসাল ১৯১৫, স্থান বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি। এঁর অগ্রজ খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা বলরাজ সহানী। প্রগতিশীল লেখকদের নেতৃস্থানীয় এই লেখক 'প্রগতিশীল লেখক সংস্থা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তমস' সম্প্রতি 'সাহিত্য-আকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছে। এ'ছাড়া তিনটি ছোটগল্প সংকলন ও দুটি উপন্যাসও পাঠকমহলে আদৃত। বর্তমানে দিল্লীর একটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক।

রাজেন্দ্র যাদব ॥ 'নঈ কহানিয়াঁ' আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ লেখক রাজেন্দ্র যাদব ১৯২৯ সালে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচের দশকের এই লেখক বিষয়বস্তু ও ভাবায় মৌলিক চিন্তার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সারা আকাশ' চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বিবেচিত

হয়। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাঁচটি উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ছয়টি সংকলন আছে। দিল্লীতে লেখকের 'অক্ষর প্রকাশন' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে।

নির্মল ভর্মা ॥ 'নঈ কহানিয়াঁ' আন্দোলনের আর এক অন্যতম ছোটগল্পকার নির্মল ভর্মা ১৯২৯ সালে সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। মাঝে অনেক বছর চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিলেন, ঐ সময়ে চেকসাহিত্য থেকে কিছু হিন্দী অনুবাদও করেন। বর্তমানে দিল্লীনিবাসী। ইতিমধ্যে দুটি উপন্যাস ও ছোটগল্পের তিনটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। এঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'মায়াদর্পণ' চলচ্চিত্রায়িত, এবং সেই ছবিটি 'প্যারালাল ফিল্ম'-এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রূপে খ্যাত।

কমলেশ্বর ॥ 'নঈ কহানিয়াঁ' আন্দোলনের ত্রয়ীর অন্যতম কমলেশ্বর ১৯৩১ সালে মেনপুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর সুখ্যাত ছোটগল্পের অনেকগুলিই, যেমন 'ফির ভী' (তলাস) 'ডাকবাংলা,' 'আঁধি' সিনেমা হয়েছে। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার হিন্দী ছোটগল্পের পত্রিকা 'সরিকা'র সম্পাদনা করেন। ছোটগল্পের চারটি সংকলন আর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

রমেশ বক্সী ॥ সম্প্রতি পুরস্কৃত '৪২ ডাউন' ছবির গল্পকার রমেশ বক্সী এ পর্যন্ত তিনটি ছোটগল্প সংকলন, চারটি উপন্যাস ও কিছু নাটক প্রকাশ করেছেন। হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এই নাটকগুলির বহু অভিনয় হয়ে গেছে। এঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু বর্তমান যুবসমাজ ও তাদের সমস্যা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক হিন্দী সাহিত্য পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়' সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর। বর্তমানে দিল্লীর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের সম্পাদনায় নিযুক্ত। জন্ম ১৯৩৬-এ।

দুধনাথ সিং ॥ ছয়ের দশকের সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত গল্প লেখক দুধনাথ সিং-এর জন্ম কলকাতায়। সেখানেই তাঁর প্রথম শিক্ষকতার কাজ, এখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এঁর লেখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা গেছে। অলৌকিক কল্পনা-প্রবণতাকে কেন্দ্র করে লেখা বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে একটি 'রীছ'। প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা 'প্রতিবাদ'-এর সম্পাদক ইনিই।

হৃদয়েশ ॥ ভাবনায় এবং উপস্থাপনায় প্রগতিশীল লেখক হৃদয়েশ ১৯৩০ সালে সাহ্‌জাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন তথাকথিত আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। লিখছেন বহু দিন ধরে। ইতিমধ্যে কয়েকটি উপন্যাস এবং ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা সরকারী চাকরি।

অমরকান্ত ॥ 'নঈ কহানিয়াঁ' আন্দোলনের আর একজন অগ্রবর্তী লেখক অমরকান্ত। ইনি বালিয়ায় ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর 'ডেপুটি কলেক-টারী' একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পটি 'কহানী' প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছিল। এঁর তিনটি ছোটগল্প সংকলন ও তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ইনি মিত্র প্রকাশন প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

জ্ঞানরঞ্জন ॥ এই দশকের আর একজন বিখ্যাত গল্পলেখক জ্ঞানরঞ্জনের জন্ম আকোলায় ১৯৩৬-এ। প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই লেখক তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্য পত্র 'পহল'-এর সম্পাদনা করেন। এঁর একটি গল্প সংকলন ও একটি উপন্যাস এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ইনি পেশায় একজন শিক্ষক।

হিমাংশু যোশী ॥ তরুণ কথাশিল্পী হিমাংশু যোশীর জন্ম ১৯৩৫-এ যোগুদায় (আলমোড়া)। হিন্দুস্থান টাইমস প্রকাশনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যাবৎ সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত। এঁর চারটি উপন্যাস এবং দুটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

সিদ্ধেশ ॥ ১৯৩৮ সালে পাটনার কাছাকাছি কনহৌলী গ্রামে হিন্দী সাহিত্যের বিতর্কিত লেখক সিদ্ধেশের জন্ম। জীবনের অসারতা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ এবং অলীক কল্পনা এঁর রচনার উপজীব্য। লেখকের বিখ্যাত গল্পগুলি 'অর্থহীন ওহ্ ম্যায়' এবং 'অনুপস্থিত শহর' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'কেঁচুল' নামে একটি অ্যান্টি-নভেলও ইনি লিখেছেন। নিজের প্রকাশনায় ছয়টি গল্প সংকলন ও একটি উপন্যাস এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। লেখক অনেকদিন কলকাতায় আছেন, এখানেই এক চা-সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত।